আধুনিক যুদ্ধ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীভবেশচন্দ্র রায়, এম্. এস্‌সি.
সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ
A CATECHISM OF INDIAN PROBLEMS
প্রণেতা

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

প্রকাশক :
শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়,
৪০-এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি এ.
কে. পি বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

নিবেদন

বাঙ্গালা ভাষায় যুদ্ধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন বই লেখা হয়নি অথচ যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ কিছু কম নয়। যুদ্ধ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ'য়েছে সে বিষয়েও লোকের ধারণা ব'লতে গেলে কল্পনাকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। আধুনিক যুগের যুদ্ধ যে কী ব্যাপার তারই খানিকটা রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হ'য়েছে এ বইখানিতে—কতদূর সফল হ'য়েছি আমরা তা বিচার ক'রবেন বাঙ্গলার ক্ষমাশীল সুধীসমাজ।

আমাদের এ চেষ্টায় অসুবিধা কম হয়নি। প্রথমতঃ আলোচনা সব সময়ই সীমাবদ্ধ রাখতে হ'য়েছে প্রাথমিক স্তরে, দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি সামরিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নিজেদের গ'ড়ে নিতে হ'য়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় Automatic—এ কথার বাংলা লিখেছি 'আত্মক্রিয়', Predictor —'গণকযন্ত্র,' Strategy—'সমর-কৌশল,' Tactics—'রণ-চাতুর্য্য', এমনি সব। অসামরিক ভাষায় এগুলি হয়ত অন্য কথা ব'লে বোঝান যেত, কিন্তু যে সব সামরিক ক্রিয়ার সঙ্গে এগুলি জড়িত, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই নূতন শব্দ রচনা ক'রতে হ'য়েছে।

যাঁরা এই বই লিখতে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন ও সাহায্য ক'রেছেন তাঁদের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী এবং অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগচীর নাম না ক'রলে অন্যায় হবে। মুখের কথায় ধন্যবাদ দিয়ে এঁদের ঋণ শোধ করা যাবে না সেইজন্য সে চেষ্টা ক'রব না।

এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকগণ যেরকম আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং ব্যয় ক'রেছেন বাংলা দেশে সেটা সত্যই বিরল। এই সুযোগে আমরা তাঁদেরও জানাচ্ছি ধন্যবাদ।

কলিকাতা
১৪।১২।৪০

শ্রীভবেশচন্দ্র রায়
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ

ভূমিকা

বর্ত্তমানে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে সর্ব্বত্রই ঘোরতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি ভাবে হইতেছে আর কি ভাবেই বা যুদ্ধক্ষেত্রে সেগুলি ব্যবহার করা হইতেছে সংবাদপত্রাদিতে তাহা পাঠ করিয়া জনসাধারণ বিস্মিত হইতেছে। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধ নানা কারণে ভয়াবহ। জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সমানভাবে যুদ্ধ চলিতেছে, পূর্ব্বে যাহা কল্পনাও করা যাইত না, বৈজ্ঞানিকদিগের সমবেত চেষ্টায় তাহা এখন সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, এবং বেশ বোঝা যাইতেছে যে বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে আরও অনেক অসম্ভব সম্ভব হইবে।

বিগত ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই ইউরোপের সর্ব্বত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এই উপলক্ষে বিভিন্ন ভাষায় বহু নূতন নূতন শব্দও সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। এই রকম 'যুদ্ধ-সাহিত্য' গড়িয়া উঠায় ইউরোপের সব দেশের সাহিত্যই উন্নত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাংলা ভাষায় এ রকম কোন চেষ্টা একেবারেই হয় নাই। এবারেও যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয় দেশগুলিতে নানা প্রকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন মাসে, কোন তারিখে, কোন রাজ্য আক্রমণ করা হইল অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে কবে, কখন, কি ঘটিল ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দিয়া যুদ্ধের দিনপঞ্জী পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অথচ বাংলায় যুদ্ধের নীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ কোন পুস্তক রচনার চেষ্টা করিতেছেন ইহা শুনি নাই। এই সমস্ত পুস্তক ইতিহাসের দিক দিয়া যেমন মূল্যবান, সাহিত্যের পুষ্টির পক্ষেও তেমনই প্রয়োজনীয়। সমসাময়িক ঘটনার পরিবেশনে এই সব গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে অমূল্য এবং এগুলি স্বতঃই তাহাদের জ্ঞানপিপাসা বাড়াইয়া দেয়।

আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্র রায় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিংহ বহু পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন এবং এই প্রচেষ্টায় আমি প্রথম

হইতেই তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিলাম। শ্রীমান্ ভবেশ বিজ্ঞানের ছাত্র এবং সুসাহিত্যিক তাই তাহার আলোচনাভঙ্গি স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসরণ করে। 'আধুনিক যুদ্ধ' পুস্তকখানি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিবে। এই পুস্তকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে এবং ইহার ভাষা অতিশয় মধুর ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থকারদ্বয় বহুতথ্যসম্বলিত এই পুস্তক রচনা করিয়া বাংলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

'আধুনিক যুদ্ধের' অবতরণিকায় বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত বড় বড় ঘটনার একটা ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। আমার ধারণা ইহাতে পুস্তকের মূল্য আরও বেশী বাড়িয়াছে।

গ্রন্থকারগণের ভাষা-মাধুর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং একবার পড়িতে আরম্ভ করিয়া আদ্যোপান্ত না পড়িয়া থাকিতে পারি নাই। সময়োপযোগী এই সাহিত্য বাংলার সুধীসমাজে ও ছাত্রসমাজে বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আশা করি লেখকদ্বয় ভবিষ্যতেও এতাদৃশ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া একদিকে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে পাঠকগণকে তৃপ্ত ও মুগ্ধ করিবেন।

ইউনিভারসিটি কলেজ
অব্ সায়েন্স, কলিকাতা
১৪।১২।৪০

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বিষয়সূচী

অবতরণিকা

যুদ্ধ কেন হয়? যুদ্ধ কি মানুষের স্বভাব, না স্বভাবের বিকৃতি? যুদ্ধ কি সংসারের নিয়ম, না নিয়মের বিপর্য্যয়? এ প্রশ্ন আজ নূতন নয়, বহুবার এ প্রশ্ন তোলা হ'য়েছে, বহু লোকে এসম্বন্ধে নানা মত প্রচার ক'রেছে। সাধারণ মানুষ কোন দিনই এই মারামারি কাটাকাটি ভাল চোখে দেখতে পারেনি, যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ কল্পনা ক'রে চিরকালই মানুষ ঘৃণা ও আতঙ্কে শিউরে উঠেছে, কিন্তু বেঁচে থাকার আগ্রহে ও উচ্চাশার প্রেরণায় সেই মানুষই আবার নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই যুদ্ধ ক'রে এসেছে। এই যুদ্ধের আগুনে কত গ্রাম নগর পুড়ে' গেল, কত রাজ্য জনপদ শ্মশান হ'ল, কত সিংহাসন গুঁড়িয়ে গেল, কত সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস হ'ল কিন্তু আজও তো যুদ্ধের অবসান হ'ল না! আদিম যুগের অসভ্য মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে এই বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য মানুষও প্রয়োজন হ'লেই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে। আর প্রতি যুদ্ধের পর গ'ড়ে উঠেছে নব নব সভ্যতা। এক কথায় মানুষের সভ্যতার পথে অগ্রগতির ইতিহাস কতকগুলি খণ্ড খণ্ড মহাসমরের ইতিহাস। মাঝে মাঝে সে থেমে খানিকটা দম নিয়েছে মাত্র। কাজেই যুদ্ধটাকে মানুষের স্বভাবের বিকৃতি ব'লে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

বিগত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সামনে দাঁড়িয়ে ইউরোপ ক্ষণিকের বৈরাগ্যে ঘোষণা ক'রেছিল, যাতে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ বাধতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র মিলিতভাবে চেষ্টা ক'রবে। শেষ পর্য্যন্ত এর ফলাফল কি হ'য়েছে তা আজ আর কারো জানতে বাকী নেই। গত যুদ্ধের পর থেকে এই যুদ্ধের আরম্ভ পর্য্যন্ত এই যে বিশ বছর সময়, এ একটা ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ছাড়া আর কিছুই যে নয়, তা আজ সকলেই বুঝেছে। শান্তির বাণী যুদ্ধশেষে রণক্লান্ত মানবের চিত্ত বিশ্রাম। ঘোর সংসারী মানুষ, অতি প্রিয়জনের দেহ যেখানে ভস্মীভূত হ'য়ে যাচ্ছে নিজের চোখের সামনে সেই শ্মশানে—অসীম নিরুপায়তার মাঝখানে পা ছড়িয়ে ব'সে অকস্মাৎ 'সব ঝুট্ হ্যায়' ব'লে যেমন দার্শনিক হ'য়ে পড়ে, এ ঠিক তেমনিই।

যুদ্ধ জৈবী প্রেরণা

জীবন ধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধের একটা যোগ আছে। যুদ্ধ জৈবী প্রেরণা। তা না হ'লে যে মানুষ সামান্য একটা অস্ত্রোপচারের দৃশ্য দেখে মুখ বিকৃত করে, সে নির্ব্বিচারে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যুদ্ধ করে কেন? যুদ্ধের নেশা মানুষের রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশে আছে। যেদিন সে জ'ন্মেছে, সেই দিনই সে একেবারে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে পৃথিবীতে নেমেছে। প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়া চেষ্টা ক'রছে তাকে মেরে ফেলতে, তাই প্রতিটি নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে ক'রছে সে অবিরাম যুদ্ধ। তার মাংসপেশীর প্রতি আকুঞ্চন ও প্রসারণে প্রকাশ পেয়েছে এই যুদ্ধের উদ্যম। সেই দিন থেকে তার প্রতি কাজ ও প্রত্যেকটি আচরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফুটে উঠেছে বেঁচে থাকার আগ্রহ, টিকে থাকার আগ্রহ, বড় হ'বার উত্তেজনা। আ'রও বড় হ'ব ব'লে সে নিরঙ্কুশ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, আরও বেশী চাই ব'লে সে স্বচ্ছন্দে প্রতিবেশীর গলা টিপে ধরেছে—এতটুকু মমত্ব-বোধ তাকে সঙ্কল্পচ্যুত ক'রতে পারেনি। যুদ্ধ ক'রবার সহজাত প্রবৃত্তির সে যতই নিন্দা করুক, যুদ্ধজয়কেই সে শেষ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত মীমাংসা ব'লে মেনে নিয়েছে।

যুদ্ধের মূলে আছে স্বার্থবিবোধ। জীবমাত্রেই স্বার্থবদ্ধ। মানুষও যে স্বার্থবদ্ধ—একথা সকলেই স্বীকার ক'রবেন। সুতরাং স্বার্থবিরোধের চরম অবস্থায় মানুষ যে বাহুবলের আশ্রয় নেবে না, তা জোর ক'রে ব'লবার সময় এখন তো আসেইনি, কোন দিন আসবে কিনা কে জানে? মানুষের জীবনব্যবস্থা যদি এমন ক'রে বেঁধে দেওয়া যায় যে—কোন প্রকার স্বার্থ তাকে জ্বালাতন ক'রবে না, তা'হলে কি হ'বে তা অবশ্য বলা যায় না।

অস্ত্রসজ্জা

নিতান্ত প্রাণের দায়ে আদিম মানুষকে আত্মরক্ষা ও শত্রুনিপাতের জন্য উদ্ভাবন ক'রতে হ'য়েছিল অস্ত্রশস্ত্র। বনের মধ্যে নিশ্চিন্ত বিচরণের আকাঙ্ক্ষায় তাকে উদ্ভাবন ক'রতে হ'ল পাথরের বর্শা, তীর ধনুক, এই রকম সব। তারপর সভ্যতার বিস্তার যতই হ'তে লাগল, জীবনযাত্রায় সভ্যতার নিত্য নূতন দান ততই বেশী হ'তে লাগল। এর ফলে মানুষ হ'য়ে প'ড়ল ক্রমশঃ আরামপ্রিয় ও বুদ্ধিজীবী। শারীরিক শক্তি তার লাগল ক'মতে, কিন্তু অস্ত্রাগার পুষ্ট হ'তেই

থাকল। পর্ব্বতগহ্বরে বা তরুকোটরে বাস করা যখন মানুষ ছেড়ে দিল, তখন হিংস্র পশুর সঙ্গে নিত্য শত্রুতা তার আর রইল না। মানব সমাজে তখন হ'য়ে দাঁড়াল দুই দল- সভ্য মানুষ আর অসভ্য মানুষ। সভ্য মানুষ যখন অসভ্য মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছে, তার দখল থেকে জায়গার পর জায়গা কেড়ে নিয়েছে, তখন বন্যজন্তু হননের সেই সব অস্ত্রগুলি সে প্রয়োগ ক'রেছে স্বজাতি নিধনে। অসভ্যরা ছিল সভ্যদের চেয়ে শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। তাই নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই সভ্যদের দৃষ্টি প'ড়ল—কি ক'রে ঐসব অস্ত্রশস্ত্রের মারণশক্তি বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তারপর সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘ'টতে লাগল। সভ্য মানুষই নানা শাখায় ছড়িয়ে প'ড়ল দেশ দেশান্তরে, তাদের মধ্যে দেখা দিতে লাগল নূতন নূতন বিরোধ, বাধল স্বার্থের নানা সংঘাত। আজ অসভ্যেরা দল বেঁধে সভ্য মানুষকে আক্রমণ ক'রছে না, আর বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার দরকারও মানুষের আজ নেই, কিন্তু তবুও অস্ত্রসজ্জার ক্রমোন্নতি আজও বন্ধ হয়নি। জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রের জটিলতাও বাড়ছে, যুদ্ধের পদ্ধতিও বদলাচ্ছে।

অস্ত্রসজ্জার বিবর্ত্তন

প্রস্তর যুগে মানুষ প্রথমে একখণ্ড পাথর, যা হাতের কাছে পেত, তাই নিয়ে প্রতিপক্ষের গায়ে ছুঁড়ে মারত। তারপর ধীরে ধীরে পাথর দিয়ে এক প্রকার তীর তৈরী করা হ'ল। তাম্রযুগে বর্শার আমদানী হ'ল এবং এই যুগ শেষ না হ'তেই তাম্রনির্ম্মিত তরবারি, ঢাল, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদির সৃষ্টি হ'য়ে গেল। তারপর মানুষ যখন লোহার ব্যবহার শিখল, তখন থেকেই আরও নানারকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হ'তে লাগল। পরশুরামের কুঠারের মত এক প্রকার অস্ত্র এই সময় খুবই প্রচলিত ছিল। সভ্য হওয়ার পরও বহু যুগ ধ'রে মানুষ বর্শা, ধনুর্ব্বাণ, ঢাল, তরোয়াল দিয়েই যুদ্ধ ক'রত। রামরাবণের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, ট্রয়ের যুদ্ধ সম্বন্ধে মহাকবিরা যে বর্ণনা ক'রেছেন তাতেও এই সব অস্ত্রাদিরই পরিচয় পাই। ঐতিহাসিক যুগেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যে সব যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেও এগুলিই ব্যবহার হ'ত। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা ছিল এইরূপ। সেকেন্দার শাহের ভারত আক্রমণের সময় হিন্দুরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ক'রেছিলেন ব'লে কেউ কেউ দাবী ক'রেছেন। কিন্তু সে দাবী সর্ব্বজন-

গ্রাহ্য নয়। একাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত হেস্টিংসের যুদ্ধেও তীরধনুকই ব্যবহৃত হ'য়েছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে 'বারুদ' আবিষ্কৃত হ'ল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বারুদ বা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার তেমনভাবে হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই একটু একটু ক'রে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার স্থরু হয়, সপ্তদশে এসে এই ব্যবহার একটু ব্যাপক হয় কামান প্রভৃতির প্রচলনে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট বাবর ভারতবর্ষে প্রথম কামান নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন।

যখন সাধারণ বন্দুকের প্রচলন হ'ল তখনও কিন্তু সঙ্গীন আসে নাই। তখন একদল 'পাইকম্যান' (বর্শাধারী সৈন্য) থাকত শত্রুকে খুঁচিয়ে কাবু ক'রবার জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্গীনের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গেই এই 'পাইকম্যানদের' কাজ ফুরিয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি আরম্ভ হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রাইফেলের স্মৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীতে যে কতপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

যুদ্ধের উপর সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব

বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধবিগ্রহ বর্ত্তমান সভ্যতা ও সামাজিক অবস্থার অনুসরণ ক'রে চ'লতে বাধ্য। আদিম বা মধ্যযুগে যুদ্ধ বাধত ও যুদ্ধ চ'লত সেই সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থার অনুসরণ ক'রে। যখন সমাজ গ'ড়ে ওঠেনি, প্রত্যেকটি ব্যক্তি যখন ছিল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, তখন অতি সাধারণ সাধারণ বিষয় নিয়েই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মারামারি হ'ত আর অতি স্বাভাবিক কারণেই এই সব বিরোধে দু'জনের বেশী লোকক্ষয় ঘ'টবার সম্ভাবনা থাকত না, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত মাত্র দু'জন। তারপর মানুষ যখন আর একটু অগ্রসর হ'ল, যখন তারা রক্তসম্পর্ক ধরে গোষ্ঠীবদ্ধ হ'য়ে পৃথক পৃথক দল গ'ড়ে তুলল, তখন বিবাদের প্রকৃতিটি আর একটু ব্যাপক হ'য়ে প'ড়ল। তখন গোষ্ঠীপতির পিছনে তার একটি নির্দ্দিষ্ট দল থাকায় বিবাদ আরম্ভ হ'লে লোকক্ষয়ের মাত্রা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে গেল। এই সব যুদ্ধে জিতলে দলপতির সুখ সুবিধার মাত্রা যেমন বেড়ে যেত, তেমনি হেরে গেলে ষোল আনা লোকসানও হ'ত তারই; সুবিধাও যেমন ছিল প্রচুর, দায়িত্বও ছিল তেমনি বেশী।

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজার উপর দায়িত্বটা এল আরও বেশী ক'রে।

সুখসুবিধা তিনি ভোগ ক'রতেন সবটুকু—প্রজারা তাঁর আজ্ঞাবহ মাত্র ছিল, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় নিশ্চিন্তে দাসের মতই জীবন কাটাত। সে যুগে বিরোধ বাধত রাজায় রাজায়—সে বিরোধ প্রায়শঃই হ'ত ব্যক্তিগত। হাতাহাতি ক'রেই হ'ক বা যে প্রকারেই হ'ক তার মীমাংসা ক'রে নেওয়া হ'ত তাড়াতাড়ি। তবুও 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ' হ'লে 'উলুখড়ের' প্রাণ যে যেত না, তা নয়। তবে প্রজাদের দায়িত্ব ও অধিকার যেমন ছিল অল্প, তেমনি যুদ্ধবিগ্রহ কালে তাদের ব্যক্তিগত ধনপ্রাণনাশের আশঙ্কাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া যুদ্ধের বিধিব্যবস্থার সঙ্গেও ধ্বংসের তারতম্যের একটা সম্পর্ক আছে। তখন যুদ্ধ হ'ত লোকালয়ের বাইরে, যেখানে সৈন্য সমাবেশ করা যেতে পারে এইরকম ফাঁকা মাঠে। যুধ্যমান দল দু'টি সামনাসামনি এসে প'ড়ত, লড়াই সুরু হ'ত, একপক্ষ অল্পসময়ের মধ্যেই হেরে যেত আর একদল হ'ত জয়ী। তারপর সবই খুব সহজ হ'য়ে প'ড়ত। প্রজারা রাজা বদল ক'রত মাত্র।

গণতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হ'ল। যেখানে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি লোক ভোট পাবে,—যেখানে দেশ তাদের, রক্ষাও ক'রবে তারাই, ভোগও তারাই ক'রবে,—যেখানে সুখ সুবিধার মাত্রা সবারই সমান, সেখানে রাষ্ট্রের বিপদে তাদের দায়িত্ব ও বিপদ যে বেশী হবে এ তো খুবই সোজা কথা। দেশের শাসকসম্প্রদায় ত' দেশের জনসাধারণেরই তৈরী, তাদেব নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং জনসাধারণের অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্বও দাঁড়িয়ে গেল বেশী। এই দায়িত্ব পালনের আগ্রহেই যুদ্ধকালে খলতা, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা কোন কিছুই আর মানুষ বাদ দিচ্ছে না।

এক কথায় আধুনিক যুদ্ধ হ'য়ে প'ড়ছে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই নিষ্ঠুর ও ব্যাপক। এই ব্যাপকতার বড় প্রমাণ ইউরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধ। কেমন ক'রে এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধে একটার পর একটা দেশ জড়িয়ে প'ড়তে বাধ্য হ'চ্ছে, কেমন ক'রে দেশ জনপদ ভেদ ক'রে যুদ্ধের আগুন দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে প'ড়ছে সেই কথাই এবার বলি।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পটভূমি

আজ যে যুদ্ধ বেধেছে এত বড় ব্যাপক যুদ্ধ পৃথিবীতে এর পূর্ব্বে আর হয় নাই। আর একটা যুদ্ধ অবশ্য ঘ'টেছিল ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে

মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে। সেদিন একপক্ষে ছিল জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক আর অন্য পক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া, সার্ভিয়া ; জাপান ও আমেরিকাও শেষে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সেই যুদ্ধে জার্ম্মাণী যখন হেরে গেল তখন ১৯১৯ সালে ২৮শে জুন ভার্সাই নগরে হ'ল দু'পক্ষের সন্ধি। রণক্লান্ত ইউরোপ সন্ধি ক'রে বাঁচল।

ভার্সাই সন্ধির ফলে হ'ল জার্ম্মাণীর অঙ্গচ্ছেদ। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে স্বতন্ত্র দুইটি রাষ্ট্রে পরিণত করা হ'ল। আফ্রিকায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে যে সব জার্ম্মাণ উপনিবেশ ছিল সেগুলি জার্ম্মাণীর হস্তচ্যুত হ'ল। মিত্রশক্তির বিনা অনুমতিতে জার্ম্মাণীর অস্ত্রসজ্জা বাড়াবার অধিকার রইল না। কিন্তু তাতে জার্ম্মাণীর ক্ষাত্রশক্তি নষ্ট হ'ল না, মিত্রশক্তির সমস্ত সাবধানতা নষ্ট ক'রে দিয়ে জার্ম্মাণী গোপনে সমরসম্ভার নির্ম্মাণে আত্মনিয়োগ ক'রল। বিগত মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় দেশগুলিতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘ'টতে আরম্ভ ক'রল। রাশিয়ার জার সবংশে নিহত হ'লেন, জার্ম্মাণীর কাইজার রাজ্য ত্যাগ ক'রে হল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন এবং বিপরীত মতাবলম্বীদের কঠোর হস্তে দমন ক'রে জার্ম্মাণীর শাসনতন্ত্র করতলগত ক'রে ব'সলেন নাৎসী নেতা হের হিটলার। জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়ক হ'য়ে প্রথমেই তিনি চেষ্টা ক'রলেন জার্ম্মাণীকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে পরিণত ক'রতে।

অ্যাডলফ্ হিটলার

যুদ্ধের পরিণাম যে কত ভীষণ তা ভাল ক'রে বুঝে ভবিষ্যতে যুদ্ধ উঠিয়ে দেবার কল্পনা নিয়ে ভার্সাই সন্ধির সময়ই 'রাষ্ট্রসংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান অবশ্য স্থাপিত

হ'য়েছিল কিন্তু এই 'রাষ্ট্র-সংঘের' হাতে সত্যিকার কোন ক্ষমতা ছিল না। শক্তিশালী কোন রাষ্ট্র যুদ্ধ-কামী হ'য়ে উঠলে তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানের ছিল না। তার প্রমাণ মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযান।

ইটালীর ফ্যাসিস্ট-নেতা মুসোলিনী রাজ্যলোভে যখন আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় অভিযান করেন তখন

সিনর মুসোলিনী

ডাঃ সুশ্‌নিগ

হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনীর একটা গোপন পরামর্শ হ'য়েছিল; এই পরামর্শের প্রথম বলি হ'ল অষ্ট্রিয়া।

মুসোলিনীর আগ্রহে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হ'ল সেই সন্ধির সুযোগ নিয়ে জার্ম্মাণী ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এক রাত্রিকালে বিনা রক্তপাতে অষ্ট্রিয়া দখল ক'রে ব'সল এবং অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রনেতা ডাঃ সুশ্‌নিগ্ হ'লেন জার্ম্মাণীর বন্দী।

অষ্ট্রিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র চঞ্চল হ'য়ে উঠল এবং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলি নাৎসী রাজ্যলিপ্সা কোন পথে, কার মাথার উপর, কবে খাড়া তুলবে বুঝতে না পেরে সচকিত হ'য়ে রইল। ক্ষীণ প্রতিবাদ যা উঠল হিটলারের পরিকল্পনা তাতে মোটেই ব্যাহত হ'ল না।

হিটলারের দ্বিতীয় বলি চেকোশ্লোভাকিয়া। ভার্সাই

নেভিল চেম্বারলেন

সন্ধির ফলে হাঙ্গেরী ও জার্ম্মাণীর অংশবিশেষ নিয়ে এই রাষ্ট্র গঠিত হ'য়েছিল। হিটলার অতঃপর দাবী ক'রে ব'সলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অংশ—যা ছিল মূলতঃ জার্ম্মাণ অধ্যুষিত। ইউরোপের সব রাষ্ট্রনায়ক তখন চঞ্চল হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলেন এই ভাঙ্গাগড়ার শেষ কোথায়? যুদ্ধ আসন্ন হ'য়ে উঠল। ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী রাইট অনারেবল্ নেভিল

প্রেসিডেন্ট ডাঃ বেনেস্

মিউনিক চুক্তির প্রাক্কালে, (সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)
রাইট অনারেবল্ নেভিল চেম্বারলেন, মঁসিয়ে দালাদিয়ের, হের হিটলার, সিনর মুসোলিনী

স্ট্যালিন

চেম্বারলেন অনিবার্য্য ভবিষ্যৎকে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদে সম্মতি দিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ মিউনিক চুক্তিতে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ বেনেস্ পদত্যাগ ক'রে আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। এই চুক্তি নিষ্পন্ন হ'ল ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইটালী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে। এই আলোচনায় রাশিয়ার কোন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন না।

সুদেতেন অঞ্চল গ্রাস ক'রেই জার্ম্মাণীর রাষ্ট্র-ক্ষুধা কিছু নিবৃত্ত হ'ল না। ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে ছিন্ন প্রদেশ চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি হাচাকে জার্ম্মাণীতে নিমন্ত্রিত ক'রে নিয়ে তাঁকে নানা রকম ভয় দেখিয়ে তাঁর উপর অনেক অত্যাচার ক'রে হিটলার তাঁকে বাধ্য ক'রলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিতে। স্বাধীন চেকরাষ্ট্র ইউরোপের মানচিত্র হ'তে মুছে গেল।

ম'সিয়ে মলোটোভ

১৯১৯ সালের সন্ধির ফলে ইউরোপে যে সব রাজ্য গ'ড়ে উঠেছিল, পূর্ব্ব ইউরোপের পোল্যাণ্ড ছিল তার অন্যতম। পূর্ব্ব প্রাশিয়ার খানিকটা আর রাশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশ নিয়ে এই রাষ্ট্র গঠিত হ'য়েছিল। হিটলারের শ্যেনদৃষ্টি অচিরেই এই পোল্যাণ্ডের উপর প'ড়বে এটা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যেতেই ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়ের এবং ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চেম্বারলেন অহেতুক-আক্রমণ থেকে পোলাণ্ড রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইউরোপের জটিল রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় সকলেই চেয়ে রইলেন অপাংক্তেয় রাশিয়ার কর্ণধার স্ট্যালিনের দিকে—তাঁর সাহায্য ইউরোপের রাষ্ট্র ভাঙ্গাগড়ার এই খেলায় সকলের নিকটই কাম্য হ'য়ে উঠল। পোল্যাণ্ড রুশিয়ার সাহায্য নিতে অসম্মত হ'য়ে ব'সল এবং ইংলণ্ড দীর্ঘ তিন মাস কাল রুশিয়ার সহিত পারস্পরিক সাহায্যের একটা চুক্তির জন্য কথাবার্ত্তা চালিয়েও কোন সন্ধি ক'রে উঠতে পারল না। অবশেষে ১৯৩৯ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে রুশ পররাষ্ট্রসচিব মলোটোভ এবং জার্ম্মাণ পররাষ্ট্রসচিব হের ভন রিবেনট্রপের মধ্যে এক রুশ-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি সংঘটিত হইল।

হের ভন্ রিবেনট্রপ

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক

এইবার হ'ল পটপরিবর্ত্তন। জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ডের উপকূলে ডানজিগ বন্দর এবং পোলিশ করিডর দাবী ক'রে ব'সলেন। পোল্যাণ্ড এ দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করায় যুদ্ধ ঘোষণা না ক'রেই ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ

৩রা সেপ্টেম্বর স্মরণীয় রবিবার [illegible] জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে ব্রিটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে বেতারবার্তা [illegible] প্রচার করেন।

ক'রে ব'সলেন। অবশেষে অবাঞ্ছিত যুদ্ধ নিতান্ত নির্মমভাবেই আত্মপ্রকাশ ক'রল। শান্তিকামী ইংরাজ জাতি রবিবারের সকাল ১১টার সময় মৃত্যুলীলায় আহুতি যোগাবার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে বাধ্য হ'ল। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের অধিপতি সম্রাট ৬ষ্ঠ জর্জ আর ফরাসী সরকার পোল্যাণ্ডের উপর এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদ কল্পে জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে বাধ্য হ'লেন।

মাত্র সাত দিনে জার্মাণ পোলিশ করিডর দখল ক'রে ব'সল, আর আটাশ দিনে পতন হ'ল পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারসর। পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হ'বার সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়া এসে পূর্ব্ব পোল্যাণ্ডে চেপে ব'সল এবং হিটলারের সঙ্গে আপোষে পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি ক'রে নিল।

ইউরোপের এই 'ডামাডোলের' বাজারে রুশিয়া নিঃশব্দে পর পর লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হস্তগত ক'রে হাত বাড়াল ফিনল্যাণ্ডের উপর। ৩০শে নভেম্বর (১৯৩৯) ঘটল রুশিয়া আর ফিনল্যাণ্ডের ভিতর সংঘর্ষ। মার্চ্চ মাসে (১৯৪০) ইংরেজ ও ফরাসীর সাহায্য দানের প্রস্তাব উপেক্ষা ক'রে ফিনিশ গভর্ণমেণ্ট রুশিয়ার প্রদত্ত সর্ত্তে রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধি ক'রলেন।

মার্চ্চ মাসের বিশ তারিখে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়েরের পদত্যাগ করায় মঁসিয়ে রেণো ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার ক'রলেন।

জেনারেল গ্যামেলাঁ।

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত একদিকে জার্ম্মাণী আর অন্য দিকে জেনারেল গ্যামেলাঁর অধিনায়কত্বে সম্মিলিত ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী পরস্পর সম্মুখীন

রাজা হাকন

হ'য়েও নীরবে শক্তি সঞ্চয় ক'রে যাচ্ছিল। কোন পক্ষই অপর পক্ষকে ব্যাপক আক্রমণ ক'রতে অগ্রসর হয় নি। অবশ্য জলপথে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ প্রথম থেকেই কিছু কিছু চ'লে আসছিল। ৯ই এপ্রিল জার্ম্মাণী নিরপেক্ষ ডেনমার্কের মধ্য দিয়ে আর একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নরওয়েকে আক্রমণ ক'রে ব'সল। ডেনমার্কের রাজা ক্রিশ্চিয়ান নীরবে আত্মসমর্পণ ক'রলেন। কিন্তু নরওয়ের রাজা হাকন যুদ্ধ করাই সঙ্গত মনে ক'রে শত্রুকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। মিত্রপক্ষ নরওয়ের রাজাকে সাহায্য ক'রতে অগ্রসর হ'লেন, কিন্তু সে সাহায্য ফলবতী হ'ল না। ১৯৪০ সালের ১লা মে বৃটিশ সৈন্যদলকে নরওয়ে থেকে অনেক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে দেশে ফিরে আসতে হ'ল। নরওয়েতে বৃটিশ সৈন্যের শোচনীয় ব্যর্থতা উপলক্ষ ক'রে চেম্বারলেন মন্ত্রী-সভার পতন ঘ'টল এবং গত মহাযুদ্ধের নৌ-বিভাগীয় মন্ত্রী রাইট অনারেবল মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত হ'লেন।

উইনষ্টন চার্চ্চিল

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ইতিহাসে

১০ই মে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এই দিন জার্ম্মাণী যুগপৎ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ও লুক্সেমবার্গ আক্রমণ ক'রে ব'সল। লুক্সেমবার্গের গ্রাণ্ড্-ডাচেস্ বিনাবাধায় তার দেশ জার্ম্মাণীর হাতে ছেড়ে দিয়ে প্যারিসে চ'লে গেলেন। তিন দিন যুদ্ধের পর হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা চ'লে গেলেন লণ্ডনে এবং ১৪ই মে হল্যাণ্ডের সেনাপতি জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ ক'রলেন। ১৯৪০ সালের ২৮শে মে বেলজিয়ামের রাজা লিয়োপোল্ড্ বিনা সর্ত্তে জার্ম্মাণীর সঙ্গে সংগ্রাম বন্ধ করেন। এর ফলে জার্ম্মাণ যুদ্ধের প্রচণ্ডতা

রাণী উইলহেলমিনা

সম্পূর্ণভাবে ফ্রান্সের উপর এসে প'ডল। নিতান্ত প্রয়োজনে ১লা জুন ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গর্ট্ তিন লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার বৃটিশ্ সৈন্য নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন।

রাজা লিয়োপোল্ড

১০ই জুন একদিকে ইটালী, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রল আর অন্য দিকে নরওয়ের রাজা হাকন্ যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। জেনারেল গ্যামেলাঁকে সরিয়ে সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়কত্ব দেওয়া হ'ল জেনারেল ওয়েগাঁকে;

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সের সৈন্য দল ক্রমশঃই বাধা দানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিল। অনেক বিবেচনার পর প্যারিস নগরী শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে মঁসিয়ে রেণো

জেনারেল দাগল

গভর্ণমেণ্ট স্থানান্তরিত ক'রলেন। ১৭ই মে মঁসিয়ে রেণো পদত্যাগ করায় মার্শাল পেতার নেতৃত্বে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হ'ল। জেনারেল দাগল ফ্রান্স পরিত্যাগ ক'রে ইংলণ্ডে চ'লে এলেন।

অবশেষে ভার্দুন-বিজয়ী পেতাঁ জার্ম্মাণীর নিকট ২২শে জুন আর ইটালীর নিকট ২৪শে জুন পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ক'রলেন। এই ভাবে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রথম অঙ্কের পরিসমাপ্তি হ'ল।

বর্ত্তমান যুদ্ধের দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় সবে আরম্ভ হ'য়েছে; এখনও এর পটভূমি পরিষ্কার বোঝা যায়নি। এই অঙ্কের প্রথমেই নব-লব্ধ রাজ্যসমূহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ক'রে জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের উপর প্রচণ্ড শক্তিতে ভেঙ্গে প'ড়ল। ইংলণ্ডের উপর বিমান আক্রমণের নিষ্ঠুরতায় সমস্ত সভ্য জগৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ইংলণ্ডকে সাহায্য ক'রতে সম্মত হ'লেন। বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য ক'রতে অগ্রসর হ'য়েছে; কিন্তু একমাত্র আইরিশ প্রেসিডেন্ট ডিভেলেরা র'য়েছেন নিরপেক্ষ। অতএব মনে হয় যুদ্ধের দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনীত হবে বল্কানে। আল্‌বেনিয়া আগেই ইটালীর কুক্ষিগত হ'য়েছে। রুমানিয়ার রাজা ক্যারল একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য ত্যাগ ক'রে চ'লে গে'ছেন। জার্ম্মাণী এসে কার্য্যতঃ রুমানিয়া দখল ক'রে ব'সেছে। বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লোভিয়ার মনোভাব অনিশ্চিত। হাঙ্গারী ও রুমানিয়া প্রকাশ্যভাবে হিটলারের পরিকল্পিত

জেনারেল ওয়েগাঁ

মার্শাল পেতাঁ

গ্রীসের রাজা জর্জ

রাজা ক্যারল

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

নব বিধান বা নিউ অডার ("New Order")-এ যোগ দিয়েছে এবং হৃতবীর্য্য ফ্রান্স বিজয়ী জার্ম্মাণীর সকল ইচ্ছা পূরণ ক'রে যাচ্ছে।

বল্কানের অন্যতম স্বাধীন গ্রীক জাতিকে হুমকী দিয়ে ভয় দেখাতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত ইটালী গ্রীস আক্রমণ ক'রেছে এবং গ্রীসের রাজা জর্জ্জ ও গ্রীক প্রধান মন্ত্রী মেটাক্সাসের আবেদনে ব্রিটেন আক্রান্ত বন্ধুকে সাহায্য ক'রছে।

জেনারেল মেটাক্সাস্

গ্রীস ইটালীর তুলনায় দুর্ব্বল, তবু ইটালীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে গ্রীস ইটালীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য ক'রছে। ইটালীর দুর্দ্ধর্ষ বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে ক্ষুদ্র গ্রীস আজ আল্‌বেনিয়ার মধ্যে বেশ খানিকটা অগ্রসর হ'য়েছে। হিটলারের সমস্ত পরিকল্পনা ফলে হ'য়ে প'ড়েছে অনিশ্চিত। ওদিকে তুরস্কে প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনেনু যুদ্ধের জন্য সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ক'রছেন। বল্কান রাজ্যসমূহের সাধারণ

প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনেনু

রাজা ফারুক

পরিস্থিতি ক্রমেই জটিলতর হ'য়ে উঠছে।

ফ্রান্সকে পদানত ক'রে ইটালী কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে নাই। ভূমধ্য সাগরের আধিপত্য করতলগত ক'রবার দুর্জ্জয় প্রয়াসে ইটালী অভিযান ক'রেছে মিশরের দিকে। রাজা ফারুক এখনও যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবল নিয়ে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ইটালীর অগ্রগতি বন্ধ করবার চেষ্টা ক'রছেন।

এশিয়ায় যুদ্ধ

মহাযুদ্ধের মহাতাণ্ডব লীলা এশিয়াতেও ছড়িয়ে প'ড়েছে। তিনবছর আগে জাপান অকারণে চীন আক্রমণ ক'রেছিল। নির্ব্বিরোধী মহাচীনের একমাত্র অপরাধ তার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য আর অসামরিকতা। তবুও আজ পর্য্যন্ত চীন মার্শাল চিয়াং-কাই-শেকের নেতৃত্বে প্রাণপণে জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সায় বাধা দিয়ে যাচ্ছে। বর্ত্তমান ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দৌর্ব্বল্যের সুযোগ

মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক

নিয়ে ফরাসী ইন্দোচীনে ঘাঁটি নির্ম্মাণ ক'রে চীনের বাধাদানের এই চরম প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ ক'রতে জাপান অগ্রসর হ'য়েছে।

সম্প্রতি ইটালী ও জার্ম্মাণীর সঙ্গে জাপান এক নূতন মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়েছে। এর ফলে তিন বৎসর জীবন-মরণ সংগ্রামের পর চীন-জাপান যুদ্ধে নূতন জটিলতার সৃষ্টি হ'য়েছে। অল্পদিন পূর্ব্বে জাপান চীন-অভিযানের পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন ক'রেছে; কিন্তু সে শান্তি-প্রস্তাবের মধ্যে আন্তরিকতার একান্ত অভাব আর কূটবুদ্ধির সুস্পষ্ট প্রাচুর্য্য থাকায় জাগ্রত চীন সে প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য ক'রেছে।

বিশ্বব্যাপী এই রণাঙ্গনে ভারতবর্ষকেও অতি স্বাভাবিকভাবেই হয়ত একদিন প্রবেশ ক'রতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রণনীতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে—সে কথা আজ আমাদের বোঝবার সময় এসেছে। অতি আদিম কালে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল স্থলে; দেশবিদেশের সংযোগের ফলে জলযুদ্ধ অনিবার্য্য হ'য়ে দাঁড়াল। তারপর থেকে মানুষের একমাত্র চেষ্টা হ'য়ে দাঁড়াল জলে ও স্থলে আধিপত্য বিস্তারের। শুধু জলে ও স্থলে যুদ্ধ আজ সীমাবদ্ধ নয়। জয়ের আশায় জল, স্থল, অন্তরীক্ষে, আজ মানুষকে বাহিনী গঠন ক'রতে হ'য়েছে। শুধু জল, স্থল, অন্তরীক্ষই বা বলি কেন, আজকের দিনের যুদ্ধে অপরিমেয় অস্ত্রসম্ভার নিয়ে পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব-সম্পন্ন অন্ততঃ পাঁচটী বাহিনী গঠন ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হয়। পর পর এই পাঁচটী বাহিনীর নাম করছি।

(১) আকাশ বাহিনী।

(২) জল বাহিনী।

(৩) স্থল বাহিনী।

(৪) প্রচার বাহিনী।

(৫) পঞ্চম বা বিভীষণ বাহিনী।

এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই হবে আমাদের পরবর্ত্তী অধ্যায় কয়টীর উদ্দেশ্য।

আকাশে বাহিনী

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন মারণাস্ত্রের সৃষ্টি হয় আর যুদ্ধের ধারা বদলাতে থাকে। গত মহাযুদ্ধে যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব অনেকটা পরিমাণে ছিল ট্যাঙ্কের। এই অদ্ভুত সচল দুর্গগুলি কাঁটাতারের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে, শত্রুর সুরক্ষিত পরিখা ডিঙ্গিয়ে, প্রাকার প্রাচীর চূর্ণ ক'রে, শত্রুর ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়েছিল। ঐ যুদ্ধে বিমানের ব্যবহারও হ'য়েছিল, কিন্তু তখন উভয় পক্ষের বিমান-সংখ্যা ছিল নগণ্য; আর আজকের দিনের তুলনায় সেদিনের বিমান ছিল একেবারে শিশু। ঘণ্টায় একশ' মাইলের বেশী যেতে পারে, এমন বিমানের কল্পনাও কেউ তখন ক'রতে পারেনি। অবশ্য ১৯১৮ সালে যখন যুদ্ধবিরতি হ'ল, তখন উভয় পক্ষেরই বিমান সংখ্যাও বেড়েছে, আর বিমানের কলকব্জারও বহু উন্নতি হ'য়েছে। কিন্তু তখনও বিমানের সাহায্যে আক্রমণ চালান অথবা বিমানে যাতায়াত করা মোটেই সহজ ছিল না—বরং এতে জীবনের ভয় ছিল খুবই বেশী। বিচক্ষণ সমরবিশারদেরা কিন্তু তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, ভবিষ্যতে যে যুদ্ধ হবে তাতে বিমানের মারণশক্তি অতি প্রচণ্ড হ'য়েই দেখা দেবে এবং

অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন যে, এক আকাশ বাহিনীর সাহায্যেই ভবিষ্যতের যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হবে। তাই যুদ্ধ থেমে যাবার পর সকল দেশেরই নজর পড়ল—কি ক'রে বিমানের উন্নতিসাধন করা যায়। প্রকাশ্যে ও গোপনে নানা রকম চেষ্টা ও পরীক্ষা চলতে লাগল; কুড়ি বছর পরে দেখা গেল, সব দিক দিয়েই বিমানের আশাতীত উন্নতি হ'য়েছে।

বিমান-যুদ্ধের সুবিধা

বিমান-যুদ্ধের প্রধান সুবিধা অতর্কিতে আক্রমণ করা। অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে একদিকে যেমন বিপক্ষের সৈন্য ক্ষয় করা যায়, অন্যদিকে তেমনি নাগরিক-গণের ধনপ্রাণ নষ্ট ক'রে—ভয় দেখিয়ে—তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল এমন কি অচল ক'রে ফেলা যায়। শেষ পর্য্যন্ত ভয়ে দ'মে গিয়ে এই সব নাগরিকেরা দেশের গভর্ণমেণ্টকে এমন চাপ দিতে থাকে আর এত বিব্রত ক'রে তোলে যে, গভর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি বিপক্ষের সঙ্গে একটা রফা ক'রতে বাধ্য হয়।

আজকাল যে সব বিমান তৈরী হ'চ্ছে বা যুদ্ধের জন্য যেগুলিকে ব্যবহার করা হ'চ্ছে, সেগুলো সাধারণতঃ ঘণ্টায় দু'শ' থেকে চারশ' মাইল পর্য্যন্ত ছুটতে পারে। এতে যুদ্ধ চলে ক্ষিপ্রগতিতে—এত ক্ষিপ্রগতিতে যে আগে থেকে তৈরী না হ'লে শত্রুর হাতে বাঁচবার কোন উপায়ই থাকে না। আকাশ বাহিনী যুদ্ধে একটা বড় অংশ নিয়েছে ব'লে আজ যুদ্ধের ধারায় একটা খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। সেটা হ'চ্ছে এই যে, এখন যুদ্ধের কোন নির্দ্দিষ্ট 'ফ্রন্ট' নেই—বিশেষ কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। লক্ষ লক্ষ সৈন্য কামান সাজিয়ে শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে যেখানে প্রতীক্ষা ক'রছে, আক্রমণ সেখানে মোটেই হ'ল না, আক্রমণ হ'ল সৈন্যব্যূহের হয়ত পঞ্চাশ মাইল পিছনে; এক ঝাঁক বোমারু বিমান হয়ত হঠাৎ বাজের মত ছোঁ মেরে পরে সৈন্যদের পিছনের সংযোগসূত্র দিল ছিন্ন ক'রে, আর তার ফলে শত্রু হ'য়ে প'ড়ল বিশেষ বিব্রত।

বিমান আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু

বিপক্ষ সৈন্য ধ্বংস করাই যখন বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য, তখন শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলি যে বিমানযোগে আক্রমণ করা হবেই, এ কথা ত না ব'ললেও চলে।

কোথাও সৈন্যেরা জলপথে নদী পার হ'চ্ছে বা স্থলপথে ক্রমাগত এগিয়ে চ'লেছে অথবা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার-দাবার রসদপত্র নিয়ে জাহাজ বা লরী যাত্রা ক'রেছে, এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে বিমানযোগে তাদের উপর চড়াও করা হ'লো। আক্রমণ যদি প্রবল হ'ল, তবে হয়ত জাহাজ ডুবে অনেক রসদ নষ্ট হ'য়ে গেল, বোমার ঘায়ে কিছু সৈন্য মারা প'ড়ল—যারা টিকে গেল, তারাও ছত্রভঙ্গ হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করবার কোন সুবিধাই সৈন্যেরা পেল না। সামরিক গুরুত্ব যাঁর আছে অর্থাৎ যুদ্ধ চালাবার পক্ষে যেগুলি অত্যন্ত দরকারী,

বোমার ঘায়ে সেতু ভেঙ্গে প'ড়েছে

সেগুলির উপর বিমান আক্রমণ হ'লেই শত্রুর অসুবিধা বেশী হয়। বোমা ফেলে পঞ্চাশ খানা বাড়ী ধূলিসাৎ করে দিয়ে শত্রুর যে পরিমাণ ক্ষতি করা যায়, অনেক সময় তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করা যেতে পারে রেলপথের একটা সেতু উড়িয়ে দিয়ে।

শত্রুপক্ষের বিভিন্ন সামরিক, বেতার ও বিমান ঘাঁটিগুলি, দেশের শিল্পকেন্দ্র,

কলকারখানা, বন্দর, রেলপথ, বড় বড় নগরের আলো ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা, এই গুলিই বিমান আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু। যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত কোন জাতিই তার স্বাভাবিক শিল্পগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না। তখন প্রায় সব কারখানা-গুলিই যুদ্ধের জন্য দরকারী জিনিষপত্র, মাল-মসলা, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি তৈরী ক'রতে লেগে যায়। সেইজন্যই শত্রুপক্ষ বিমান দিয়ে প্রথমেই আক্রমণ চালায় এই সব কলকারখানার উপর। এই আক্রমণের প্রধানতঃ দুটো উদ্দেশ্য থাকে—প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য এই যে কারখানা নষ্ট ক'রে দিতে পারলে বিপক্ষ সৈন্যেরা

বোমায় বিধ্বস্ত বাড়ী

দরকারী জিনিষ পাবে না ; আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—শ্রমিকদল ভয় পেয়ে কারখানার কাজ ছেড়ে দেবে এবং বেকার হ'য়ে দেশের মধ্যে একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রে তুলবে।

বিদ্যুতের ও গ্যাসের কারখানা আর পেট্রলের গুদামের উপরও শত্রুপক্ষের নজর প্রথম থেকেই থাকে অতিশয় তীক্ষ্ণ। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হ'লেই সব

কারখানা অচল—আর পেট্রল ফুরিয়ে গেলে ত' সৈন্য চলাচল অসম্ভব, কারণ ট্যাঙ্ক, লরী, বিমান—এগুলি চ'লবে কিসে! এ ছাড়া রেলওয়ে এবং সেতু—এগুলি নষ্ট ক'রেও সৈন্য চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য।

বড় বড় সহরে জল সরবরাহ নষ্ট ক'রে দিতে পারলে সহরবাসীদের প্রাণ বাঁচান হবে দুষ্কর। এর ফলে তাদের যতই অসুবিধা হবে, ততই তারা গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দেবে—যাতে যাহোক একটা আপোষ ক'রে তাদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হ'তে পারে।

বিমান আক্রমণের এইগুলি হ'চ্ছে প্রধান লক্ষ্য—এ ছাড়া লোকের যাতে অসুবিধা হয়, এমনতরো অনেক জিনিষই আক্রমণ করা হ'য়ে থাকে। বড় বাড়ী, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ঘাঁটি ও অন্যান্য আশ্রয়স্থল, কোনটাই বাদ দেওয়া হয় না।

বিমান আক্রমণের সাধারণ পদ্ধতি

এ সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা আরম্ভ করবার আগে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে বিমান আক্রমণ কত রকম ভাবে চালিত হয়। মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে বিমান আক্রমণ হ'তে পারে দু'রকমের। দরকার মত বিমান আক্রমণ হবে 'স্বয়ংক্রিয়' অর্থাৎ স্থলবাহিনী বা জলবাহিনীর কোন সাহায্য না নিয়ে কিংবা তাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে কিছু করবার উদ্দেশ্য না রেখে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে শত্রুরাজ্যে হানা দেওয়াকে বলা যেতে পারে বিমান আক্রমণের স্বয়ংক্রিয় ধারা। এমনিতরো আক্রমণের উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীরা শত্রুর বিশেষ বিশেষ ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে তাকে দুর্ব্বল করবার দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা করে এবং দরকার হ'লে বাধাদানকারী শত্রু বিমানের সঙ্গে সমান ভাবে যুদ্ধ করতে পিছপা হয় না। আর একদিকে বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য হ'তে পারে 'যৌথ' অর্থাৎ আবশ্যক মত অন্যান্য বাহিনীকে সাহায্য করা। শত্রু হয়ত পিছনে হঠ্‌চে আর আক্রমণকারী সৈন্য ছুটেছে তার পিছনে, তখন উপর থেকে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালিয়ে পলায়নপর স্বপক্ষ বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবার চেষ্টা করা হ'ল, কিংবা মাঝ সমুদ্রে

স্থল বাহিনীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শত্রুর ট্যাঙ্কের উপর বিমান আক্রমণ চালান হ'চ্ছে

দু'পক্ষের জাহাজে বেধেছে যুদ্ধ, তখন বিমান আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে কাবু করবার চেষ্টা করা হ'ল। এই সব হচ্ছে যৌথ আক্রমণের ধারা। এক্ষেত্রে বিমান আক্রমণ চালিত হয় শুধু অন্য বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্য। যে কোন প্রকারে জয়লাভ করাই যখন যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীর মধ্যে পরস্পর সাহায্য করবার ব্যবস্থা না থাকলে চরম উদ্দেশ্য কি ক'রে সিদ্ধ হ'তে পারে?

বিমান আক্রমণের ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নাই এবং ঠিক ফরমুলা মত কোন আক্রমণ সম্ভবও নয়। কেননা শত্রুপক্ষ যদি আগে থেকে জানতে পারে যে কি নিয়মে আক্রমণ চল্‌বে, তবে আক্রমণের ঈপ্সিত ফল ত' হবেই না বরং উল্টো বিপত্তি ঘটবে নিজেদেরই।

আক্রমণের উদ্দেশ্যে কখনও অসংখ্য বিমান একত্রে আসে না। এক এক ঝাঁকে খুব বেশী হ'লেও পঁচিশ ত্রিশ খানা বিমান শত্রুরাজ্যে হানা দেয়।

মুসোলিনী একবার একটা বক্তৃতায় ব'লেছিলেন যে, তিনি বিপক্ষের উপর বিমান আক্রমণের জন্য এক একবারে এতগুলি বিমান একসঙ্গে পাঠাবেন যে বিমানের সার দিয়ে স্থর্য্যকে ঢেকে ফেলা হবে। এটা শুধু আস্ফালন, কাজের বেলা এ ব্যবস্থা অসম্ভব ও অচল, কারণ তাতে বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। একসঙ্গে অনেক বেশী বিমান থাকলে বিপক্ষ যেমন তেমন ক'রে গুলি ছুঁড়্‌লেও দু'চারখানা আক্রমণকারী বিমান ধরাশায়ী হবেই। শত্রুপক্ষের বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলোর তাহ'লে কষ্ট ক'রে কোন তাক্ করতে হ'বে না।

কিন্তু তাই বলে দু'খানা বা একখানা বিমান দিয়ে কখনও ব্যাপক আক্রমণ চালান যায় না। কারণ বোমা ফেলা কাজটা এমনি যতটা সহজ মনে হয়, আসলে ঠিক কিন্তু ততটা সহজ নয়। তাছাড়া প্রত্যেক আক্রমণেই আক্রমণকারীদের দু'চারখানা বা তারও বেশী বিমান নষ্ট হয়ই। তাই একদলে অনেকগুলি বিমান থাকলে, দু'চারখানা গেলেও তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা একেবারে অসম্ভব হয় না। সেইজন্যই আক্রমণের সময় বিমানগুলো আসে দল বেঁধে—কিন্তু সার বেঁধে নয়,

কারণ তাহ'লে শত্রুপক্ষ অতি সহজে আক্রমণকারী বিমানগুলোকে ঘায়েল করবার সুবিধা পায়।
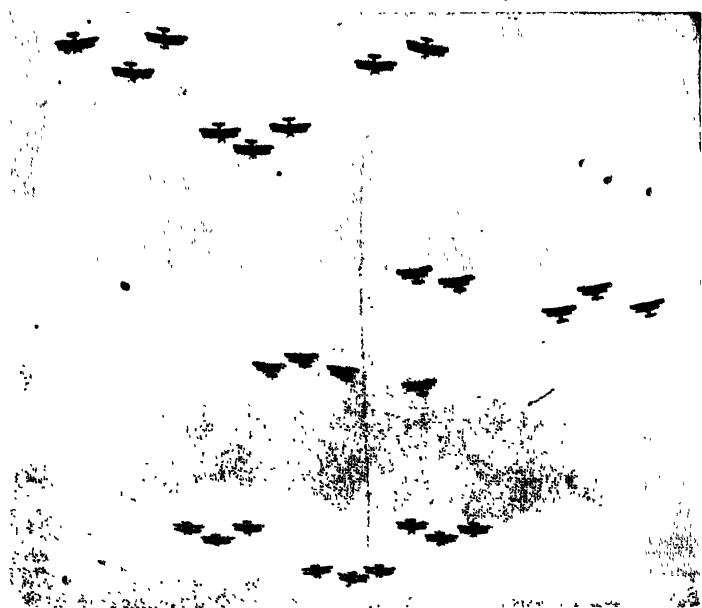
বিমানগুলো আসে দল বেঁধে—কিন্তু সার বেঁধে নয়।

একসঙ্গে পাঁচ থেকে আরম্ভ ক'রে পঁচিশ ত্রিশ খানা বিমান আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে এগিয়ে আসে ও শত্রুপুরীতে বোমা ফেলে অথবা গ্যাস ঢেলে তাদের বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকলেও তারা কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে খুব বেশী দূরে দূরে থাকে না, কারণ বেশী দূরে দূরে থাকলে বিপক্ষের আক্রমণে পরস্পরকে সাহায্য করবার বিশেষ সুবিধা হয় না।

অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে একটার পর একটা আক্রমণকারী দল এসে তাদের আক্রমণ চালায় যাতে ক'রে আক্রান্ত শত্রু—তাদের ক্ষতি যা হয় তার সংস্কার ক'রে—পুনরায় আক্রমণের জন্য তৈরী হ'তে না পারে। তাছাড়া একই সময়ে

কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায় আক্রমণ করা হয় এই উদ্দেশ্য নিয়ে, যে এতে বিপক্ষদল হতভম্ব হ'য়ে প'ড়বে এবং তাদের আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়তে বাধ্য হ'বে।

এরোপ্লেন ও জেপ্‌লিন

কুড়ি পঁচিশ খানা বিমানের একটি দলকে যদি সচল রাখতে হয়, তবে কি পরিমাণ আয়োজন দরকার প্রথমেই তার একটা মোটামুটি হিসাব দিচ্ছি। পেট্রল ও বোমা, মেসিনগানের গুলি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সব সময় তৈরী রাখতে হবে। বৈমানিকদের শিক্ষাব জন্য স্কুল, কলেজ, যারা ফটোগ্রাফ তুলবে, যারা রেডিও যন্ত্রে কাজ ক'রবে, যারা আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ ক'রবে, যারা টেলিভিশন ও টেলিফোনের কাজ ক'রবে, যাবা জখম বিমান মেরামত ক'রবে, যারা প্যারাসুট তৈয়ারী ক'রবে, তাদের শিক্ষার জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত ক'বে রেখে তারপর একখানা বিমানকে আকাশে পাঠান যায়। এক একটি বিমানের জন্য খুব কম ক'রেও অন্ততঃ আট দশ জন অভিজ্ঞ লোকের দরকার হয়। কুড়ি খানা বিমানের একটা বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালাবার আগেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করবার জন্য প্রস্তুত কমের দিকে এক হাজার লোক দরকার। এক রাত্রির পেট্রলের খোরাকও কুড়ি খানা বিমানে কম পক্ষে দশ হাজার গ্যালন। দু' টন করেও যদি বোমা নিয়ে যাওয়া হয় তবে কুড়ি খানা বিমানের জন্য দরকার চল্লিশ টন বোমা—এ ছাড়া মেসিনগানের গুলি ত আছেই।

এইবার বিমান সম্বন্ধে দু' একটা কথা আলোচনা করা যাক। বিমান খুব নূতন জিনিষ না হ'লেও এর প্রচলন বেশীদিন হয় নাই। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে বিমানের বহুল ব্যবহার হয়নি, এ কথা আগেই ব'লেছি। সে যুদ্ধে একপ্রকার বিমান বেলুন ব্যবহাব করা হ'য়েছিল—তার নাম ছিল জেপ্‌লিন। জার্ম্মাণীর কাউণ্ট জেপ্‌লিন ছিলেন এব আবিষ্কারক। পরের ছবিখানি দেখলেই জেপ্‌লিন যে কত বড়, তা কতকটা বুঝতে পারা যাবে।

এই জেপ্‌লিনগুলি ছিল সাড়ে ছ'শ ফুট লম্বা আর আশী ফুট ব্যাসের এবং নীচের খাঁচাখানিতে ছিল লোক বসবার ব্যবস্থা। এই জেপ্‌লিনও চল্‌ত তেলে

এবং ফলে সহজেই বার হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচুতে উঠতে পারে। কলকব্জার উন্নতির ফলে আধুনিক নয় দশ টন ওজনের জেপ্‌লিনগুলির গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইলের মধ্যে। এই সব জেপ্‌লিনে লোকও থাকে পনর থেকে কুড়ি জন।
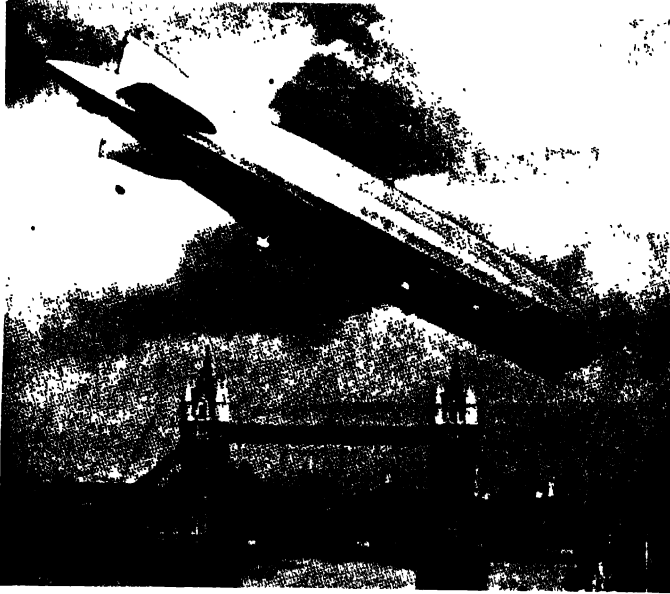
জেপ্‌লিন

আকাশ থেকে লণ্ডন সহরের নিরস্ত্র নাগরিক সমাজের উপর প্রথম আক্রমণ হয় ১৯১৫ সালের ৩১শে মে। এই আক্রমণ চালান হয় "এল্. জেড্ ৩৩" (LZ 33) নামে জার্ম্মাণ জেপ্‌লিন থেকে। তার আগে ১৯১৪ সালে পৃথিবীর চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্র হল্যাণ্ডের হেগ্ নগরীতে সমবেত হ'য়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, আকাশের বুক থেকে জেপ্‌লিন্ দিয়েই হোক বা বিমান দিয়েই হোক, কোন বিস্ফোরক ছোঁড়া হবে না। কিন্তু সমবেত চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্রের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মাত্র সাতাশটি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। যে সতরটি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেন নাই, তাদের মধ্যে জার্ম্মাণী অন্যতম।

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সূত্রপাতেই জার্ম্মাণী ফরাসী সীমান্তে জেপ্‌লিনের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণের কাজ চালাচ্ছিল। বিস্ফোরক ছোঁড়বার জন্য জেপ্‌লিনের ব্যবহার তখনও আরম্ভ হয় নাই; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ মহলে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা সুরু হ'য়ে গিয়েছিল। অবশেষে ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনেকবার ইতস্ততঃ ক'রে বিগত মহাযুদ্ধের নায়ক জার্ম্মাণীর কাইজার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জেপ্‌লিন আক্রমণে সম্মতি দিলেন।

ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ চালাতে প্রথম যে জেপ্‌লিন পাঠান হ'য়েছিল, দৈব-দুর্ব্বিপাকে ইংলিশ চ্যানেলের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যেয়েই কলকব্জা খারাপ হওয়ায় সেখানা ঘরে ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'ল। অবশেষে দেড় টন ওজনের ত্রিশটি অতি বিস্ফোরক ও উননব্বুইটি আগুনে বোমা নিয়ে এই LZ 33 যাত্রা ক'রল। জেপ্‌লিন খানি দশ হাজার ফিট উঁচু থেকে ঘুমন্ত লণ্ডন শহরের বুকের উপর প্রথম বোমা ফেলল ১৯১৫ সালের ৩১ মে রাত্রি পৌনে এগারটার সময়।

এই হ'ল প্রথম বিমান আক্রমণের ইতিহাস। বিমানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমান আক্রমণ কত ব্যাপক হ'য়েছে, আজ তা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

১৯১২ সালে ইংলণ্ডের সমরদপ্তর ঘোষণা ক'রেছিলেন যে, যুদ্ধের কার্য্যে ব্যবহৃত হ'তে হ'লে প্রত্যেক বিমানের থাকতে হ'বে কয়েকটা বিশেষ গুণ। সেগুলি হচ্ছে (১) স্থির আকাশে ঘণ্টায় অন্ততঃ পঞ্চান্ন মাইল গতিবেগ; (২) সাড়ে চার ঘণ্টা উড়্‌বার জন্য যতটা তেল দরকার তা ছাড়া আরও সাড়ে তিনশ' পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে চার মণ ভার বহনের ব্যবস্থা; (৩) একসঙ্গে কম পক্ষে তিন ঘণ্টা আকাশে ভেসে থাকা, এবং (৪) সাড়ে চার হাজার ফিট উঁচুতে উঠে যাওয়ার ক্ষমতা।

বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে এই ছিল শ্রেষ্ঠ বিমানের আদর্শ। আজ কিন্তু এই আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্ত ছেলেখেলা। এখনকার বিমান ছুটতে পারে ঘণ্টায় চারশ' মাইল বেগে; এক টন বা সাতাশ মণের বোমা ফেলে আসা এখনকার বিমানের পক্ষে অতি সাধারণ কথা; আর আকাশে একটানা বার ঘণ্টা ভেসে থাকা বা পাঁচ মিনিটের মধ্যে এগার হাজার ফুট সোজা উপরে ওঠা আজকালকার

বিমানের পক্ষে মোটেই একটা বিশেষ কিছু কঠিন কাজ ব'লে মনে হয় না। ১৯১৪ সাল থেকে পর পর বিমান গঠনের কিরূপ উন্নতি হ'য়েছে, নীচের ছবি থেকে তার একটা ধারণা হ'তে পারে।
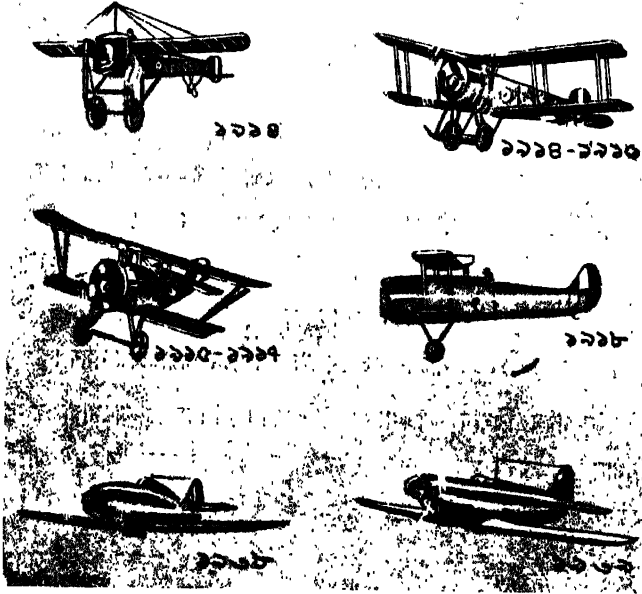
বিমানের ক্রমোন্নতি

আগে অনেক সময় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে যেতে অনেক বিমান অনেক বিপদে প'ড়েছে। কতক বা একেবারে সমুদ্রের বুকে প'ড়ে ত'লিয়ে গেছে, আবার কতক বা শত্রুর দেশে এমন কি শত্রুর ঘাঁটির মধ্যে নেমে প'ড়তে বাধ্য হ'য়েছে। এই সব দুর্দ্দৈবের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আজকাল বিমানগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তেল দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও অসুবিধা আছে বিস্তর। প্রথমতঃ গোলা গুলি, তেল ও আসবাব-পত্রের জন্য বিমানের আকার অত্যন্ত বড় হ'য়ে পড়ে এবং তার ফলে এর গতিবেগ যায় কমে। আবার অন্যদিকে যদি বিমানখানা নষ্ট হ'য়ে যায়, তবে অনেকটা তেলও তার সাথে সাথে নষ্ট হয়।

আজকার দিনের যুদ্ধে মানুষের জীবন নিয়ে অনায়াসে ছিনিমিনি খেলা চলে; কিন্তু এক ছটাক তেলেরও অপব্যয় করা চলে না! এইজন্য আজকাল এক এক দল বিমানের সাথে সাথে আবশ্যক মত তৈলবাহী বিমান পাঠান হয়। যদি কোন কারণে অকস্মাৎ কোন বিমানের তেল ফুরিয়ে যায়, তবে বিমানখানা নীচে না নেমে চট্ ক'রে তৈলবাহী বিমান থেকে নলের সাহায্যে প্রয়োজন মত তেল নিয়ে নেয়।

উপর আকাশে এক বিমান থেকে অন্য বিমানে তেল নেওয়া হ'চ্ছে।

আকাশের বুকে উড়তে উড়তেই এক বিমান থেকে আর এক বিমানে তেল নেওয়া হয় কথাটা শুনে অনেককেই হয়ত আশ্চর্য্য হ'তে হ'বে, কিন্তু আজকের দিনে নীচে না নেমে উপরে উড়ন্ত অবস্থায়ই যে নীচের চলন্ত জাহাজ বা মোটর থেকেও অনায়াসে বিমানে নাবিক পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় এটা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। উপরের বিমানখানার গতি এমনভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে নীচের মোটর বা জাহাজের গতি আর বিমানের গতি

হ'য়ে পড়ে সমান। তখন বিমান থেকে জাহাজে বা জাহাজ থেকে বিমানে লোক চলাচল ক'রতে পারে।
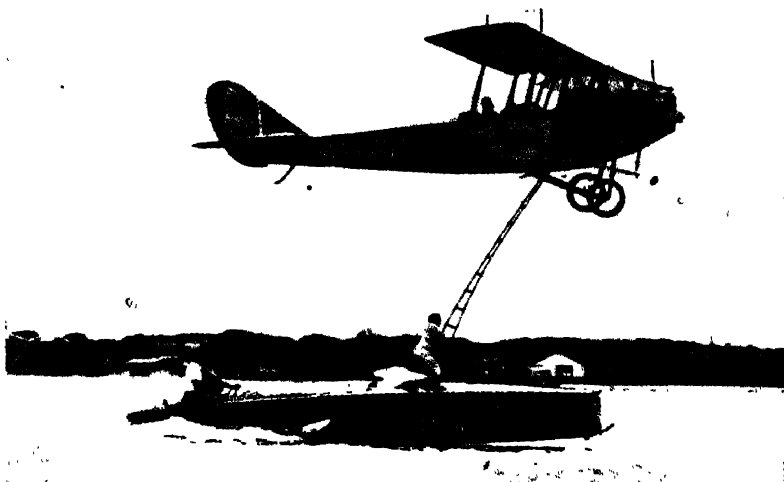
চলন্ত মোটর বোট থেকে চলন্ত বিমানে লোক নেওয়া হ'চ্ছে।

যুদ্ধের জন্য যে সব বিমান সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়, কি ভাবে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায়? যুদ্ধের সময় বিমানগুলি দিয়ে প্রধানতঃ তিন রকম কাজ করান হয়। (১) বিপক্ষ শিবিরের তথ্য সংগ্রহ; (২) শত্রুপুরীতে বোমা অথবা গ্যাস নিক্ষেপ; (৩) বিমান-যুদ্ধ।

পর্য্যবেক্ষক বিমান

প্রথম শ্রেণীকে বলা যায় পর্য্যবেক্ষক বিমান। এদের কাজ হ'ল নিজের দেশে ঘুরে ফিরে পাহারাওয়ালার কাজ করা আর দরকার মত শত্রুর দেশে গিয়ে তাদের সব রকম খবর নিয়ে আসা।

এই সব বিমানের মধ্যে থাকে শক্তিশালী ক্যামেরা বা ফটো তোলার যন্ত্র। শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলির মাথার উপরে উড়ে উড়ে ক্যামেরার সাহায্যে তাদের অবস্থানের এবং আয়োজনের, কলকারখানার আর শিল্পকেন্দ্রের এবং প্রধান প্রধান

ঘাঁটির ফটো তুলে নিয়ে আসাই হ'চ্ছে এই সব বিমানের বড় কাজ। এ কাজে বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী, কেননা নিজেদের গোপন কথাগুলো যাতে শত্রুপক্ষ জানতে না পারে, এর জন্য সকলেই বিশেষ সাবধান থাকে।
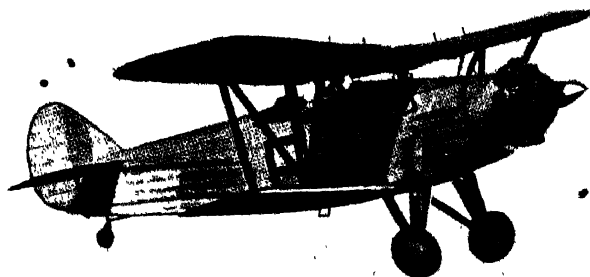
পর্য্যবেক্ষক বিমান

শত্রুব দেশে গেলে প্রথমেই তাদের পর্য্যবেক্ষক বিমানগুলোর চোখে পড়তে হয়, তাছাড়া আবাব ফটো তোলার জন্য বিমানখানাকে অনেক নীচে নেমে আসতে হয়—এত নীচে যে বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলোর পাল্লার মধ্যে এসে প'ড়তে হয়। তারপব যদিও বা ক্যামেরার সাহায্যে তাড়াহুড়ো ক'রে একটা ফটো তুলে নেওয়া গেল, তবুও হয়ত ফটো ও সমস্ত সাজসজ্জা শুদ্ধ বিমানখানি ধরা প'ড়ে গেল অথবা অন্য কোন কারণে বিমানখানা নষ্ট হ'য়ে গেল। এর ফলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ছবিখানা তোলা হ'লেও কর্ত্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁছাল না। অনেক চেষ্টার পর এখন শত্রুপক্ষের ঘাঁটির ছবি তুলে নেওয়ার একটা নূতন পদ্ধতি বের হ'য়েছে। এখন অনেক উপরে থেকে দূরবীণ সংযুক্ত ক্যামেরার সাহায্যে শত্রুশিবিরের নিখুঁত ছবি তুলে নিয়ে 'টেলিভিশন' যন্ত্র দ্বারা একেবারে প্রধান ঘাঁটিতে কর্ত্তৃপক্ষের চোখের সম্মুখে পরদার উপবে ফেলে দেওয়া যায়। এই কাজে বিমানগুলির এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না, তাছাড়া অনেক উপরে থাকার

জন্য তারা অন্ততঃ কতকটা যে নিরাপদে থাকে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। অকস্মাৎ যদি কোন বিপদ আপদ ঘটেই তবুও ছবিটা ঠিক উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে এসে পৌঁছুবেই। টেলিভিশন জিনিষটা খুব হালের আবিষ্কার, এখনও এটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠেনি; কিন্তু এর মধ্যেই তার সত্যিকারের প্রয়োগ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে।

বোমারু বিমান

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমানের নাম "বোমারু" বিমান—ইংরাজীতে বলা হয় বম্বার (Bomber)। এগুলি হ'চ্ছে মোটের উপর অতিকায়। সমর বিজ্ঞানে যখন বিমানের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়, তখন এই বোমারু বিমানগুলোকে পাহারা দেবার জন্য ছোট জাতের একরকম জঙ্গী বিমান পাঠান হতো, কিন্তু আজকাল প্রায় সব দেশেই বিমানের যন্ত্রপাতির এমন উন্নতি হ'য়েছে যে, এখন পাহারার জন্যে কোন বিমান বোমারুর সঙ্গে প্রায়ই পাঠান হয় না। আত্মরক্ষা ও শত্রুক্ষয় দুই কাজের উপযোগী ক'রেই আজকাল বোমারুগুলো তৈরী করা হয়। এইসব বোমারু বিমানগুলিতে সাধারণতঃ চারটি করে এঞ্জিন বসান থাকে, যাতে ক'রে হঠাৎ এঞ্জিন বিকল হ'যে কোন বিপত্তি না ঘটে। তাছাড়া বোমারু বিমানে আত্মরক্ষা করতে হবে ব'লে বেশ খানিকটা গোলা গুলি রাখতেই হয় এবং সেটা বিমানের মধ্যে এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়, যাতে শত্রু যে কোন দিক থেকে আক্রমণ ক'রলেও বোমারুগুলি আত্মরক্ষা করতে পারে।

এই সব বোমারু বিমানগুলিতে সাধারণতঃ তিন চার জন লোক থাকে। একজন 'পাইলট', একজন 'গোলন্দাজ', একজন 'নেভিগেটর' এবং একজন বোমা-নিক্ষেপক বা 'বম্ব্ড্রপার'। 'পাইলট' ও 'নেভিগেটর' বোমারুখানাকে চালিয়ে নিয়ে যান আর ঠিক নির্দ্ধারিত স্থানে উপযুক্ত মুহূর্ত্তে বোমাটা ফেলেন বম্ব্ড্রপার'। একটি বোতাম টিপলেই বাস্, বিমানের মাঝামাঝি স্থানে একটা জায়গার ঢাক্না খুলে যেতেই এক বা একাধিক বোমা খ'সে পড়ে টুপ্ ক'রে— একেবারে লক্ষ্য বস্তুর উপর!

অবশ্য বোমা ফেলার আগে অনেকগুলি জিনিষ লক্ষ্য করবার থাকে। প্রথমতঃ শত্রুর নাগালের বাইরে গিয়ে চলন্ত বিমান থেকে বোমা ফেলতে হবে। লক্ষ্যবস্তু কোথায় এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এজন্য লক্ষ্যবস্তুসমূহের অবস্থান চিহ্নিত ক'রে বৈমানিকগণকে একটা ক'রে নক্সা দেওয়া হয়।

যাত্রার পূর্বে নক্সা দেখা হ'চ্ছে।

ঠিক উপযুক্ত সময় হ'লেই বিমানখানি টুপ্ ক'রে নীচে নেমে যেই সুবিধা মত জায়গায় আসে, তখনি বোমারু তাঁর কাজ করেন—আর তারপরই বিমানখানি শোঁ ক'রে উপরে উঠে পড়ে। এইভাবে বোমা ফেলাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'ডাইভ-বম্বিং' (Dive-bombing)।

বোমা ফেলবার আগে বোমারুকে হিসেব করতে হয়—বিমানের গতিবেগ, কতটা উঁচু থেকে সে বোমা ছুঁড়বে আর বাতাস কত জোরে বইছে। যে মুহূর্তে বোমাটা ফেলা হয় ঠিক সেই মুহূর্তে বিমানচালক বিমানখানাকে রাখে স্থির

ভাবে। এতে বিপদ কিন্তু কম নয়। কারণ বিমান স্থির হ'লেই শত্রুপক্ষের বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো বিমানখানাকে দেবে ফুটো ক'রে। খুব নীচে থেকে বোমা ছুঁড়তে গেলে লক্ষ্য বস্তুকে ঘায়েল করা অনেকটা সহজ হয় বটে, কিন্তু তাতে আক্রমণকারীর বরেছে 'স্বখাত-সলিলে ডুবে মরার' সম্ভাবনা খুব বেশী। কেন না বোমা যখন ফাটবে, তখন বিমানের গায়ে এসে লাগতে পারে তারই ফেলে দেওয়া বোমার টুকরো।

কোনও একটা নির্দিষ্ট বস্তুকে যখন নিশ্চিত ভাবে ধ্বংস করবার প্রয়োজন হয় তখনই নিযুক্ত হয় এই ডাইভ বম্বারের দল। বহু উঁচু থেকে তাক ক'রে মাথা নীচু করে এগুলি ছুটে আসে একেবারে ঘণ্টায় চারশ মাইল বেগে, তারপর বোমা ফেলেই উপরে উঠে যায়। একখানা গুলিগোলা বোঝাই জাহাজ চ'লেছে, রসদ নিয়ে একখানা ট্রেন চলেছে, কোন জায়গায় বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে একদল সাহসী গোলন্দাজ আক্রমণকারীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে, সেই সময় দরকার হয় এই ডাইভ-বম্বিং-এর। জার্মানীর ডাইভ-বম্বারের দল প্রায় বছর খানেক সমস্ত ইউরোপকে সন্ত্রস্ত ক'রে রেখেছিল। বম্বারের সঙ্গে অদ্ভুত রকমের বাঁশী বা 'সাইরেন' লাগিয়ে বিকট শব্দ ক'রতে ক'রতে যখন বিমানগুলি নেমে আসত, তখন অনেক সাহসী গোলন্দাজও ভয় পেয়ে কামান ফেলে ছুটে পালাত। শত্রুপক্ষকে বিহ্বল ক'রে দিতে ডাইভ-বম্বিং-এর মত আর কিছু নাই। কিন্তু কুছপরোয়া-নেই ভাবে সাহসে বুক বেঁধে যদি একবার দাঁড়ান যায়, তবে ডাইভ-বম্বারকেই ঘায়েল করা সব চেয়ে সহজ। প্রতিপক্ষ যেখানে বিহ্বল না হ'য়েছে সেখানে রাইফেলের গুলিতে ডাইভ-বম্বার ঘায়েল হয়েছে এ রকম দৃষ্টান্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে অনেকবার দেখা গিয়েছে। ডাইভ-বম্বারকে তাক করবার জন্য প্রতিপক্ষ প্রায় সাত সেকেণ্ড সময় পায়—কারণ ঐ সময়টা ডাইভ-বম্বার একই রেখায় দ্রুত নেমে আসে।

এখানে বলা চলে এরোপ্লেন খুব উপরে উঠলে পাইলট সহজে নিশ্বাস নিতে পারে না—অক্সিজেনের অভাবে তার নিশ্বাস আটকে আসে। সেইজন্য অক্সিজেন এ্যাপারেটাস না নিয়ে কেউ বিমানে উঠে না। একবার একটা ভারি মজা হয়েছিল।

এক জার্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষক বিমান ফরাসী সীমান্তে দেখা গেল, ওকে তাড়িয়ে দেবার জন্য একজন ইংরাজ পাইলট বিমান নিয়ে ক'রল তাকে ধাওয়া। জার্ম্মান পাইলট সোজা উপরে উঠে যাচ্ছে, তার পিছনে পিছনে আর. এ. এফ্-এর ফাইটারখানাও উঠছে। দুখানা বিমান কাছাকাছি এল—একখানা আর একখানাকে প্রদক্ষিণ ক'রল—কেউ কাউকে গুলি ক'রল না—আক্রমণের ভাবও দেখাল না। নীচ থেকে বিমানঘাঁটির কর্ম্মচারীরা তো দেখে অবাক। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল দুজনেই রুমাল উড়িয়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারপর ওরা যার যার বিমানঘাঁটিতে ফিরে এল। ইংরাজ পাইলটটি মাটিতে নামতেই সকলে তাকে ঘিরে ধ'রল—'এর অর্থ? শত্রুকে কব্জায় পেয়েও গুলি না করার মানে কি?' একজন পদস্থ কর্ম্মচারী নীচ থেকে সবই দেখেছিলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে বিরক্ত পাইলটকে কাছে ডেকে এনে বল্লেন—'অক্সিজেন এ্যাপারেটাস না নিয়ে আর কখনও বিমানে উঠো না।'

সঙ্গে অক্সিজেন না থাকলে উপর আকাশে হালকা বায়ুস্তরে মনে নাকি ভারি আনন্দ হয়। মারামারি কাটাকাটি করবার আর মোটেই ইচ্ছা থাকে না। অবশ্য আরও উপরে উঠলে নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যায়।

উপর থেকে বোমা ফেলার পদ্ধতিকে বলা হয় অল্টিটিউড্-বম্বিং (Altitude bombing)। এই অল্টিটিউড্ বম্বিং সত্য সত্যই খুব কঠিন কাজ, কেন না বোমা ফেলা হ'লে এক্ষেত্রে বোমা ঠিক সোজা প'ড়তে পারে না—বাতাসে সেটা খানিকটা স'রে যাবেই। সুতরাং বোমা ফেলবার আগে বাতাসের গতিবেগ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম হিসাব না ক'রে নিলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত না লাগারই সম্ভাবনা বেশী। নীচের ছবি দেখ্‌লে বোঝা যাবে সোজা প'ড়লে বোমাটা যেখানে পড়ার কথা সেখানে না প'ড়ে বেশ খানিকটা স'রে যেয়ে বোমাটা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত ক'রেছে। এই বাতাসের গতিবেগ সম্বন্ধে হিসাব করবার জন্যই বিমানে ব'সে থাকেন 'নেভিগেটর'।

গোলন্দাজ সৈন্যটি পিছনের দিকে কামান বাগিয়ে নিয়ে ব'সে থাকেন; কারণ আকাশের বুকে পিছন দিক থেকে আক্রমণই মারাত্মক। আক্রমণের সময় কোন

বিমান যদি পিছন থেকে এসে চড়াও করে সেইজন্য বিমানের পিছন দিকেও কামান রাখা দরকার হয়।
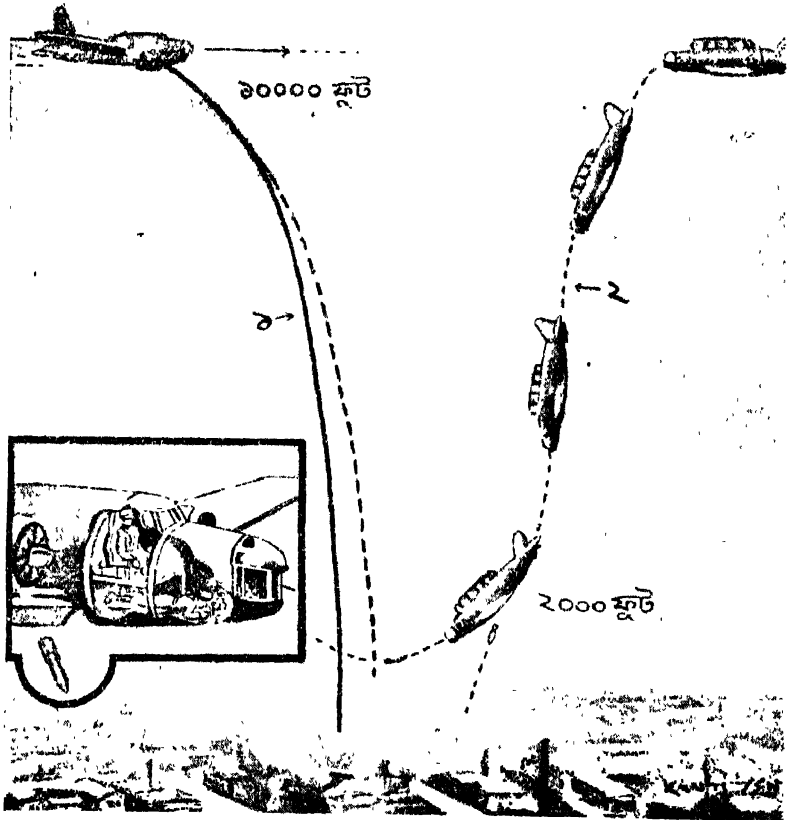
বোমা ফেলা—(১) অল্টিটিউড-বম্বিং (২) ডাইভ-বম্বিং পাশে—একটা বোতাম টিপলেই বোমা পড়ে

এ থেকে একটা কথা বেশ বোঝা যায় যে বিমান-আক্রমণ সফল ক'রতে হ'লে বৈমানিকদিগের পরস্পরের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ থাকা অবশ্য দরকার। নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলার জন্য বৈমানিকেরা টেলিফোন ব্যবহার করে। কারণ উপর আকাশে বিমানের শব্দের মধ্যে মুখে কথাবার্ত্তা ব'ললে কে কার কথা শোনে!

আজকাল রাত্রিতে বোমা ফেলে আসার চলন হ'য়েছে খুব বেশী। তাই অন্ধকারে আত্মরক্ষার জন্য আক্রান্ত দেশ ব্যবহার করে অতি তীব্র আলো যাকে বলা হয় সার্চ লাইট (Search Light)। সার্চ লাইটের আলো নীচ থেকে বোমারু খানাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—পাইলটের কাজ হ'ল চেষ্টা করা নীচের আলো বিমান খানা যেন ধরে ফেলতে না পারে। সার্চ লাইটের তীব্র আলোর পাশ দিয়েই হঠাৎ কেমন ক'রে সে বেরিয়ে গেল। নীচে থাকে Sound Detector বা বিমানের শব্দ ধরবার যন্ত্র। নীচ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে উপরে বিমান এসেছে কিন্তু আলো ফেলে বের ক'রতে পারা যাচ্ছে না। এতে শত্রু একেবারে ক্ষেপে ওঠে ও সারা আকাশ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। আলোর ভিতর একবার পড়ে গেলে নীচের লোক আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিমানখানাকে দৃষ্টির সামনেই রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু পাইলট তখন নানারকম কৌশল ক'রে, কখনও হঠাৎ উপরে উঠে, কখনও নীচে নেমে আলোর বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করে। এতে ছটাছুটি ক'রে অনেক সময় কিন্তু পাইলট লক্ষ্য বস্তু হারিয়ে ফেলে। অথচ লক্ষ্য ঠিক ঠাহর ক'রতে না পারলে বোমা ফেলার হুকুম নাই। অনেক সময় বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বোমারু ফিরে আসে। বোমা ফেলা হয় না। ভাগ্যক্রমে লক্ষ্যবস্তু ঠিক বুঝতে পারলে তবেই বোমা ফেলা হয়।

উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। [illegible] সাধারণতঃ পর্যবেক্ষক বিমান যার উপর

ব'ললেন—" [illegible] র ভাল করে দেখে নেন। পিছনে আক্রমণ করবে

[illegible] বোমা ফেলে ফেলে তারা সৈন্যদলের মধ্যে ভয়, চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলা এনে দেবে। ফাইটারগুলি বম্বারের কাছাকাছি থেকে দেখবে যে শত্রুপক্ষের কোন বিমান যেন আক্রমণের সুযোগ না পায়। যুদ্ধ আরম্ভ হলেই একটা পর্যবেক্ষক বিমান থেকে রেডিওযোগে বম্বার ও ফাইটারগুলির কাছে ঘন ঘন খবর যাবে—কখন কি ক'রতে হবে। "বাঁদিক থেকে শত্রুর এক ঝাঁক বিমান ছুটে আসছে, খবরদার, পজিশান নিয়ে ফেল, ডানদিকে চার মাইল দূরে সৈন্যদল জড় হচ্ছে, তাড়াতাড়ি সেখানে কয়েকটা বোমা ফেলে এসো, আক্রমণে খুব কাজ হচ্ছে, বিমান বিধ্বংসী কামানগুলো প্রায় ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে, আর

ভয় নাই, এখন আরও নীচে নেমে এস এবং ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখে দেখে নিশ্চিন্তে বোমা ফেলে যাও; উত্তর দিক থেকে ফাইটারের একটা প্রকাণ্ড দল আসছে, আর না, এইবার পালাও" এই ভাবে সমস্ত খবর অনবরত দেওয়া হচ্ছে। কাছাকাছি যদি কোন ভাবী কামান থাকে তবে সেখানেও খবর দেওয়া হবে—"আঠার মাইল দূরে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কামান দাগতে থাকো"। কামান দাগা সুরু হ'ল—গোলা পড়ল তিন মাইল দূরে। আবার খবর গেল —"লক্ষ্য স্থির হয়নি, তিন মাইল উত্তরে পড়েছে"। এই রকম ক'রে দেখে দেখে কামানের গোলার লক্ষ্যও এরাই শুধরে দিল। আসলে বিমান আক্রমণে এই সব পর্য্যবেক্ষণের বিমানগুলিই হয় বোমারু বিমানগুলির চোখ ও মাথা।

এইবার একটা সত্যিকারের বিমান আক্রমণ বর্ণনা ক'রছি। চোখের পলকে কি ক'রে সমস্ত শুনে, দেখে, ভেবে মাথা ঠিক রেখে পাইলটদের কাজ করতে হয় —প্রাণ হাতে ক'রে কি রকম নির্ভীকভাবে এরা কাজ করে - কিছু কিছু এতে বুঝতে পারা যাবে।

একটি বিমান ঘাঁটির অপারেশন রুম। বেলা প্রায় দুপুর। আজ বিমান-বাহিনী কোথায় বোমা ফেলতে যাবে তার হুকুম এখনও আসেনি। আজ যদি অভিযান করা হয় তবে আজকের দলে কারা কারা যাবে তা অবশ্য আগেই ঠিক হ'য়ে র'য়েছে। যারা যাবে তারা এতক্ষণ খেয়ে দেয়ে হ'য়েই আছে। অনেকগুলি বম্বার ও ফাইটারও তৈরী হ'য়ে আছে। এদের এঞ্জিনগুলি চালিয়ে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন কোন রকম অস্বাভাবিক শব্দ—যেমন খট্ খট্, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ্ এই সব—শোনা যায় কিনা। তাদের কাণ এতটা অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে যে সামান্য একটু ত্রুটি থাকলেই সেটা শব্দ থেকেই ধরা প'ড়ে যায়। যদি কোনখান থেকে একটু অন্য রকম শব্দ শোনা গেল—অমনি পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল—দেখা গেল কোনখানে একটা স্ক্রু হয়ত একটু ঢিলে হ'য়ে আছে। সর্ব্বনাশ! সময় মত ধরা না প'ড়লে আড়াই লক্ষ টাকার বম্বার, দু লক্ষ টাকার বোমা, আর টাকায় কেনা যায় না এই রকম চারজন মানুষ মারা যেত।

কল ঠিক করা হ'ল।

অপারেশন রুম নিস্তব্ধ। "এখনও কোন খবর নাই কেন? তবে কি আজ কোন আক্রমণ চলবে না?" কিন্তু কর্ম্মচারীরা সকলেই নিজের নিজের আসনে বসে আছেন। হঠাৎ খবর এল—রাত্রে আক্রমণ ক'রতে হবে। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুমন্ত ঘর যেন জেগে উঠল। "সাজ সাজ—তৈরী হও।" চৌদ্দ খানা বোমারু যাবে —প্রতি খানাতেই বিস্ফোরক বোমা ও আগুনে বোমা সমান সমান নিতে হবে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ খাতাপত্র নিয়ে অঙ্ক ক'রতে লাগলেন। বিমান ঘাঁটির কর্ম্মচারী এর পর কি হুকুম আসে তার জন্য লাগলেন অপেক্ষা ক'রতে।

আবার খবর এল—আজকের লক্ষ্য অমুক দেশের অমুক সহরের অমুক তেলের গুদাম ও কারখানা। সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন কর্ম্মচারী প্রকাণ্ড এক ফাইল টেনে বার ক'রলেন। ফাইলে বের হ'ল অসংখ্য কাগজপত্র ও তার সঙ্গে ম্যাপ, নক্সা আর ফটোগ্রাফ—গুদামের কোন অংশে বোমা ফেলতে পারলে ক্ষতি সব চেয়ে বেশী হবে সেইখানে নক্সায় দাগ দেওয়া। কাগজ ঘেঁটে হয়ত বের হল—গুদামের উপর বেলুন ব্যারেজ নাই, তবে বিমান বিধ্বংসী কামান আছে ছয়টা।

যেতে হবে রাত্রে। "কোন পথে যাওয়া হবে? অন্ধকারের মধ্যে কি ক'রে গুদাম টের পাওয়া যাবে?" ফটো দেখতে দেখতে নক্সা-অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। স্কোয়াড্রন লীডারের কাছে নক্সাখানা মেলে ধ'রে তিনি ব'ললেন—"এই দেখ, নদীটা এইখানে পূর্বদিকে বেঁকেছে—এই বাঁকের মুখে একটা জঙ্গল, রাত্রে অন্ধকারে এই জঙ্গলটা দশহাজার ফিট উপর থেকে দেখায় ঠিক যেন একটা কুকুরের মুখ। এরই আড়ালে কারখানা ও গুদাম। নদীর রেখা ধ'রে যেতে হবে, সামনে বাঁক দেখলেই আর চিন্তা নাই, নীচেই লক্ষ্য।"

এই কারখানা শত্রুর দেশের সব চেয়ে বড় কারখানা এবং এখানে রাতদিন কাজ চলছে।

আবার হুকুম এল।

"সমর বিভাগ আশা করেন—গুদাম ও পাওয়ার হাউসের উপর বোমা ফেলা হবে। রাত ঠিক ৮ টায় যাত্রা ক'রতে হবে।"

অপারেশন রুম আবার নিস্তব্ধ। স্কোয়াড্রন লীডার এখন অন্য আর এক ঘরে। সামনে টাঙ্গানো রয়েছে মস্ত একটা ম্যাপ। সমস্ত পাইলটদের তিনি পথ ঘাট, বিপদের কথা বুঝিয়ে ব'লছেন।

পাইলটরা সন্ধ্যা হতে না হতেই খেয়ে দেয়ে পোষাক এঁটে বিশ্রাম ক'রতে লাগল। বিমানে বোমা তোলা হল। যন্ত্রপাতি আবার আর একবার ক'রে দেখে নেওয়া হ'ল। ইঞ্জিন ইতিমধ্যেই গরম ক'রে রাখা হ'য়েছে।

৭ টা ৫৫ মিনিট।

অপারেশন রুমে উপর থেকে খবর এল—"সব প্রস্তুত ?"

উত্তর হ'ল—"প্রস্তুত।"

বোঁ করে চৌদ্দ খানা বোমারু উড়ে চ'লল—ভাগ্যে কি আছে কে জানে !

সব চুপচাপ।

রাত ২ টার সময় আবার অপারেশন রুম নানারকম লোকে ভ'রে গেল। ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ফ্লাস্ক-ভর্ত্তি গরম চা—সামনে টেবিলে বসে একজন কর্ম্মচারী।

২ টা ১০ মিনিটে একজন পাইলট ফিরে এল।

"খবর ভাল ?"

"মোটামুটি মন্দ নয়।"

"লক্ষ্য বুঝতে পেরেছিলে ?"

"পারবো না কেন ?"

"কখন গেলে ?"

"১০ টা ৩৪।"

"কটা বোমা ফেলেছ, একটা, না দুটো ?"

"একটা।"

"কি দেখলে ?"

"নীল আলো !"

কর্ম্মচারী উঠে দাঁড়ালেন। "সাবাস ! সাবাস !"

তারপর একজন, দুইজন ক'রে পাইলট ফিরতে লাগল।

যদি বেশী হয়, অর্থাৎ একই সময়ে শত্রুর চেয়ে সংখ্যায় বেশী গুলি ছুঁড়বার যদি ব্যবস্থা থাকে, তবে অল্পসংখ্যক বিমানও বেশীসংখ্যক বিমানকে হারিয়ে দিতে পারে। দিনের বেলায় সূর্যকে পিছনে রেখে যদি শত্রুর বিমান আক্রমণ করা যায়, কাছাকাছি মেঘের ভিতর থেকে যদি অতর্কিতে আক্রমণ চালান যায়, রাত্রি বেলায় নীচ থেকে শত্রুর এক একখানা বিমানের উপর যদি দুটো তিনটে ক'রে সার্চ লাইটের আলো ফেলা যায়, আর নিজেদের বিমানগুলিকে যদি অন্ধকারে রেখে দেওয়া যায়, তবে বিমানযুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী। আসল আক্রমণের স্থান যেখানে, সেখান থেকে একটু দূরে একটা মিথ্যা আক্রমণের অভিনয় দেখিয়ে শত্রু বিমানগুলিকে অনেক সময় প্রতারিত করা হয়। বিমানযুদ্ধে সোজাসুজি ষাঁড়ের লড়াই ক'রলে দু'খানা বিমানেরই ধ্বংস অনিবার্য। সেইজন্য ক্ষিপ্রতা ও কৌশল —এই দু'টি জিনিস বিমানযুদ্ধে বড়ই দরকার।

বিমানযুদ্ধে সত্যিকারের দায়িত্ব থাকে জঙ্গী বিমানের। বোমারুই হ'ক বা পর্যবেক্ষক বিমানই হ'ক, আক্রান্ত হ'লে এরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে মাত্র, তেড়ে গিয়ে যুদ্ধ করা এদের কাজ নয়। বরঞ্চ এরা সব সময়ই চেষ্টা করে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার। কারণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে প'ড়লে এদের আসল উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে না। বোমারু গিয়েছে বোমা ফেলতে, সে যদি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তবে বোমা ফেলা তার ঘ'টে উঠবে না। আবার বোমা ফেলবার আগেই শত্রু যদি গোলাগুলি ছুঁড়ে আকাশের বুকে বোমারুকে আঘাত করে, তবে এর বোমাগুলো হয়ত ঐখানেই যাবে ফেটে। বিপদ যা কিছু ঘটবার ঘটবে শুধু বোমারুর, শত্রু থাকবে নিরাপদে। পর্যবেক্ষকের বেলাও তেমনি—পর্য্যবেক্ষণের কাজ তার আর কিছুই হবে না—হয় গুলি খেয়ে মরতে হবে, না হয় ফিরতে হবে পালিয়ে।

'এলোপাথাড়ি' গুলি ছুঁড়ে শত্রুর বিমানকে মাটিতে নামানো অসম্ভব। তাতে বিমানের যথেষ্ট ক্ষতি করা যায় বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারে। তারপর বিমানখানা মেরামত ক'রে কাজে লাগালেই হ'ল। যাতে এই রকমটি হ'তে না পারে তার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে জঙ্গী বিমানের

কামান বন্দুকগুলি একটু নূতন ধরণে সাজিয়ে রেখে। এমন ভাবে এগুলি জঙ্গী বিমানের ডানার উপর সাজানো থাকে যে, গুলি ছুঁড়লেই সব গুলি যেয়ে পড়ে শক্রবিমানের উপর—পর পর একটা সরল রেখায় আর একই সঙ্গে। যদি
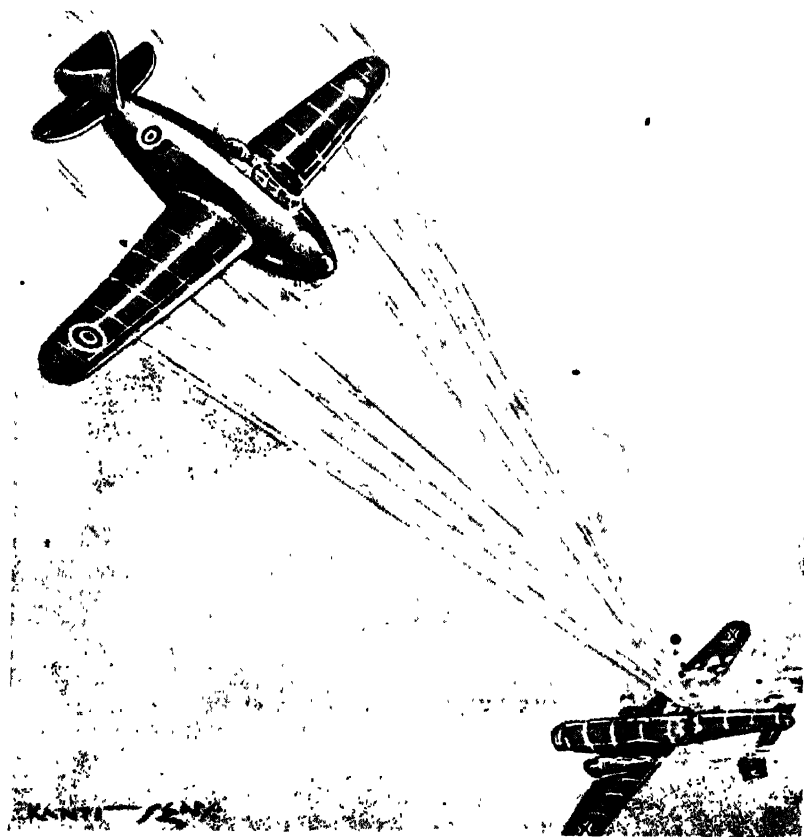
মেশিন গানের গুলি লেগে শত্রুবিমানের ডানা দু'খণ্ড হ'য়ে যায়

আঘাতটা লাগে শত্রুবিমানের ডানায়, তবে ঠিক একটা সরল রেখায় ডানাটা কেটে যেয়ে দুটো ভাগে ভাগ হ'য়ে প'ড়বে। এ রকম হ'লে আর কোন মতেই বিমান-খানাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে না।

এক-যোদ্ধার জঙ্গী বিমান নিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা কত কঠিন সেটা সহজেই বোঝা যায়। শত্রু যদি পাশ থেকে বা পিছন থেকে ধাওয়া করে, তবে কিভাবে যুদ্ধ করা যেতে পারে সেটা সত্যিই একটা সমস্যা, কারণ যোদ্ধাটি রয়েছেন এরোপ্লেন চালাবার নানাপ্রকার কলকব্জা নিয়ে ব্যস্ত। এ সমস্যার সমাধান করা হ'য়েছে বিমানের অস্ত্রশস্ত্র স্থির রেখে—এগুলো ঘুরানো ফেরানো যায় না, তার পরিবর্ত্তে গোটা বিমানখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শত্রুর উপর ছোঁড়া হয় গুলির ঝাঁক।

দুই-যোদ্ধার বিমানে দরকার মত কামান বন্দুক ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। কারণ সেখানে এমন একজন লোক আছেন যার কাজই হচ্ছে এইগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শত্রুকে তাক করা।

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কামান বা মেশিন গান কোন্‌টা বেশী কার্য্যকরী? কামানের পাল্লা বড়, তাই দূরে থেকে যুদ্ধ করা বেশী সুবিধার। কিন্তু শত্রুবিমান ছোট হলে কামানের গোলা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। এ রকম হ'লে কামান-যুদ্ধ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে—অথচ সাফল্যও হয় অনিশ্চিত। মেশিন গানের পাল্লা কম—মাত্র একশ' কি দেড়শ' গজ। তাছাড়া এর গুলিতে দুর্ভেদ্য বোমারু বিমান-গুলিকে ঘায়েল করা বড়ই কঠিন। এই জন্যই আজকাল বিমানের আকার একটু বাড়িয়ে কামান ও বন্দুক দুইই জঙ্গী বিমানে রাখা হ'য়ে থাকে।

ঘণ্টায় আড়াইশ' মাইল বেগে যদি দু'খানা বিমান পরস্পর সম্মুখ থেকে আক্রমণ করে, তবে আধ সেকেণ্ডের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয়ে দুটোই ধ্বংস হ'য়ে যাবে। এই জন্যই যুদ্ধের সময় জঙ্গী বিমানগুলো সম্মুখ থেকে শত্রুবিমানকে আক্রমণ না ক'রে তার পাশ থেকে অথবা পিছন থেকে ধাওয়া করে।

পাশ থেকে আক্রমণ চালানো কিছু সহজ নয়। প্রথমতঃ আক্রান্ত হলে কোন বিমানই সোজা সহজ পথে চলে না। প্রাণভয়ে একখানা বিমান ছুটে চ'লেছে—আর একখানা বা কয়েকখানা তাকে ধাওয়া ক'রেছে হয়ত সমান বেগে। বাঁচবার জন্যে তখন তাকে চ'লতে হয় এঁকে বেঁকে, উপরে উঠে অথবা নীচে নেবে, প্রতি মুহূর্ত্তে গতি পরিবর্ত্তন ক'রে- যাতে শত্রুবিমান সহজে তার নাগাল না পায়।

আক্রমণকারী বিমানকে দূরে রাখবার জন্যে আক্রান্ত বিমান অনেক সময়েই চলে ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে লুকোচুরি খেল্‌তে খেল্‌তে।
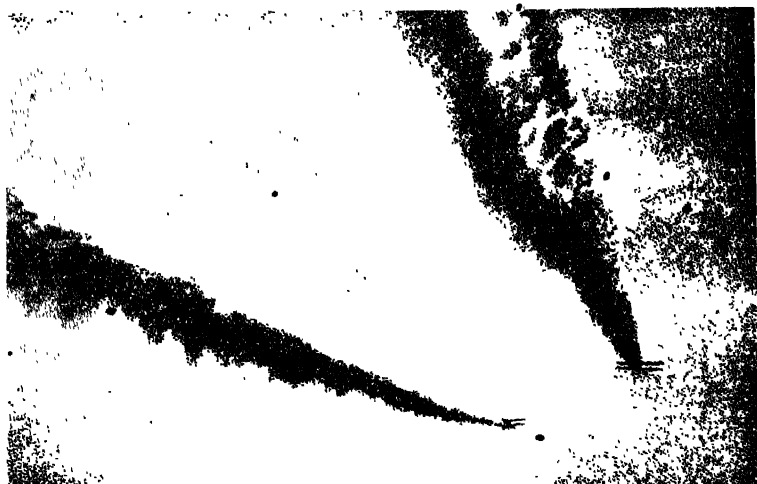
আকাশে ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে ছুটেছে

শত্রুপক্ষের বিমান যখন আক্রমণ করতে আসে, তখন শব্দগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে অনেক দূর থাকতেই পাওয়া যায় তার সন্ধান। আর এই সন্ধান পাওয়া মাত্রই সন্ধানীরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন কোন্ দিক থেকে শত্রু আসছে। কর্তৃপক্ষ তখন আদেশ দেন জঙ্গী বিমানগুলিকে এগিয়ে যেয়ে শত্রুকে প্রতিহত ক'রতে। যন্ত্রের মত সবাই কাজ করে—কোথাও এতটুকু বিলম্ব হয় না।

জঙ্গী বিমানগুলো এগিয়ে যেয়ে প্রথমেই চেষ্টা করে শত্রুকে ঘিরে দাঁড়াতে, যাতে করে এড়িয়ে যাবার বা পালিয়ে যাবার পথ শত্রু না পায়। তারপরই আরম্ভ হয় মারণ-যজ্ঞ। প্রত্যেকখানি বিমান থেকে গর্জে ওঠে মেশিন গান। মিনিটে এক একখানা জঙ্গী বিমান থেকে ছুটতে থাকে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচশ' গুলি। জীবন মরণ তুচ্ছ করে একপক্ষ চায় পথ কেটে নিতে—আর একের রক্ত ঢেলে আর এক পক্ষ চায় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে—অকর্মণ্য করে দিতে। কামান আর বন্দুকের শব্দে মুখর হ'য়ে ওঠে নীচের সমস্ত জনপদ। আকাশের বুকে চলে আগুনের

খেলা। নীচের বাড়ীঘর, বনজঙ্গল থাকে কাঁপতে। তীব্র বিস্ফোরকের গন্ধে বাতাস হয়ে ওঠে ভারী ও বিষাক্ত।

এমনি ভয়াবহ আবেষ্টনীর মধ্যেই দিনের পর দিন চলে বিমানযুদ্ধ।

বিমান বাহিনীর আর এক অঙ্গ

যারা যুদ্ধ করতে আকাশে ওঠে তাদের নিয়েই শুধু বিমান বাহিনী—এ ধারণা ভুল। উড়ন্ত পোতের প্রত্যেকটা লোকের জন্য মাটাতে থাকে কমপক্ষে পাঁচটা ক'রে লোক। এরা আকাশে উঠে যুদ্ধ করে না সত্যি কিন্তু আকাশ বাহিনীর কাজ এদের বাদ দিয়ে সুচারুরূপে চল্‌তে পারে না। সহজভাবে যখন কাজ চলে—তখন এরা কি করে, কতটা করে তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু কিছু 'ঝড়্‌তি পড়্‌তি' হ'লেই বেশ বোঝা যায় আকাশ বাহিনীতে এদের মূল্য ঠিক কতটা। এই সব কর্ম্মিদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে, কিন্তু বিপক্ষ বোমারুগুলি প্রথমেই চেষ্টা করে এদের কাজে বাধা দেবার। তাই সুযোগ পেলে বিমানঘাঁটির উপর হয় প্রথম আক্রমণ।

এইসব কর্ম্মিদের সত্যিকারের কাজ কি? এই সব কর্ম্মিদলে আছে ফিটার, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ্‌, বেতার-বিশেষজ্ঞ, ফটোগ্রাফার, নার্স প্রভৃতি। এদের প্রথমতঃ ভাগ ক'রে নেওয়া যায় দু'ভাগে। প্রথম, যারা বিমানের কলকব্জা, তার অস্ত্রশস্ত্র দেখে বেড়ায় আর দরকারমত সেগুলো মেরামত করে। আর দ্বিতীয়, যারা বৈমানিকদের খাদ্য, পানীয়, সুখ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে।

এইসব কর্ম্মীর মধ্যে অনেক মেয়ে আছেন। এঁদের উপর পড়েছে প্রধানতঃ শেষোক্ত কাজের ভার। কিন্তু বেতার যন্ত্র চালনা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কাজেও এঁরা পিছ্‌পা নন।

আকাশের বুক থেকে নেমে যেইমাত্র একখানি বিমান নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে এলো, অমনি শেষ হ'লো বৈমানিকদের কাজ। কঠোর পরিশ্রমের পর তারা যান বিশ্রাম করতে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় ঘাঁটির বিভিন্ন ধরণের কর্ম্মীদের কাজ। প্রত্যেকটি কলকব্জা তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়। বিমানের যদি কোন ক্ষতি হ'য়ে থাকে, তবে সে ক্ষতির সংশোধন করা হয় অবিলম্বে।

গুপ্তচর বিমান বা পর্য্যবেক্ষক বিমান যখন ঘাঁটিতে এসে নামে, কর্ম্মীদের একজন তখন ছুটে গিয়ে বৈমানিকের হাত থেকে নিয়ে আসে তার তোলা ফটোগ্রাফ্ এবং সেটাকে তখনই ডেভেলাপ্ করবার জন্য উপযুক্ত লোকের হাতে পৌঁছে দেয়।

এছাড়া বিমান ঘাঁটিতে থাকে আর এক ধরণের কর্ম্মী—যাদের কাজ হ'চ্ছে আকাশগামী বোমারু, জঙ্গী, পাহারাদার এককথায় সবরকম বিমানের সঙ্গে বেতারে সংবাদ আদান প্রদান করা। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখনই যে নির্দ্দেশ আসছে সেগুলোকে সাঙ্কেতিক ভাষায় উড়ন্ত বিমানে পৌঁছে দিতে হয়। এমনি ক'রে বৈমানিকেরা কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রতে পারে, অথবা উড়ন্ত বিমানখানি ঠিক ভাবে কাজ ক'রছে কিনা, অথবা কোন বিপদে প'ড়েছে কিনা—যে কাজের ভার নিয়ে গিয়েছিল তা সফল হ'য়েছে কিনা—সেটা যত শীঘ্র সম্ভব কর্তৃপক্ষকে এঁরাই বেতার যোগে জানিয়ে দেন।

বিমান ঘাঁটিতে আর একদল কর্ম্মী থাকে যাদের কাজ হ'চ্ছে বৈমানিকেরা ফিরে এলে তাদের প্রত্যেকটি প্যারাসুট্ পরীক্ষা করা ও দরকারমত সেগুলো মেরামত করা। এ কাজটা মোটেই ছোট কাজ নয়—কেন তা বুঝিয়ে বলছি।

প্যারাসুট

আকাশে উঠবার আগে প্রত্যেক বৈমানিক একটি ক'রে প্যারাসুট সঙ্গে নেয়। প্যারাসুট হ'চ্ছে বৈমানিকদের লাইফ্ বেল্ট্ (Life belt)। বিমানের যন্ত্র বিকল হ'য়েই হ'ক, বা অন্য কোন কারণেই হ'ক—হঠাৎ যদি চলন্ত বিমান থেকে বৈমানিককে নীচে নামতে হয়—তখন এই প্যারাসুটই হ'চ্ছে তার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

প্যারাসুট আসলে একটা ছাতার মত—তবে আকারে অনেক বড়। গুটিয়ে অনায়াসে একটা ফিতে দিয়ে সঙ্গে ঝুলিয়ে নেওয়া চলে। দরকারমত ব্যবহারের জন্য সব সময়ই বৈমানিকের পিঠে একটা করে প্যারাসুট ঝুলান থাকে।

প্যারাসুট সাহায্যে নীচে নামা যেতে পারে দু'রকমে—যখন অল্প উঁচু থেকে

মাটিতে নামতে হয় তখন বৈমানিক এরোপ্লেনের ডানার উপর দাঁড়িয়ে টেপে প্যারাসুটের বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে প্যারাসুটটি খুলে যায় আর বাতাসে বৈমানিককে

প্যারাসুটে নামছে

একটু উপরে ঠেলে তোলে; তারপরেই নিজের ভারে বৈমানিক নীচে নামতে থাকে। প্যারাসুটে বাতাস বেধে যাওয়ায় নীচে পড়বার বেগ যায় অনেকটা কমে। ঠিক যে সময় বাতাস বৈমানিককে উপরে ঠেলে তোলে, সেই সময়ের মধ্যে বিমানখানা খানিকটা যায় এগিয়ে। তাই প্লেনে প্যারাসুট জড়িয়ে গিয়ে বৈমানিকদের প্রাণহানি হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে নামার ধরণকে বলা হয় "লিফ্‌ট্ অফ্" (lift off)।

অনেক উপর থেকে নামতে হ'লে এভাবে না নেমে বৈমানিক সোজা নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিমানের যে কোন স্থান থেকে।

ঝাঁপিয়ে পড়ার কয়েক সেকেণ্ড পরে যখন বিমানখানি সামনের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে অর্থাৎ যখন ছড়ানো প্যারাসুট-খানা চলন্ত বিমানের

প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য বৈমানিক তৈরী হ'য়েছেন।

গায়ে বেঁধে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তখনই বৈমানিক প্যারাস্যুটের বোতাম টিপে দেয়। বোতাম টিপ্‌তেই ছড়িয়ে পড়ে ছোট্ট একটা প্যারাস্যুট—যাকে বলা হয় পাইলট প্যারাস্যুট (pilot parachute)। এরই টানে খুলে যায় আসল প্রকাণ্ড প্যারাস্যুট। প্যারাস্যুট থেকে নামবার এই পদ্ধতিকে বলে "ফ্রি ফল্" (free fall)। প্যারাস্যুট যত বড় হবে, তাতে বাতাস আটকাবে তত বেশী, আর যত বেশী বাতাস প্যারাস্যুটে বাধবে, ততই ভারী জিনিষ উপর থেকে নীচে নামতে পারবে ধীরে ধীরে।

ঠিক নীচে নামার মুহূর্ত্তে বেশ একটু বিপদ আছে। প্যারাস্যুটধারী ধীরে ধীরে টুপ করে মাটীতে এসে পড়ে না। বার ফুট উঁচু থেকে পড়লে মানুষ যতখানি আঘাত পায়, প্যারাস্যুটধারীও ততখানি আঘাত পায় যখন এসে সে মাটী ছোঁয়। তাছাড়া বাতাসে ভর্ত্তি থাকায় প্যারাস্যুটখানি তাকে নিয়ে যায় খানিকটা টেনে হিঁচড়ে। একবার একজন বৈমানিক প্যারাস্যুট নিয়ে সমুদ্রতীরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দমকা বাতাস এসে প্যারাস্যুটধারীকে জলের উপর দিয়ে এমন ভাবে টেনে নিয়ে গেল যে দ্রুতগামী মোটর বোটও তার নাগাল ধ'রতে পারল না। ফলে বৈমানিকের হ'ল সলিল সমাধি। এইসব বিপদ এড়াবার জন্য মাটী ছোবার অল্প আগেই বৈমানিক একটি দড়ি টেনে প্যারাস্যুটকে যথাসম্ভব গুটিয়ে ফেলে। এতে বিপদের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

অবাঞ্ছিত স্থানে যাতে নাম্‌তে না হয় তার ব্যবস্থা প্যারাস্যুটধারী নিজেই অনেকটা ক'রতে পারে। কেননা তাকে কোন জায়গায় নামতে হ'বে এটা পূর্ব্বেই ঠিক থাকে এবং উপযুক্ত স্থানে এসে তবে সে প্যারাস্যুট ছড়িয়ে নীচে লাফ দিয়ে পড়ে। বাতাসের ধাক্কায় অথবা অন্য কোন কারণে যদি এক আধটু স'রে যেতে হয় তবে সে আগে থাকতেই প্যারাস্যুটের দড়ি টেনে এদিকে ওদিকে একটু স'রে যেতে পারে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আটাশ ফুট ব্যাসের প্যারাস্যুট সাহায্যে সৈন্য স্থানান্তরিত ক'রে, রাশিয়া প্যারাস্যুটের একটা নূতন রকম ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রচার করে।

হল্যাণ্ডের এবং ফ্রান্সের যুদ্ধে, জার্ম্মাণী এমনি ভাবে প্যারাস্থটের সাহায্যে সৈন্য চালনা ক'রেছিল। এই সব সৈন্যদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটা হাল্কা মেশিন গান, একটি দূরবীণ, কিছু গোলাবারুদ, একটি বেতার যন্ত্র, একখানা ভাঁজকরা সাইকেল, কিছু খাদ্য, পানীয় আর প্যারাস্থটের তার কেটে দেবার জন্য একটা ছুরি।

সৈন্যদের এই ভাবে শত্রুর দেশে নামা যে কত বিপজ্জনক তা না বল্লেও চলে। প্রথমতঃ আকাশ থেকে নামলে মাটীতে কোথায় এসে প'ড়তে হবে তার কোন স্থিরতা নেই। হয়ত প্যারাস্থটে নেমে শেষ পর্য্যন্ত এসে প'ড়তে হ'ল একেবারে শত্রুপক্ষের ছাউনীর মধ্যে সবার চোখের সামনে, অথবা কারও বাড়ীর ছাতে। এ রকমটা হ'লে প্যারাস্থটধারীর কোন মতেই নিস্তার নাই। মাটীতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর গুলিতে তার জীবন শেষ হ'য়ে যাবে। একটা প্যারাস্থট নিয়ে মাত্র একজন সৈন্যই নীচে নাম্তে পারে। শত্রুপুরীতে শত্রু যদি প্রস্তুত থাকে তবে প্যারাস্থট সাহায্যে দু'শ' পাঁচশ' সৈন্য নামিয়েও কোন ফল হয় না। শত্রু এ দিকে সজাগ না থাকলে উদ্দেশ্য যে কতকটা সফল হ'তে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে হল্যাণ্ডে।

হল্যাণ্ডে জার্ম্মাণী যে সব প্যারাস্থটধারী সৈন্য নামিয়েছিল, তারা ছিল ওলন্দাজ সৈন্যদের পোষাক পরা। এতে প্রথমটা দেশের লোকে ততটা সন্দেহ ক'রতে পারে নি—তাছাড়া পঞ্চম বাহিনী আগে থেকেই তৈরী থাকায় এই সব প্যারাস্থট-ধারীদের ততটা বিপদ ঘটেনি।

প্যারাস্থটে নামবার পর মাটি ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় প্যারাস্থটধারীর বিপদ। শোনা যায় শত্রুকে অন্যমনস্ক ক'রে ফেলবার জন্য জার্ম্মাণ প্যারাস্থটধারীরা আগে থাকৃতে একটা রবারের মানুষ ফেলে দেয়—আশে পাশের লোকেরা যখন সেটার দিকে লক্ষ্য ক'রতে এগিয়ে যায় তখন প্যারাস্থটধারী নিজে নেমে তার আসল কাজের জন্য তৈরী হয়।

সাধারণতঃ খুব অন্ধকার রাত্রে, ঝড় বৃষ্টি ও কুয়াশার মধ্যে শত্রুর দেশের কোন নিভৃত বা অরক্ষিত স্থানে প্যারাস্থট নিয়ে এরোপ্লেন থেকে লোক লাফিয়ে পড়ে।

এরা সংখ্যায় হয়ত পঞ্চাশ ষাট জন, সবাই কাছাকাছি পড়েছে। মাটীতে পড়েই এরা প্যারাসুট গুটিয়ে রেখে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে নেয়, তারপর চেষ্টা করে দলবদ্ধ হ'বার। সকলে একসঙ্গে মিলে ছোট্ট একটি দল গঠন করে। যেখানে এরা পড়লো সেখানকার ম্যাপ ও নক্সা এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকে। কোথায় জলের কল, কোনদিকে রেল ষ্টেশন, কোথায় নদীর উপর সেতু, কোথায় টেলিগ্রাম অফিস—সব এদের জানা থাকে। এমন কি কোন গ্রামে কার বাড়ীতে গেলে অনেক গুপ্ত খবর ও সাহায্য পাওয়া যাবে তাও এরা আগে থাকতেই জেনে আসে। তারপর ছোট ছোট মেশিন গান নিয়ে, হালকা সাইকেলে চড়ে হঠাৎ এরা সুবিধামত একটা কিছু আক্রমণ ক'রে গোলমাল বাধিয়ে দেয়।

বিপক্ষের প্যারাসুটধারী সৈন্যবাহিনী যাতে ইংলণ্ডে না নামতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হ'য়েছে। প্রথমতঃ যে সব স্থানে প্যারাসুট-বাহিনী নামবার আশঙ্কা আছে, সেখানে দিনরাত্রি কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। দিনের বেলা মেয়েরা এবং রাত্রিবেলা পুরুষেরা এই সব স্থানের উপর রীতিমত পাহারা দেয়। তাদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউই সেখানে নামতে পারে না। আর একটা কথা—ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি নরনারীর দেশ-প্রেম এবং কর্ত্তব্যবোধের জন্যও ইংলণ্ডে পঞ্চমবাহিনী গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা কম। পঞ্চমবাহিনীর সাহায্য না পেলে শুধু প্যারাসুট সৈন্য দিয়ে শত্রুপক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি করা যায় না, বরং তাতে নিজেদেরই লোকক্ষয় হয়। এই সব কারণে ফিন্‌ল্যাণ্ডে রুশিয়ার প্যারাসুটধারী সৈন্যেরা একেবারে শোচনীয় ব্যর্থতা বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল। ফিন্‌ল্যাণ্ড এমন ভাবে তৈরী হ'য়েছিল যে আকাশ থেকে কোন রুশিয়ান সৈন্য নামামাত্রই ফিন্ সৈন্যেরা তাকে শেষ ক'রে দিচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হ'য়ে রুশিয়া এই সব প্যারাসুটধারী সৈন্য ফিন্‌ল্যাণ্ডে নামানো বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

১৯১৪ সালের যুদ্ধের পর থেকে সবাই ভেবেছিলেন ভবিষ্যতের যুদ্ধে আকাশ বাহিনীই হবে জয় পরাজয় নির্দ্ধারণের শেষ অস্ত্র। বর্ত্তমান যুদ্ধের গোড়ায় পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্ল্যাণ্ডার্স প্রভৃতি স্থানে জার্ম্মাণবাহিনীর সাফল্যে

এই ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হ'য়ে আসছিল কিন্তু ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণের ফলাফল দেখে এ ধারণা এখন অনেকটা বদলে গিয়েছে।

আকাশ বাহিনী সত্যিকারের জয়ে অনেকখানি সাহায্য করে—সুগঠিত আকাশ বাহিনী না হ'লে যুদ্ধ জয় অসম্ভব একথা সত্য, কিন্তু চরম জয় এনে দেবার ক্ষমতা আকাশ বাহিনীর নাই একথাও অস্বীকার করা যায় না।

জল বাহিনী

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর ভবিষ্যৎ যুদ্ধ ঠিক কি ধারায় চলতে পারে, এ সম্বন্ধে লোকের নানারকম ধারণা জন্মেছিল। সে যুদ্ধে আকাশ বাহিনীর কার্য্যকলাপ খুব বেশী দেখা যায় নাই; কিন্তু সকলেই ভেবেছিলেন, এই আকাশ বাহিনীই হবে ভবিষ্যতের যুদ্ধে জয়পরাজয় নির্ণয়ের একটা প্রধান উপায়, বোধ হয় চরম উপায়। এই আকাশ বাহিনী দিয়ে কতটা কাজ পাওয়া যাবে, এ সম্বন্ধে সাধারণ লোক ত দূরের কথা সমরনায়কদেরও স্পষ্ট ধারণা না থাকায়, তাঁরা জলযুদ্ধকে অনেকটা গৌণ করে তুলেছিলেন। মুসোলিনী একবার তাঁর স্বভাবসুলভ হামবড়া বক্তৃতাতে স্পষ্টই বলেছিলেন যে, ইটালীর শত্রুস্থানীয় দেশগুলিকে তিনি বিমান যুদ্ধে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন এবং প্রসঙ্গতঃ নৌবাহিনী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'সেই পুরান লৌহখণ্ডগুলিকে ফেলে রাখ, এ যুগের যুদ্ধে ওগুলি অচল'! বলা বাহুল্য পুরান লোহা হ'চ্ছে বৃটিশের রণতরীগুলি। আজ এক বৎসর হ'ল বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে এবং এই অল্প সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, জল বাহিনীকে কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাই আগে যেমন জল বাহিনী ছিল সমগ্র বাহিনীর একটি প্রধান অঙ্গ, আজও সে ঠিক তেমনিই আছে—সমস্ত বাহিনীর অন্যতম প্রধান অঙ্গ হ'য়ে।

নৌবহর

বর্ত্তমান কালে বৃটেনের নৌবহর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত ইংলণ্ড—জন্ম থেকেই পেয়েছে দূর সমুদ্রে বেড়াবার প্রবৃত্তি, জল তাকে সব সময়ই হাতছানি দিয়ে ডাকে সমুদ্রের পথে দূর-দূরান্তরে যেতে। তার বিরাট বাণিজ্য ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তার নৌবহরকেও করতে হ'য়েছে বিপুল ও অপরাজেয়। শুধু এই শক্তিমান নৌবহরের জন্যই জার্ম্মাণী কোন রকমেই ইংলণ্ডকে এঁটে উঠতে পারছে না।

নৌশক্তির পরিমাণ জাহাজের সংখ্যা দিয়ে হয় না। একটা দেশ কয়খানা যুদ্ধ জাহাজ, কয়খানা ক্রুজার বা কয়খানা সাবমেরিনের মালিক, এ জানতে পারলেই কিছু বোঝা যায় না বিশ্বের নৌশক্তিতে তার সত্যিকারের স্থান কোথায়। এটা বুঝতে হ'লে জানা দরকার সবগুলি জাহাজের একত্রে বহন-ক্ষমতা বা টনেজ (Tonnage) কত। যে জাতির জাহাজের টনেজ যত বেশী, তার নৌশক্তিও তত বেশী বুঝতে হবে। পঞ্চাশ খানা হাজার টনী জাহাজের চেয়ে দু'খানা চল্লিশ হাজার টনী জাহাজের মূল্য অনেক বেশী। এই টনেজের দিক্ থেকেও পৃথিবীতে ইংলণ্ডই শ্রেষ্ঠ।

যুদ্ধের সময় নৌবহরকে যে সব কাজ করতে হয়, সেগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে বাণিজ্য-পথ পরিষ্কার রাখা, (২) শত্রুর বন্দরগুলি অবরোধ ক'রে তার বাণিজ্য নষ্ট করা, (৩) যুদ্ধ ক'রে শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করা। যুদ্ধের সময় বন্দর পুরাপুরি অবরোধ করতে পারলে যুদ্ধে জয়লাভ করা ব'লতে গেলে মুঠোর মধ্যে এসে গেল, কারণ যুদ্ধের সময় ছোট বড় অনেক দরকারে লাগে এমন হাজারো রকমের জিনিস সব দেশেরই আমদানী করতে হয় সমুদ্র পথে বন্দর দিয়ে। শত্রুর নৌবাহিনীর তৎপরতায় যদি এগুলি দেশে আসতে না পারে, তবে যুদ্ধে জিতবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অবশ্য এ রকম ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিরপেক্ষ দেশের বেনামীতে জিনিষপত্র আমদানী করা হ'য়ে থাকে, প্রথমতঃ তা'দের বন্দরে এবং সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় নিজের দেশে—স্থলপথে। জাপান চীনের সমস্ত বন্দরগুলি দখল করেছে ব'লে এইভাবেই ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে বর্ম্মা রোডের

সাহায্যে নীন প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করছে। জাপান বা ইংলণ্ডের মত চতুর্দ্দিকে সমুদ্র-বেষ্টিত দেশের পক্ষে স্থলপথে এক ছটাক মালও সংগ্রহ করা অসম্ভব—তাই নিজেদের বাণিজ্যপথ পরিষ্কার রাখা এদের জীবনমরণ সমস্যার কথা।

বিমান ও জল বাহিনী

বর্ত্তমান সমরনীতিতে বিমানের বহুল ব্যবহার জল বাহিনীর উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে? বিমানের বহুল ব্যবহারে জল বাহিনীর কোন কোন দিকে কাজ হ'য়েছে কঠিনতর, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হ'য়েছে সহজতর। শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের ভয়ে এখনকার দিনে সব জাহাজকেই থাকতে হয় সন্ত্রস্ত, কারণ মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় শত্রুর বিমান যে কোন জাহাজের সর্ব্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। এদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে প্রত্যেক জাহাজেরই কাজ এখন জটিলতর হ'য়েছে। অন্যদিকে বিমান ব্যবহারের ফলে অপার সমুদ্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা চলে। আগে পাঁচখানি জাহাজ সমস্ত দিন টহল দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে যতটা দূর পর্য্যন্ত পাহারা দিতে পারত, এখন একখানি বিমান আধ ঘণ্টা টহল দিলে তার চাইতে অনেক বেশী জায়গার উপর নজর রাখতে পারে। এর ফলে জল বাহিনীর কাজ যে অনেকটা সহজ হ'য়েছে, এ কথা বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

স্থল ও জল বাহিনী

স্থল ও জল বাহিনীর মধ্যে সংযোগ রাখা হয় কি ভাবে? একথা ভুলে গেলে চ'লবে না যে, জাহাজগুলিকে চ'লতে হয় মাসের পর মাস ধ'রে বিভিন্ন দেশ পেরিয়ে, শত্রুমিত্র অনেক রাজ্যের পাশ দিয়ে জলের বুকে পথ কেটে। ডাঙ্গা প'ড়ে থাকে কতশত মাইল দূরে। শুধু জল আর জল ছাড়া আশে পাশে, সামনে পিছনে কিছুই তারা দেখতে পায় না।

বিভিন্ন বন্দর এবং নৌঘাঁটির সাহায্যে জল ও স্থল বাহিনীর মধ্যে রাখা হয় যোগসূত্র। জাহাজগুলির প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষপত্র মজুত থাকে বন্দরে। শিক্ষিত অভিজ্ঞ নাবিক থেকে সুরু ক'রে দৈনন্দিন রসদপত্র গোলাবারুদ সব কিছুই বন্দরগুলিতে জমিয়ে রাখা হয়, যা'তে দরকার মত দূর দূরান্তে যে কোন জাহাজে সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ করা যেতে পারে।

নৌঘাঁটিগুলি একটু ভিন্ন ধরণে পরিকল্পিত। বন্দরের মত এগুলি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নয়। সাময়িক সরবরাহ, মেরামত বা রসদপত্রের ব্যবস্থা এই সব নৌঘাঁটিতে রাখা হয়। কোন জাহাজই অনির্দিষ্ট কালের জন্য দূর সমুদ্রে থাকতে পারে না—অনেক দূরে গিয়ে পড়লে চট্‌ ক'রে তারা বন্দরেও ফিরে আসতে পারে না—তাই প্রত্যেক দেশই দূর সমুদ্রে সুবিধামত স্থানে নৌঘাঁটি তৈরী ক'রে রাখবার চেষ্টা করে।

এই সব বন্দর ও নৌঘাঁটিগুলির উপর শত্রুপক্ষের থাকে খরদৃষ্টি। তাই প্রথম থেকেই এগুলির নিরাপত্তার জন্য তৎপর হ'য়ে থাকতে হয়। উপকূল জুড়ে ভারী কামান, বিমানবিধ্বংসী কামান সারি সারি সাজিয়ে রেখে, উপকূলের অনেকখানি স্থান জুড়ে সমুদ্রে মাইন প্রভৃতি পেতে রেখে বন্দরগুলিকে শত্রুর হাত
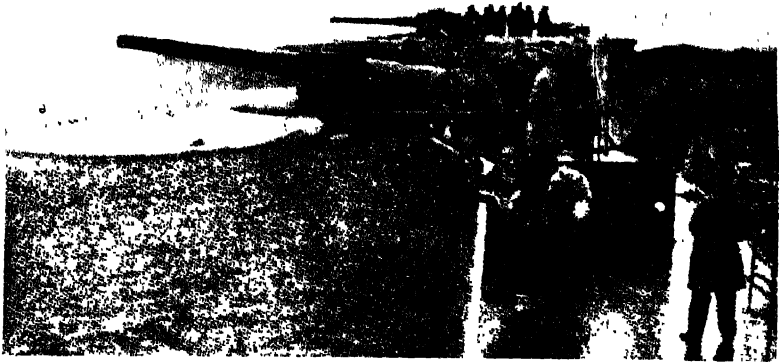
উপকূল রক্ষার জন্য ভারী কামান পাতা হ'য়েছে।

থেকে রক্ষা করা হয়। বন্দর পাহারা দেবার জন্য ছোট ছোট পাহারাদার জাহাজ, মোটর বোট, বিমান ইত্যাদি সব সময় ঘুরে ঘুরে সমুদ্রে ও আকাশে টহল দিয়ে বেড়ায়। রাত্রিকালে সন্ধানী আলো দিয়ে উপরে অনন্ত আকাশ, আর নীচে অকূল সমুদ্রের অনেকখানি আলোকোজ্জ্বল ক'রে রাখা হয়।
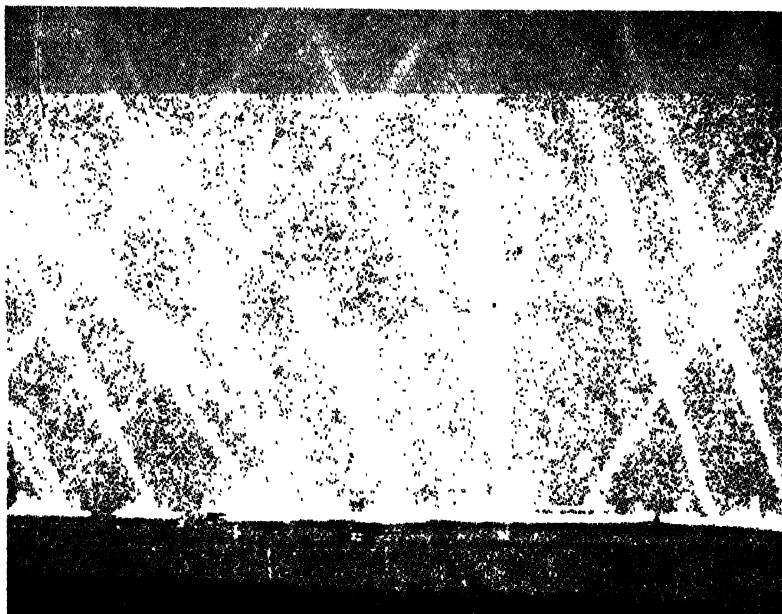
বিভিন্ন জাহাজ থেকে তীব্র আলো ফেলে আকাশ আলোকিত ক'রে রাখা হয়

জাহাজের শ্রেণীবিভাগ

দূর সমুদ্রে যে সব যুদ্ধ-জাহাজ আনাগোনা করে, তারা কোন্ কোন্ কাজে লাগে তারই উপর নির্ভর ক'রে তাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সমুদ্র অসীম, নৌশক্তি যত বড়ই হোক তার একটা সীমা থাকবেই, সুতরাং এই অসীম সমুদ্রে সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে চলাফেরা করতে হ'লে প্রত্যেক জাহাজকে কম বেশী সব কাজের উপযুক্ত ক'রেই গড়তে হবে, এটা নিশ্চিত। তবুও আসল কাজের বিভিন্নতা অনুসারে, নৌবহরকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ ক'রে নিতে পারা যায়। যথা :—(১) রণতরী (Battleship), (২) ক্রুজার (Cruiser), (৩) ডেষ্ট্রয়ার (Destroyer), (৪) ডুবো জাহাজ (Submarine) এবং (৫) বিমানবাহী জাহাজ (Air-craft carriers)। এরা সবাই নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরী; কিন্তু এ ছাড়াও আরও অনেক রকম জাহাজই তৈরী

হয়, যারা যুদ্ধের সময় খুঁটিনাটি অনেক রকম কাজ করে। রসদবাহী, তৈলবাহী, সৈন্যবাহী, কয়লাবাহী, অস্ত্রবাহী, কত জাহাজ দরকার হয়—মাইন পাতা, মাইন তোলা, টর্পেডো ছোড়া এমনিতর ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ কত জাহাজই যে যুদ্ধের সময় কাজে লাগে, এখানে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। একে একে বিভিন্ন শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাক।

রণতরী

এগুলি অতিকায়, ব'লতে গেলে এক একটা বিরাট শহর বুকে নিয়ে এগুলি সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। এদের কাজ হ'চ্ছে শত্রুপক্ষের এই জাতীয় জাহাজগুলির সম্মুখীন হ'য়ে যুদ্ধ করা এবং শত্রুর যে কোন জাহাজ চোখে পড়ুক, তাকে ডুবিয়ে দেওয়া। এই সব রণতরী প্রস্তুত করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, এক কোটি থেকে সওয়া কোটি টাকা হচ্ছে একটা অতি সাধারণ রণতরী নির্ম্মাণের ব্যয়। অথচ বিমান থেকে তাক্ মত একটা যুৎসই বোমা অথবা টর্পেডো বোট বা সাবমেরিন থেকে একটা লাগসই টর্পেডো হাঁকতে পারলেই এই বিরাট অর্থ এক মুহূর্ত্তেই ডুবে যাবে একবারে সমুদ্রের অতল তলে। এই জন্যই একদল লোক আজকাল অতিকায় রণতরী নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রণতরী তৈরী ক'রেই যাচ্ছেন। জলযুদ্ধে এই রণতরীর একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। ডুবো জাহাজ বা টর্পেডো বোটের পাল্লা নেয় ডেষ্ট্রয়ার, ডেষ্ট্রয়ারের উপরে আছে ক্রুজার আর ক্রুজার জব্দ রণতরীর কাছে। রণতরীই হ'ল, ব'লতে গেলে, জল বাহিনীর প্রিভি কাউন্সিল—তার উপর আর আপীল চলে না। এই জন্যই রণতরী নির্ম্মাণ বন্ধ করতে কোন শক্তিই রাজী নয়। রণতরী নির্ম্মাণ বন্ধ না ক'রে আজকাল অবশ্য বিমান, ডুবো জাহাজ অথবা টর্পেডো বোটের আক্রমণ থেকে রণতরীকে বাঁচাবার জন্য নূতন নূতন ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে।

বিগত মহাসমরের পর থেকে প্রত্যেক দেশই তার জাহাজের আয়তন বাড়াতে আরম্ভ করে; শেষে সকলে মিলে ঠিক ক'রলে পঁয়ত্রিশ হাজার টনের বেশী কেউ জাহাজ তৈরী ক'রতে পারবে না। সর্ত্ত থাকলেও চুপে চুপে অনেকে এর চেয়ে

বেশী টনী জাহাজ তৈরী করেছে। শোনা যায়—জাপানের আছে চল্লিশ হাজার টনী, আর আমেরিকা ক'রছে তেতাল্লিশ হাজার টনী, যাতে আঠার ইঞ্চির কামান থাকবে—আর তার গোলা চব্বিশ মাইল দূরে গিয়ে প'ড়বে।

শ্রেষ্ঠ রণতরীর কি কি গুণ থাকা দরকার? এর গতি হওয়া চাই খুব দ্রুত, আর ভারী ও শক্তিশালী কামান এতে থাকবে অনেকগুলি এবং একে হ'তে হবে যতদূর সম্ভব দুর্ভেদ্য। দুর্ভেদ্য করবার উদ্দেশ্যে রণতরীকে চৌদ্দ থেকে ষোল ইঞ্চি
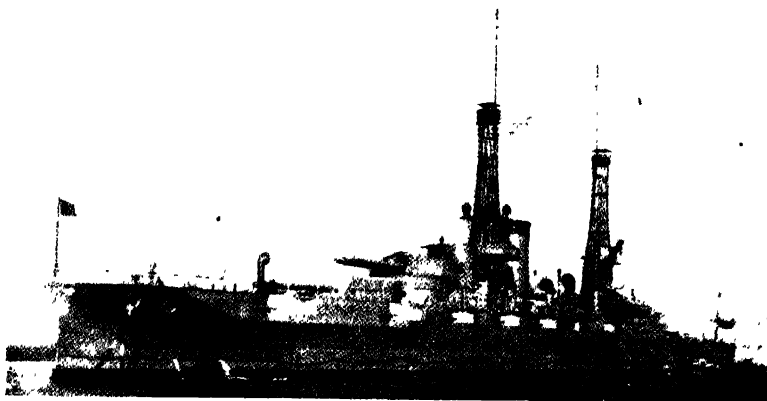
রণতরী

পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। এই পাতগুলি একটু বিশেষভাবে তৈরী। এর বাইরের দিকটা থাকে খুবই শক্ত, কিন্তু ভিতর দিকটা করা হয় নরম—যাতে গোলাগুলির আঘাত পেলে ইস্পাত যাবে দুমড়ে, কিন্তু ভাঙ্গবে না।

আজকাল একখানি বৃহদাকার রণতরীর ওজন যত হয়, তার শতকরা চল্লিশ ভাগ লাগে তাকে লৌহবর্মে আবৃত ক'রতে। কারণ জাহাজকে মাইন, টর্পেডো আর কামানের গোলা থেকে যতদূর সম্ভব রক্ষা ক'রতে হবে।

জাহাজের তলাটায় একূপ কোন বিশেষ আবরণ দেওয়া থাকে না ব'লে সব সময়ই জাহাজের তলাটাই হয় দুর্ব্বল। কিন্তু তলায় এক মাইনের আঘাত লাগা ছাড়া অন্য বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম। মাইনের আঘাত থেকে বাঁচতে হ'লে

অবশ্য এই ইস্পাতের আবরণ বিশেষ কোন কাজে আসে না। কাজেই তলাটা বাদ দিয়ে জাহাজের অন্য সমস্ত অংশ ইস্পাতে মুড়ে দিলে ক্ষতি বেশী হয় না। এই ভাবে ইস্পাৎ ব্যবহারের ফলে জাহাজের ওজন যায় বেড়ে; তার উপর যদি বড় বড় বা ভারী ভারী কামান রাখ্‌তে হয়, তবে সে হ'য়ে দাঁড়ায় এক ভীষণ ব্যাপার। জাহাজ হবে যত ভারী, তাকে চালাতে দরকার হবে তত শক্তিশালী ইঞ্জিন, আর ইঞ্জিন শক্তিশালী হ'লে তাতে কয়লা পুড়বে অনেক বেশী এবং একসঙ্গে অনেকখানি কয়লা বোঝাই ক'রে রণতরীর সমুদ্রযাত্রা ক'রতে হবে। এতে একদিকে ব্যয়ের বহর বাড়বে, অন্যদিকে জাহাজও ভারী হ'য়ে পড়বে। তা ছাড়া যে জাহাজ মাসের পর মাস সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াবে, তার নাবিকদের সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি না দিলেই বা চ'ল্‌বে কেন? এতেও জাহাজের ওজন অনেকখানি বেড়ে যেতে বাধ্য।

এখন দাঁড়ায় কয়েকটি সমস্যা। হয় ইস্পাৎ কমাতে হবে—নয় কমাতে হবে কামান, নতুবা কমবে এর গতিবেগ; অথচ সব কয়টাই সমান দরকার—কোনটার উপরই হাত দেওয়া চলে না। সবদিকে সমান শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখতে হ'লে, জাহাজের আয়তন ক্রমেই বড় হ'তে থাকবে। কিন্তু এই রকম অনির্দ্দিষ্ট ভাবে জাহাজের আয়তন বাড়ান চলে না, কেননা এই সব জাহাজ মাঝে মাঝে পরীক্ষা ক'রতে বা মেরামত ক'রতে দরকার হবে—এর আয়তন মাফিক্ ডক্, পোতাশ্রয় প্রভৃতি। জাহাজের আয়তন বাড়লে এগুলিকেও অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং তাতে অসুবিধা ও ব্যয়ের অঙ্ক এত বেশী হয়ে পড়বে যে, কোন দেশই তা বহন ক'রতে পারবে না।

এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশ তাঁদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মাফিক্ জাহাজের কোন কোন অংশ বাড়িয়ে কমিয়ে ঠিক ক'রে নিয়েছে, তাঁদের জাহাজের আয়তন ও ওজন কতটা হবে, আর তাতে কোন্ ধরণের ক'টা কামান থাকবে। সাধারণতঃ জাহাজে দূরপাল্লার ভারী কামানই রাখা হয়, আর তার ওজনও কিছু কম হয় না। কামানের ব্যাসের সঙ্গে তার ওজনের একটা সম্বন্ধ আছে; যেমন আট ইঞ্চি কামানের ওজন সাড়ে ষোল টন, আর ছয় ইঞ্চি কামানের ওজন সাড়ে সাত টন। যে রকম ওজন হবে কামানের, তার কাঠামোও তেম্‌নি দরকার হবে

কামানের ব্যাস যত বাড়বে, তার পাল্লাও তত বেশী হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওজনটাও থাকবে বাড়তে। সুতরাং কি ধরণের কামান ব্যবহার সুবিধাজনক হবে, এ নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। কামানের আকার কমিয়ে তার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া অনেকের মত, কারণ ভারী কামানের গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে তাতে খরচ হবে বেশী। কম পাল্লার মধ্যে যুদ্ধ হ'লে ছোট কামান দিয়ে কাজ বেশী পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু পাল্লা দূর হ'লে আবার এ নিয়ম খাটে না।

ক্ষুদে রণতরী

জগতে যত কিছু আবিষ্কার আজ পর্যন্ত হ'য়েছে, তা মানুষের প্রয়োজন অনুসারে আর তার চেষ্টাতেই হ'য়েছে। প্রয়োজন হ'লে মানুষ সর্ত্ত বা আইন

জার্ম্মাণীর ক্ষুদে রণতরী 'অ্যাড্‌মিরাল গ্রাফ স্পে'

বাঁচিয়েও কি ক'রে নিজের সুবিধা করে নেয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে জার্ম্মাণীর পকেট ব্যাটেলশিপ (Pocket Battle-ship) বা ক্ষুদে রণতরীগুলি। গত

মহাযুদ্ধে ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত ছিল এই যে, জার্ম্মাণী দশ হাজার টনের বেশী যুদ্ধ জাহাজ তৈরী ক'রতে পারবে না। তাই জার্ম্মাণী চেষ্টা ক'রতে লাগল, কি ক'রে সর্ত্ত বাঁচিয়েও শক্তিশালী জাহাজ তৈরী করা যায়। এই চেষ্টার ফল হ'ল তাদের ক্ষুদে রণতরী। এই জাহাজের খোলের লোহার পাতগুলি পিটিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হ'য়েছে, তার ওপর রিবিট মারা হয় নি। এই রকম আয়তনের যত যুদ্ধ জাহাজ আছে, তার চেয়ে এর ওজন ঢের কম। এত বড় যে যুদ্ধ জাহাজ তাতে বসান হ'য়েছে 'ডিজেল ইঞ্জিন'। তাতে জাহাজ বেশ জোরে চলে এবং দশ হাজার মাইল অনায়াসে ঘুরে আসতে পারে। সবচেয়ে সুবিধা হ'য়েছে এই যে, ডিজেল ইঞ্জিন তেলে চলে। জাহাজ যখন থামে, ইঞ্জিনও তখন বন্ধ হয় এবং তেলও খরচ হয় না। অথচ অন্যান্য জাহাজ থামলেও বয়লারে বাষ্প রাখতে হবে ব'লে কয়লা জ্বালাতেই হয়। এতেই জাহাজগুলির খরচও বেড়ে যায় অনেকখানি।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছুদিন পরই জার্ম্মাণীর এমনি একটা ক্ষুদে জাহাজ 'গ্রাফ-স্পে' আটলান্টিক মহাসাগরে বৃটিশ ক্রুজারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে নিজেকে ধ্বংস ক'রতে বাধ্য হয়।

ক্রুজার

ক্রুজার হয় দু'রকম, ব্যাট্‌ল্ ক্রুজার (Battle Cruiser) ও সাধারণ ক্রুজার ব্যাট্‌ল্ ক্রুজারগুলিও ব'লতে গেলে অতিকায় এবং রণতরীর সঙ্গে এদের তফাৎ

ব্যাট্‌ল্ ক্রুজার

কমই। রণতরীর চেয়ে ক্রুজারগুলি সামান্য হাল্কা, এতে অস্ত্রশস্ত্র কিছু কম থাকে, কিন্তু এর গতিবেগ খুব বেশী। এগুলির ব্যবহার আজকাল নাই ব'ললেই চলে।

অন্য শ্রেণীর ক্রুজারগুলিকে শুধু ক্রুজার আখ্যাই দেওয়া হয়। ক্রুজারগুলির

কাজ কি? এদের প্রধান কাজ সমুদ্র পথে পাহারা দেওয়া, বাণিজ্য জাহাজগুলির সঙ্গে থেকে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়া কিংবা যুদ্ধের সময় নৌবহরের মধ্যে থেকে শত্রুর উপর গোয়েন্দাগিরি করা, আর তাদের এই জাতীয় জাহাজগুলির সঙ্গে লড়াই ক'রে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া। এই সব কাজের জন্য ক্রুজারগুলির সঙ্গে থাকে বিমান; তা ব'লে এদের কিন্তু ঠিক বিমানবাহী জাহাজ বলা চলে না।

ক্রুজারগুলির ওজন আর আয়তনের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট হ'য়েছে, কোন্ জাতির ক্রুজার কতটা বড় হ'তে পারে। দশ হাজার টনের উপর কোন ব্রিটিশ ক্রুজার নাই। কিন্তু জাপান গোপনে সাতাশ হাজার টনী ক্রুজার তৈরী ক'রেছে ব'লে অনেকে ব'লে থাকেন।

ক্রুজারগুলির গতিবেগ খুব বেশী। ঘণ্টায় তেত্রিশ নট্ বা আটত্রিশ মাইল (১ নট্ = ৬০৮০ ফিট) পর্যন্ত হ'তে দেখা গেছে। একে অপেক্ষাকৃত কম পুরু ইস্পাৎ দিয়ে ঢাকা হয় এবং সাধারণতঃ নয় থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের কামান এতে বাঁধা হয়। চৌদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের কামান অবশ্য কদাচিৎ থাকে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম দিকে অ্যাজাক্স, (Ajax), এক্সিটার (Exeter) ও অ্যাকিলিস (Achilles) নামে তিনখানা ব্রিটিশ ক্রুজার কিভাবে 'অ্যাড্‌মিরাল গ্রাফ্-স্পে' নামক জার্ম্মাণ ক্ষুদে রণতরীকে যুদ্ধে কাবু ক'রেছিল, সেই কথা বলি।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস। ভোরের কুয়াসা ভেদ ক'রে আলোর রেখা ফুটে উঠতেই দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে টহলদার ব্রিটিশ ক্রুজার এক্সিটারের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন্ বেল্ দেখতে পেলেন, দূরে একখানা জার্ম্মাণ জাহাজ। ভোর তখন ছ'টা। ক্যাপ্টেন বেল্ খোলা ডেকের উপর এসে দাড়ালেন তাঁর দূরবীন হাতে। বার বার দূরবীনটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি দেখলেন জাহাজখানা জার্ম্মাণীর ত' বটেই—তার উপরও কিছু অর্থাৎ একেবারে ক্ষুদে রণতরী 'গ্রাফ্-স্পে'।

আজ এক্সিটারের বরাত ভাল, শিকারের মত শিকার একটা মিলেছে। ক্যাপ্টেন বেল এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে হুকুম দিলেন—"বেতার চালাও—খবর পাঠাও শত্রুর দেখা পেয়েছি"। খবর গেল—অল্প দূরেই ছিল আরও দু'খানা ব্রিটিশ ক্রুজার—অ্যাজাক্স আর অ্যাকিলিস। তারা ছুটে এল শিকারের দিকে।

গ্রাফ্-স্পের সন্ধান পাওয়ার পর থেকে তার সলিল সমাধি পর্য্যন্ত তিন খানি ইংরাজ জাহাজের মধ্যে এই প্রথম এবং শেষ বেতার বার্ত্তা।

ব্রিটিশ ক্রুজার অ্যাজাক্স

গ্রাফ্-স্পের নায়ক ক্যাপ্টেন ল্যাংস্‌ডর্ফ বুঝলেন সম্মুখেই ইংরাজ ক্রুজার; কিন্তু তিনি এসেছেন আটলান্টিক মহাসমুদ্রে শত্রুপক্ষের বাণিজ্য জাহাজ ডোবাতে। তাই তিনি এক্সিটারকে এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে ঘোরালেন তাঁর জাহাজের মুখ। কিন্তু তাঁর পালিয়ে যাওয়ার আশা সফল হ'লো না—তীব্র বেগে অ্যাজাক্স ও অ্যাকিলিস তাঁর পালাবার পথরোধ ক'রে এগিয়ে আস্‌ছে। ক্যাপ্টেন ল্যাংস্‌ডর্ফ দেখতে পেলেন তিনি প'ড়ে গিয়েছেন একদিকে উরুগুয়ের তীরভূমি আর অন্যদিকে অ্যাজাক্স ও অ্যাকিলিসের মধ্যে। আর তাঁর পিছন ফেরবার

পথও বন্ধ ক'রে রয়েছে এক্সিটার। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এক্ষেত্রে গ্রাফ্-স্পে আর কোন মতেই যুদ্ধ এড়াতে পারে না। ল্যাংস্ডর্ফ তার নাবিকদের ডেকে উৎসাহ দিলেন—তাদের বুঝিয়ে দিলেন নাৎসী জার্ম্মাণীর মুখরক্ষায় তাদের দায়িত্ব কতটা। তারপর হুকুম হ'ল 'সকলেই নিজের নিজের জায়গায় যাও।' উৎকণ্ঠিত নাবিকেরা নীরবে এসে যে যার জায়গায় দাঁড়াল।

'গোলা ছোড়'—ক্যাপ্টেন ল্যাংস্ডর্ফ আদেশ দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে এক্সিটারকে লক্ষ্য ক'রে ছুটল গোলা গ্রাফ্-স্পের এগার ইঞ্চি ব্যাসের কামান থেকে। আরম্ভ হ'য়ে গেল গোলাবৃষ্টি। অন্য ক্রুজার দু'খানা তখনও জার্ম্মাণ জাহাজের পাল্লার বাইরে, তাই ল্যাংসডর্ফ চাইলেন তারা এসে পড়বার আগেই এক্সিটারকে শেষ করে দিতে।

একটা গোলা এসে পড়ল এক্সিটারের একেবারে কাছে, আর ক্যাপ্টেন বেল্, কম্যাণ্ডার স্মিথ আর দু'একজন নাবিক ছাড়া সবাই গেল উড়ে।

বেল্ প্রমাদ গণলেন। অ্যাকিলিস আর অ্যাজাক্স এখনও এসে জায়গা নিতে পারেনি। তার জাহাজের এখন অন্তিম দশা; হয়ত আর একটি গোলার ঘায়েই হ'য়ে যাবে সব শেষ—আর গ্রাফ্-স্পে যাবে দূর সমুদ্রে পালিয়ে।

ভাববার সময় নাই। বেল্ কোন রকমে এগিয়ে চ'ললেন জার্ম্মাণ জাহাজের দিকে। তার আট ইঞ্চি কামানের পাল্লার মধ্যে গ্রাফ্-স্পেকে ফেলতে পারলে হয়ত বা ম'রতে ম'রতেও তাকে ঘায়েল করা যাবে।

ঠিক এই সময় অ্যাজাক্স ও অ্যাকিলিস এসে প'ড়ল উপযুক্ত স্থানে। গ্রাফ্-স্পে মুখ ঘুরিয়ে যাত্রা করল—আহত এক্সিটারকে ফেলে তার গা দিয়ে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু এক্সিটার তার শেষ চেষ্টা ক'রে সেটা বন্ধ ক'রে দিল। সম্মিলিত ব্রিটিশ ক্রুজারের গোলার ঘায়ে জার্ম্মাণ ক্ষুদে রণতরী অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ল। পালাতে না পেরে, বাধ্য হ'য়ে ঢুকল গিয়ে নিরপেক্ষ মণ্টেভিডো বন্দরে আহত অবস্থায়।

সেখান থেকে কাপ্টেন ল্যাংস্ডর্ফ বার্লিনে কর্তৃপক্ষের কাছে উপদেশ চাইলেন 'কি করব?' হুকুম হ'ল "মেরামত ক'রে বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে পড়। যদি পালাতে পার ভাল, না পার জাহাজ ডুবিয়ে দাও।" "কিন্তু জাহাজ ডুবানো?—সে যে

ভয়ানক অসম্মান!" হিটলার নিজে জবাব দিলেন—"হোক অসম্মান, শত্রুর হাতে ধরা দেবে না কোনমতেই।" উপায় নাই—ল্যাংসডর্ফ তার জাহাজ নিয়ে ফের বেরুলেন সমুদ্রে, যেখানে এক্সিটার, অ্যাজাক্স আর অ্যাকিলিস ব'সে আছে ওৎ পেতে গ্রাফ্-স্পের আশায়। আরও অনেক ইংরাজ জাহাজ ইতিমধ্যেই এসে দাঁড়িয়েছে, পলায়িত শত্রু যখন বেরিয়ে আসবে খোলা সমুদ্রে সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

অশ্রু সজল চোখে একেবারে বন্দরের মুখে গ্রাফ্-স্পের নাবিকেরা নিজে দিল তাদের জাহাজ ডুবিয়ে—বন্দর থেকে অন্য জাহাজ এসে নাবিকদের কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ মর্ম্মাহত—গ্রাফ্-স্পের সাথে সাথে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘটেছে সলিল সমাধি। তিনি বিজিত, অপমানিত, হৃতসর্ব্বস্ব।

নিজের জাহাজ নিজে ডুবানো! ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ সন্ধান নিলেন তার নাবিকেরা নিরাপদে ফিরেছে কি না! হতভাগ্য নাবিকের দল, নিজের হাতে যাদের মাথায় তুলে নিতে হ'ল কলঙ্কের পসরা, তারা নিরাপদে আছে—আর কেন?

বন্দুকের এক গুলিতে ল্যাংসডর্ফ শেষে করলেন আত্মহত্যা।

ডেষ্ট্রয়ার

নৌবহরের মধ্যে ক্রুজারের পরেই ডেষ্ট্রয়ারের স্থান। গেল যুদ্ধের সময় সাবমেরিন আর টর্পেডো বোটের অত্যাচারে যখন সমুদ্রে চলাচল করা কঠিন হ'য়ে উঠেছিল, তখন তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই সৃষ্টি হ'য়েছিল এই জাতীয় জাহাজ। কিন্তু আজকাল সমুদ্রের মধ্যে অনেক রকম কাজ ক'রতে হয় এই ডেষ্ট্রয়ারের। যদি শত্রুপক্ষের কোন ডেষ্ট্রয়ারের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাকে আক্রমণ ক'রতে এগিয়ে যায় ডেষ্ট্রয়ার, ডুবো জাহাজ খুঁজে তাকে অচল ক'রবার দায়িত্ব থাকে এই ডেষ্ট্রয়ারের উপর; মাইন পাততে মাইন তুলতেও এই ডেষ্ট্রয়ারগুলো হয় ভয়ানক তৎপর।

নৌযুদ্ধে ডেষ্ট্রয়ার কি কাজ করে? নৌযুদ্ধের সময় এই ডেষ্ট্রয়ারগুলোর কাজ হয় দু'রকম—আক্রমণাত্মক আর আক্রমণ-প্রতিরোধক। ডেষ্ট্রয়ারগুলোতে

টর্পেডো ছোঁড়ার ব্যবস্থা থাকায় সত্যিকারের লড়াইয়ের সময় এরা এগিয়ে যেয়ে শত্রুকে তাক্ ক'রে একটার পর একটা টর্পেডো ছোঁড়ে। যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষামূলক কাজের মধ্যে ডেষ্ট্রয়ারগুলি সাধারণতঃ বৃহৎ রণতরীকে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরে বেড়ায় আর রণতরীগুলি শত্রুর টর্পেডো আক্রমণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত

ডেষ্ট্রয়ার
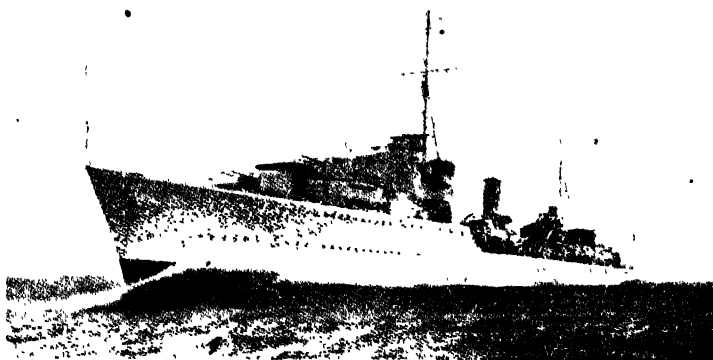
হ'য়ে গোলাবৃষ্টি করে শত্রুর জাহাজের উপর। আজকাল ডেষ্ট্রয়ারের গতিবেগ হয় সাঁয়ত্রিশ নট বা চল্লিশ মাইলেরও উপর। তা ছাড়া এদের আয়তন ছোট ব'লে শত্রুপক্ষ সহজে এদের তাক্ ক'র্তে পারে না।

ডেষ্ট্রয়ারগুলির গতিবেগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নানাভাবে এর ওজন কমিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। প্রথমতঃ একে ইস্পাৎ মোড়া হয় না, দ্বিতীয়তঃ এর কামান বন্দুকের সংখ্যা করা হ'য়েছে অনেক কম। এতে টর্পেডো টিউব ছাড়া সাধারণতঃ ৪·৭ ইঞ্চি বোরের কামান থাকে মাত্র চারটা থেকে আটটা। ডেষ্ট্রয়ারগুলি ক্রুজারের সঙ্গে যায় "কনভয়" বা দলবদ্ধ ব্যবসাদার জাহাজ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, এগুলির নিরাপত্তার জন্য। ডেষ্ট্রয়ারগুলি শত্রুর হাত থেকে লুকাবার উদ্দেশ্যে ধূমজাল ছড়িয়ে তার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে চলে, শত্রু তখন এদের দেখতে পায় না। এদের সঙ্গে স্বপক্ষের যে সব বিরাট বিরাট বাণিজ্যপোত বা অন্য জাহাজ থাকে,

সেগুলিও এই ধোঁয়ার মধ্যে লুকিয়ে পথ চলে। এই ধূমজাল ভেদ ক'রে শত্রুপক্ষের জাহাজ দূরের কথা তা'দের বিমান বা ডুবো জাহাজের পক্ষেও নৌবহরটা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ডেষ্ট্রয়ার ধোঁয়ার জাল ছ'ড়িয়ে চ'লেছে

ছোট ছোট ডেষ্ট্রয়ারগুলি সাধারণতঃ এক হাজার থেকে দেড় হাজার টনের মধ্যে হয়—বড়গুলিও যে খুব বেশী বড় হ'য়ে থাকে তা নয়, বড় জোর দু'হাজার টন

পর্যন্ত হয়। এই বড় ট্রেষ্ট্রয়ারগুলিকে বলা হয় ফ্লোটিলা। ছোট ছোট ট্রেষ্ট্রয়ার-গুলি শত্রুর এলাকায় মাইন পেতে আসে একদম অলক্ষ্যে, আবার নিজেদের পক্ষে

মাইন সুইপার

মারাত্মক হ'তে পারে এমন মাইনের সন্ধান পেলে তাকে কুড়িয়ে এনে নষ্ট করে মাইন কুড়াবার উপযুক্ত ট্রেষ্ট্রয়ারগুলিকে বলা 'মাইন সুইপার' (mine sweeper)।

মাইন

মাইন জিনিষটা কি? সমুদ্রের বুকে এগুলি হ'ল সাক্ষাৎ যম। জাহাজ শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে বেশ নিরাপদে চ'লেছে—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কোথাও কোন শত্রুজাহাজের আনাগোনা নেই—সবাই বেশ নিশ্চিন্ত—হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দ এবং তারপরই গেল জাহাজের তলার জোড় খুলে বা তুবড়ে—চাই কি তলায় হ'ল একটা মস্ত বড় ফুটো! এর পরে যা হবার তাই হয়—জাহাজের মধ্যে হুড় হুড় ক'রে জল ঢোকে, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটে তার সলিল সমাধি। ১৯০৩ সালে যখন রুশ জাপান যুদ্ধ হয়েছিল, তখনই সমুদ্রে মাইন পেতে এইভাবে শত্রুকে জব্দ করার নীতি পুরাপুরি গৃহীত হয়।

ফাটাবার ব্যবস্থা হিসাবে মাইনগুলিকে প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম হ'চ্ছে সেই জাতীয় মাইন—যা দূর থেকে বিদ্যুৎ শক্তি চালিয়ে সময় মত

ফাটান হয়। সারি সারি মাইন পেতে দূরে ব'সে থাকেন একজন সৈনিক—হাতে একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে, আর যেই তিনি তাতে দেখতে পান যে শত্রুপক্ষের জাহাজ তাঁর মাইনের আওতায় এসে প'ড়েছে, অমনি সুইচ টিপতেই ঠিক জাহাজের তলা ঘেঁসে অথবা পাশ থেকে ফাটতে আরম্ভ করে, সাক্ষাৎ যম এই মাইনগুলি—আর শত্রুজাহাজ হ'য়ে পড়ে একদম কাৎ। অনেক সময় এই

জাহাজের তলা মাইনের আঘাতে ফুটো হ'য়েছে

মাইনগুলি নিজেদের চোখ দিয়েই যেন শত্রুপক্ষের জাহাজ দেখে অপারেটারের নিকট খবর পাঠায়—"আর কেন? আমরা তৈরী"। এটা কি ক'রে সম্ভব হয়? এই জাতের মাইনগুলোর গায়ে থাকে শক্তিশালী মাইক্রোফোন্। তার সাহায্যে সে দূরের জাহাজের শব্দ সংগ্রহ ক'রে অপারেটারের কাছে পৌঁছে দেয় এবং সে জাহাজ শত্রুপক্ষের কিনা একবার দেখে নিয়ে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্তে অপারেটারটি করেন তাঁর কাজ। এই মাইনগুলো হয় বেশী দামী, আর এগুলো চালাতে অভিজ্ঞ

লোকের দরকার। তাই এগুলো ঠিক পোতাশ্রয়ের মধ্যে ছাড়া অন্য কোথায়ও ব্যবহার করা হয় না। এগুলোকে বলা হয়, নিয়ন্ত্রিত বা কন্‌ট্রোল্‌ড্‌ মাইন্‌ (Controlled mine)। আর এক শ্রেণীর মাইনকে বলে অনিয়ন্ত্রিত বা নন্‌কন্‌ট্রোল্‌ড্‌ মাইন (Non Controlled mine)। এগুলির সুবিধা এই যে এরা পাতবার সময় অথবা তারও কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত মোটেই বিপজ্জনক নয়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর এগুলি হয়ে দাড়ায় মারমুখী—শত্রু মিত্র কোন জাহাজকেই এরা খাতির করে না। এই ধরণের মাইনগুলি একবার বসিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। যে কয় প্রকারে এই মাইনগুলি ফাটান সম্ভব হয় তা পর পর বলছি—(১) মাইনটা এমন ভাবে তৈরী হ'তে পারে যে, জাহাজের ঘর্ষণে এর বাইরের একটা হাতল (handle) যাবে একটু স'রে, আর তারই ফলে মাইনের ভিতরের একটা কক্‌ (cock) বা খাঁচ যাবে খুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। (২) কোন কোন মাইন আবার ফাটে ইনারসিয়া (Inertia) বা জড়তার প্রভাবে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। জলের আঘাতে আঘাতে মাইনের মধ্যের একটা দোলক (pendulum) একটু একটু ক'রে স্থানচ্যুত হ'তে থাকে। অবশেষে যখন দোলকটি একেবারে স'রে যায়, তখনই মাইনটা যায় ফেটে। জাহাজ যখন মাইনের দিকে ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকে, তখন দোলকের উপর জলের আঘাত ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে পাল্লার মধ্যে এসে প'ড়লে আপনা থেকেই ফেটে যায় এই মাইন। (৩) কোন কোন মাইনে আবার ব্যবস্থা আছে যে জলের চাপে একটা ভাল্‌ভ ভেঙ্গে মাইনের মধ্যে জল ঢুকে পড়ে, আর এই জলের চাপেই ঘ'টে থাকে বিস্ফোরণ। (৪) মাইনের ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভব ক'রেও এই মাইনগুলি ফাটাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। জাহাজের সঙ্গে আঘাত লাগবার পরই এর ভিতরের একটা কাঁচের নল ভেঙ্গে, নলে রক্ষিত পটাশিয়ম ডাইক্রোমেট সলিউশন (Potassium dichromate solution) নীচে গড়িয়ে পড়ে এমন একটা পাত্রে, যাতে করে খানিকটা বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হ'তে থাকে। এই বিদ্যুৎই মাইনটিকে ফাটিয়ে দেয়। মাইন ফাটাবার আর একটা মারাত্মক ব্যবস্থা আছে। এই মাইনের গায়ে সংযুক্ত আছে মাইক্রোফোন,

যেমন আছে একশ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত মাইনে। জাহাজখানি যখন মাইনের খুব নিকটে আসে, তখন একটা মাইক্রোফোনের সাহায্যে একটি 'রিলে' (relay) দ্বারা হঠাৎ বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়।

মাইন কয়েক রকমের হয়ঃ—যথা—গতিশীল মাইন (moving mine), ভাসমান মাইন (floating mine), য়্যান্টোনা মাইন (antona mine) আর চুম্বক মাইন (magnetic mine)। মাইনের বিস্ফোরণ কি রকমে হয়, এইবার তা বলি। মাইনের ওপরের দিকে থাকে কাচের নল, খুব নরম সীসা দিয়ে সেটা ঢেকে দেওয়া হয়। তার ওপর একটা রবারের পাতের আবরণ থাকে। সীসাটি সামান্য আঘাতেই বেঁকে যায়, আর তার নীচে কাচের নলটি অমনি যায় ভেঙ্গে। তখন ওপর থেকে রাসায়নিক দ্রব্য নীচে প'ড়ে ঘটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণ হ'তে কয়েক মিনিট দেরী হয়, তার একটা উদ্দেশ্যও আছে। কারণ যদি নলটি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ হয়, তবে ক্ষতি হবে অতি সামান্যই; মাইন জাহাজের সামনের জল উৎক্ষিপ্ত ক'রবে, অথবা জাহাজের সম্মুখ দিকের কিছু ক্ষতি ক'রবে। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়া হ'য়ে মাইনের বিস্ফোরণ হ'তে যে সময়টুকু লাগে, তাতে জাহাজ যায় এগিয়ে আর মাইন আসে জাহাজের ঠিক নীচে একেবারে মাঝামাঝি জায়গায়। তখন কি জাহাজের আর রক্ষা আছে!

ডুবো জাহাজের কাছে মাইন ফাটলে তারও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। মাইন যেখানে ফাটে, তার কাছে যদি ডুবো জাহাজ থাকে তবে জলের অত্যধিক চাপে জাহাজ ফুটো না হয়ে যাক্—তার কলকজা চ'লে যায় আয়ত্তের বাইরে, আর বাধ্য হ'য়ে তাকে ভেসে উঠতে হয়। ভেসে উঠলে সাবমেরিণকে ঘায়েল করা বেশী শক্ত হয় না। কারণ চোরা শত্রুর চেয়ে সামনের শত্রু ঢের কম বিপজ্জনক।

মাইন দেখতে গোলাকার। এ জলের উপর ভেসে থাকে না। জলের ওপর ভাসলে দূর থেকে দেখা যাবে আর শত্রু হ'য়ে যাবে সাবধান এবং অনায়াসে তারা একে নষ্ট ক'রে ফেলবে। তাই মাইনটাকে জলের নীচে ভাসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মাইনের মধ্যে থাকে খানিকটা হাওয়া ভর্তি, যা তাকে জলের ওপর ভাসাবার চেষ্টা করে। এদিকে তার দিয়ে সমুদ্রের তলায় নোঙ্গরের সঙ্গে একে

বেঁধে সুবিধে মত জলের গভীরতায় মাইনটি পেতে রাখা হয়। এর ফলে হাওয়ার প্রভাবে মাইনটি একেবারে উপরে ভেসে উঠতে পারে না। যদি মাইনে হাওয়া ভর্ত্তি না থাকে—তার দিয়ে তাকে সমুদ্রতলের নোঙ্গরের সঙ্গে বেঁধে রাখা না হয়, তবে নিজের ভারে এ চ'লে যাবে একেবারে সমুদ্রের তলায় এবং সব উদ্দেশ্যই

মাইন
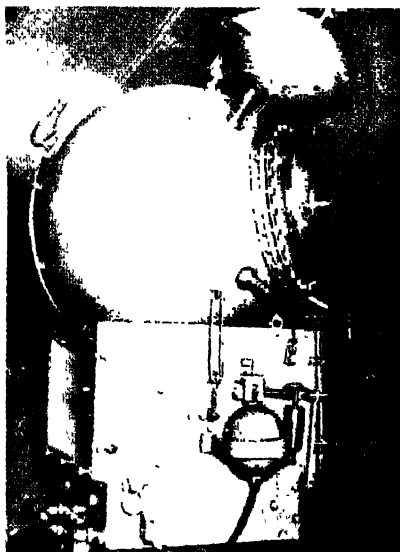
হ'য়ে যাবে ব্যর্থ। মাইনের মধ্যে খুব কম পক্ষে তিনশ' পাউণ্ডের বিস্ফোরক দ্রব্য থাকে। এই ওজনের রাসায়নিক দ্রব্যের বিস্ফোরণ হ'লে যে কি ব্যাপার হয়, তা কল্পনা করা কিছুই কঠিন নয়।

গতিশীল মাইনকে ছেড়ে দিলেই সে সমুদ্রের নীচে চ'লে যায় এবং এতে সংলগ্ন একখানা চাকা আপনা আপনি ঘুরতে থাকে। তখন মাইনটি আবার উপরে উঠতে থাকে। যখন সমুদ্রের বুকের কাছাকাছি উঠে আসে, তখন চাকাটি বন্ধ হ'য়ে যায়, পুনরায় মাইনটি তলায় নামতে থাকে। দিন নেই রাত নেই, মাইনটি এই রকমে অনবরত উঠা নামা করতে থাকে। মাইনের সঙ্গে একটি ভাল্‌ভের

কাজের জন্যই এ রকম হয়। একটা অসুবিধা এতে আছে। সেটা এই যে সমুদ্রের স্রোতের টানে নিজেদের জাহাজে এসে লেগে তাকে ঘায়েল করাও এর পক্ষে অসম্ভব বা আশ্চর্যের কিছুই নয়, সেইজন্য সেইখানেই এ মাইন পাতা যায়, যেখানে সমুদ্রজলের স্রোত শত্রুর দিকে বইছে।

ভাসমান মাইনগুলিতে বিপদের কম সম্ভাবনা। কারণ, এগুলো জলের ওপর ভেসেই বেড়ায়, আর স্রোতের টানে এদিক ওদিকে [illegible] নইচে

গতিশীল মাইন

ভাসমান মাইন

দূর থেকে দেখেই জাহাজ সতর্ক হ'য়ে যায় এবং গুলি ক'রে মাইন নষ্ট ক'রে দেয়। এগুলিকে দূর থেকে দেখে ফেলা সম্ভব ব'লে সব জাহাজই বেশ একটু হুঁসিয়ার হ'য়ে চলা ফেরা করে, কারণ সময় মত দেখতে পেলে অনেক দূর থেকে গুলি ক'রে মাইন ফাটিয়ে দেওয়া মোটের উপর সহজ কাজ।
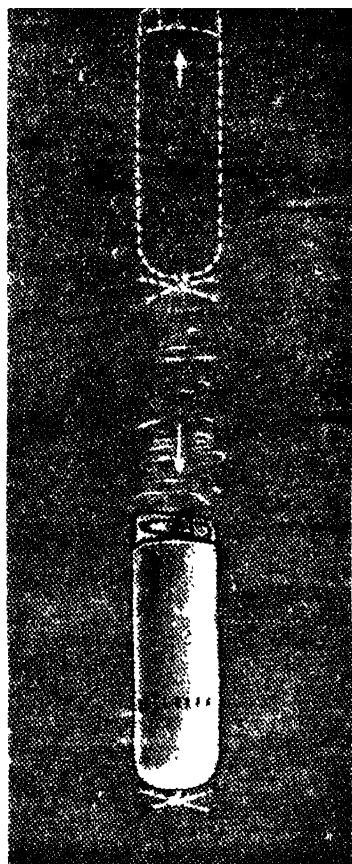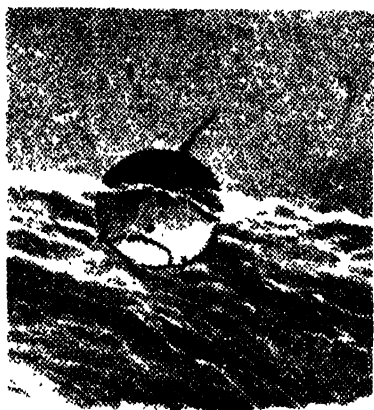
য্যানটেনা মাইন সমুদ্রের তলে নোঙরের সঙ্গে তার দিয়ে জলের বিভিন্ন গভীরতায় পেতে রাখা হয়, আর এর সঙ্গে দেওয়া থাকে মাকড়সার জালের মত বৈদ্যুতিক তার সমুদ্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত। কোন জাহাজ এই তারের সঙ্গে ঠেকলেই মাইন যায় ফেটে। এই মাইনগুলি কিন্তু সাবমেরিণের পক্ষে বড়ই মারাত্মক। কারণ জলের তলা দিয়ে যেতে গেলে, এই সব তারের সঙ্গে ডুবো জাহাজের ঠেকবার খুবই সম্ভাবনা, আর ঠেকলেই মাইন ফাটবে এবং হয় জাহাজের তলা ফুটো হবে নয়ত কল কবজা অকেজো হয়ে যাবে। দু'দিকেই সমান অবস্থা।
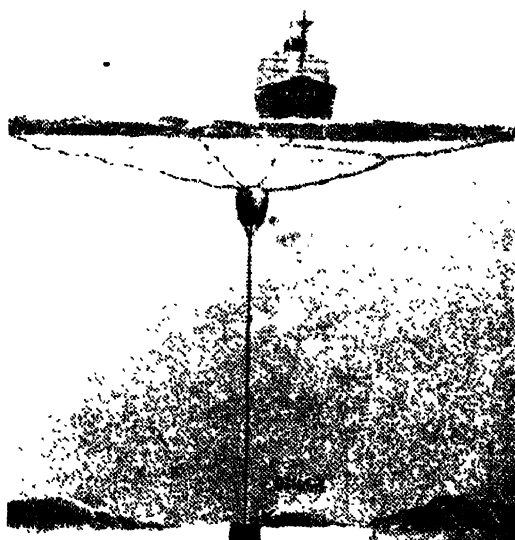
য্যানটেনা মাইন

এইবার বলছি সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক জিনিষ - হিটলারের গুপ্ত অস্ত্র—চুম্বক মাইনের কথা। চুম্বক মাইন কখনও কোন জাহাজের গায়ে এসে লাগে না, বা জাহাজকে টেনে তার গায়ে লাগায় না। ধাতু নির্ম্মিত জাহাজের চারিদিকে

স্বভাবতঃই ক্ষীণ চুম্বক থাকে এবং তা যত ক্ষীণই হ'ক্ না কেন চুম্বক মাইনের এলাকার মধ্যে গেলে তার প্রভাব মাইনের সরু স্ঁচকে চঞ্চল করে। স্ঁচ চঞ্চল হ'লেই মাইনের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চ'লতে থাকে এবং তার মধ্যের 'ডেটনেটর' (detonator) ক্রিয়াশীল হয় ও মাইন সশব্দে ফেটে যায়। ফাটলেই জলের অত্যধিক চাপে জাহাজের হয় শেষ অবস্থা। চুম্বক মাইন বেশী জলে পাতা হয় না। কারণ, গভীর জলের তলে থাকলে স্ঁচ সহজে চঞ্চল হয় না এবং জাহাজ উপর দিয়ে চ'লে গেলেও মাইন ফাটে না। মাইন যে উদ্দেশ্যে পাতা হ'ল, তাই যদি না হয় তবে আর লাভ কি ?
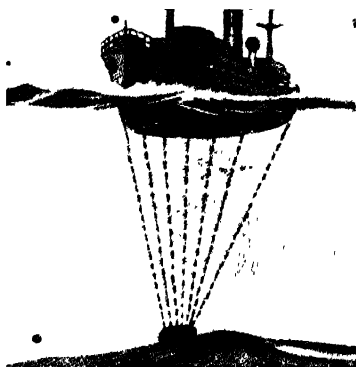
চুম্বক মাইন

চুম্বক মাইনের উপরে একটা আবরণ থাকে। সেটা গ'ল্‌তে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হয়। তাতে সুবিধা এই যে সাবমেরিণ বা যা কিছু এই চুম্বক মাইন পাততে যায়, তারা মাইন পেতে নিরাপদে স'রে প'ড়তে পারে। এই আবরণ না থাকলে মাইন পাততে না পাততেই নিজেদের জাহাজের চুম্বকে সেটা ফেটে যেত, আর তা'তে শত্রুর অনিষ্ট কোন দিনই হ'ত না, অনিষ্ট হ'ত নিজেদের।

সাধারণতঃ মাইন পাতে ডুবো জাহাজ আর বিমান অথবা সিপ্লেন। চুম্বক মাইন হয় অন্য মাইনের চেয়ে হাল্‌কা, তাই বিমান থেকে যখন এই মাইন পাতা হয় তখন একটু সতর্ক হ'তে হয়। যদি খুব উঁচু থেকে মাইন ফেলা হয়, তবে তার সঙ্গে একটা প্যারাশুট বেঁধে দেওয়া হয়—যাতে মাইনের ভিতরের কল খারাপ না হ'য়ে যায়। সাধারণতঃ পঞ্চাশ ফুটের উপর হ'লেই প্যারাশুট বাঁধা হয়। বিমান থেকে যে সব চুম্বক মাইন ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলি অন্যগুলির চাইতে হাল্‌কা।

চুম্বক মাইনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা চ'লছে। জাহাজের চারদিকে বৈদ্যুতিক

তার দিয়ে জাহাজের ধাতব চুম্বক নষ্ট করা হ'লে চুম্বক মাইন থাকবে প'ড়ে জলের নীচে আর জাহাজ ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে চ'লে যাবে।

ডুবো জাহাজে বসে ডুবুরি মাইন পাতছে।
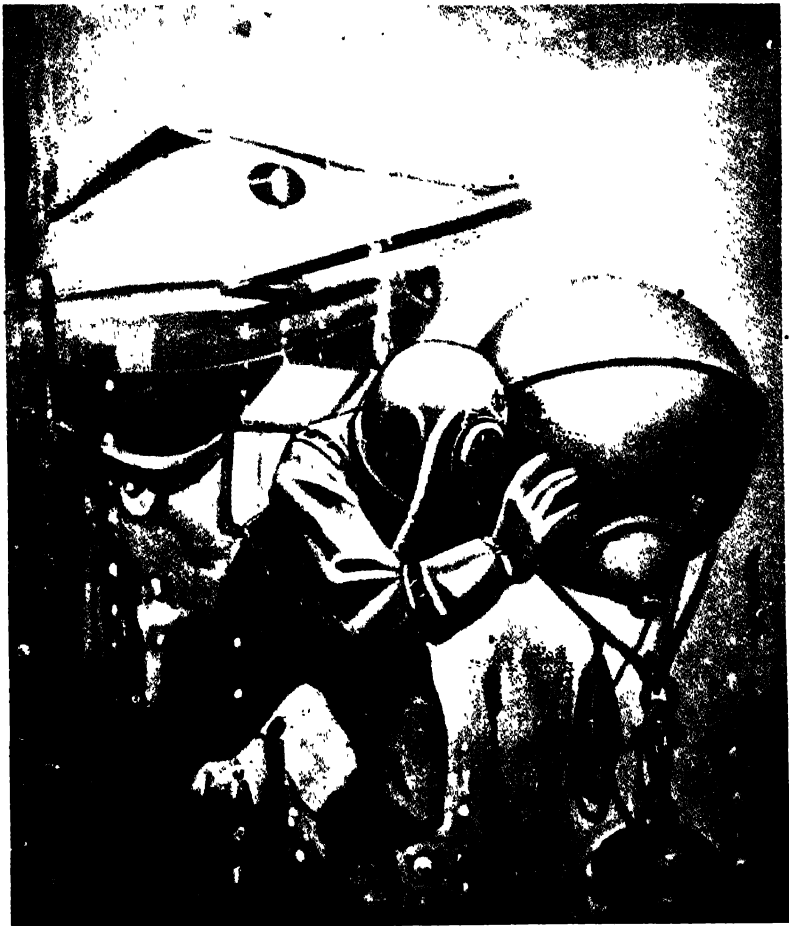
মাইন সুইপারগুলি কি ভাবে মাইন নষ্ট করে? প্রথমতঃ খুব সন্তর্পণে তারা দেয় মাইনের নোঙ্গরের তার কেটে এবং তার ফলে মাইনগুলি ওঠে ভেসে।

তখন মাইন সুইপারের নাবিকেরা এসে অনেক দূর থেকে গুলি ক'রে মাইনগুলি দেয় ফাটিয়ে।

মাইন সুইপার থেকে গুলি ক'রে মাইন নষ্ট করা হ'চ্ছে।

ডুবো জাহাজ

এইবার ডুবো জাহাজের কথা ব'লছি। ১৯১৪ সালের মহাসমরের আগে কেউ কি ধারণা ক'রেছিল যে, মাছের মত ডুবেও মানুষ ক'দিন পর্য্যন্ত থাকতে পারে? শুধু কি তাই! শত্রুর বড় বড় জাহাজ চোখের পলকে ভেঙ্গে চুরে সাগরের জলে ডুবিয়ে দিতে পারে? সত্যিই এ যেন এক পরম বিস্ময়। যে সাগরের ওপরেও বেড়াতে পারে আবার জলের তলেও অদৃশ্য হ'তে পারে, তার পক্ষে অসম্ভব আর কি আছে! এ যেন পাতাল পুরীর মৎস্যকন্যা আপন মনে জলের ওপর খেলে বেড়াচ্ছে, আবার যেই মানুষ দেখল অমনি জলের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কি ক'রে ডুবো জাহাজ বা সাবমেরিণ জলে ভাসতে পারে এবং ডুবতেও পারে, সাধারণ ভাবে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি। ভারী জিনিষ ডুবে যায়,

এটা জানা কথা। জল ভরতি ক'রে একে ভারী করবার এবং সেই জল বের ক'রে দিয়ে হালকা করবার কতকগুলি ট্যাঙ্ক বা জলাধার আছে ডুবো জাহাজে।
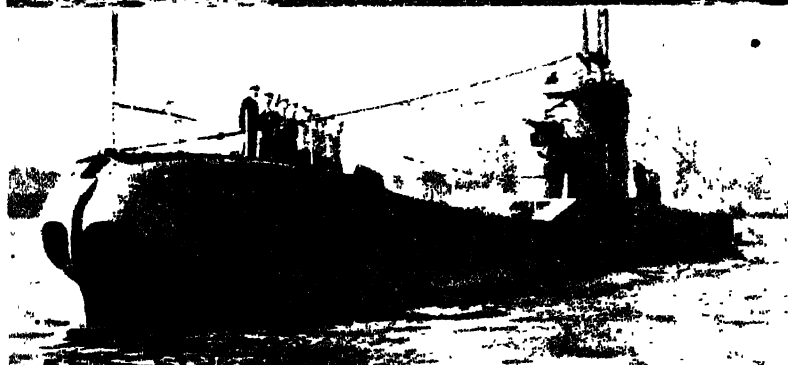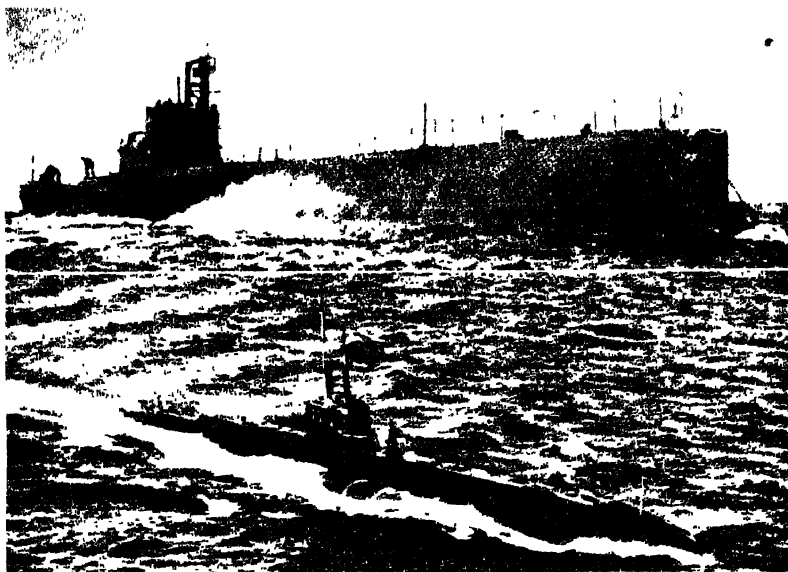
সাবমেরিণ

উপরে— এই ধরণের সাবমেরিণ মাইন পাতে

মধ্যে — এই জাতীয় সাবমেরিণ সাগরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়

নীচে দূর সমুদ্রে টহলদার সাবমেরিণ।

এই সবগুলি প্রয়োজন মত ব্যবহার করা হয়। ট্যাঙ্কগুলির উপর ও নীচে কয়েকটি ক'রে ভাল্‌ভ (Valve) থাকে। জাহাজ যখন জলের ওপর ভাসে, তখন ট্যাঙ্কের উপরের ভাল্‌ভ থাকে বন্ধ। জল ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকতে পারে না, কেন না তাতে মধ্যের আবদ্ধ হাওয়া বাধা পায়। 'কণ্ট্রোল' ঘর থেকে হাওয়া এনে সেই হাওয়ার চাপে ইচ্ছামত ট্যাঙ্ককে একেবারে খালিও করা যেতে পারে। তখন অবশ্য জাহাজ একেবারে ভেসে থাকবে। আবার যখন জাহাজের ডুববার দরকার হবে, তখন জলের ভাল্‌ভ খুলে ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢোকাতে হয় জল। জল যখন ভিতরে ঢুকে পড়ে, তখন ট্যাঙ্কের মধ্যের হাওয়া একটি 'বায়ুনিকাশের' নল দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং জাহাজটি আস্তে আস্তে জলের নীচে চ'লে যায়। দু এক মিনিটের মধ্যেই জাহাজটি ডুবে যেতে পারে। ভাল্‌ভের সংখ্যা বাড়িয়েই এই রকম ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'য়েছে। যখন সাবমেরিণ জলের নীচে চলে, তখন জলনিকাশের ভাল্‌ভ থাকে বন্ধ আর বায়ুনিকাশের ভাল্‌ভ থাকে খোলা, যখন ভেসে ওঠে, তখন ঠিক হয় তার উল্টো—ঘনবায়ু জোর ক'রে ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ক'রে ট্যাঙ্ক থেকে জল বেরিয়ে যেতে পারে। ট্যাঙ্কে যে পরিমাণ জল রাখা হবে, জাহাজ ঠিক সেই রকম ভেসে থাকবে। অর্থাৎ জাহাজখানি কতটা জলের নীচে থাকবে, সেটা নির্ভর ক'রবে ট্যাঙ্কে কি পরিমাণ জল রাখা হ'য়েছে তার উপর।

সাবমেরিণগুলি অগভীর সমুদ্রে জলের তলে গিয়ে কল থামিয়ে চুপ ক'রে থাকে। জাহাজের গায়ে এমন রং মাখিয়ে রাখা হয়, যেন মনে হয় সমুদ্রের সঙ্গে এখানা মিশে আছে। ডুবো জাহাজের নাবিক শত্রুদের দেখতে পাবে, কিন্তু শত্রু তাকে দেখতে পাবে না। এই হ'ল সাবমেরিণের মূল উদ্দেশ্য। বাইরে সমুদ্রগামী জাহাজের শব্দ হ'লেই সাবমেরিণের হাইড্রোফোনে তা ধরা পড়ে। তখন ডুবো জাহাজটি উপরে উঠে তার পেরিস্কোপ যন্ত্রটি কেবল জলের উপর ভাসিয়ে দেখে নেয়, কার জাহাজ এবং পাল্লার মধ্যে এসেছে কিনা। পেরিস্কোপে বেধে জলে ফেনা উঠলে শত্রু জেনে ফেলতে পারে যে, কাছাকাছিই ডুবো জাহাজ আছে; তাই বেশীক্ষণ পেরিস্কোপ ভাসিয়ে রাখা হয় না। তারপর নাবিকেরা অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে জাহাজখানাকে লক্ষ্য ক'রে পরপর ছুঁড়তে থাকে অনেকগুলি টর্পেডো

সাবমেরিণের নক্সা
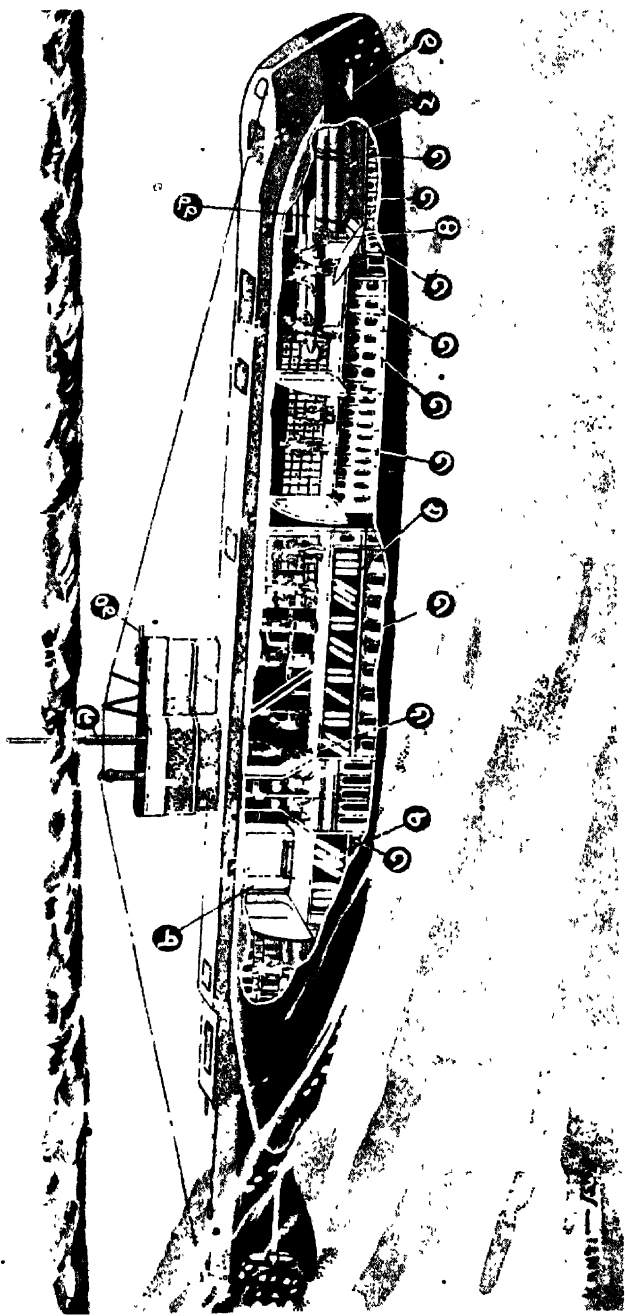
(১) টর্পেডো বাহির হওয়ার দরজা, (২) টর্পেডো টিউব, (৩) ভাসা ডোবার বিবিধ ট্যাঙ্ক, (৪) টর্পেডো ছোঁড়ার চাকা, (৫) ঘনচাপের বায়ু ঘর, (৬) পেরিস্কোপের নিম্নাংশ, (৭) নলচাপের বায়ু ঘর, (৮) বেতার অফিস, (৯) পেরিস্কোপের উপরাংশ, (১০) কামান, (১১) টর্পেডো

এমনভাবে যে, জাহাজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শত্রু যেন টর্পেডোর হাত থেকে পরিত্রাণ না পায়।

একটি জিনিসের সম্বন্ধে ডুবো জাহাজের নাবিকদের খুব সতর্ক থাকতে হয়। মাইন, টর্পেডো ছুঁড়লে, খাদ্য পানীয়ের খরচে এবং জাহাজের তেল কয়লার খরচে জাহাজের ওজন যায় ক'মে। তাই ট্যাঙ্কে আবশ্যক মত কম বেশী জল ঢুকিয়ে বা বের ক'রে দিয়ে ওজন ঠিক ক'রে নেওয়া হয়। এর জন্যেই ডুবো জাহাজে ট্যাঙ্ক থাকে অনেক রকম ও অনেকগুলি।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, জলের নীচে মানুষ বাঁচে কি ক'রে? বাঁচবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে বাতাস, তা জলের নীচে নাবিকেরা কোথায় পায়? সাবমেরিণ যখন জলের নীচে থাকে তখন ব্যবহার ক'রবার জন্য জাহাজে দিয়ে দেওয়া হয় খানিকটা তরল অক্সিজেন। এই তরল অক্সিজেনের পাত্রের মুখ খুলে দিলেই বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস বেরিয়ে আসতে থাকে, আর নাবিকদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের কাজে লাগে। অক্সিজেন নিয়ে নামলে এবং কল খারাপ না হ'লে যে কোন ডুবো জাহাজ পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা জলের নীচে থাকতে পারে। সমুদ্রের উপরে ডুবো জাহাজ ঘণ্টায় প্রায় সতের আঠার মাইল যায় এবং জলের নীচে চলে দশ এগার মাইল। এখানে একটা কথা ব'লে রাখা ভাল যে, ডুবো জাহাজ বেশীর ভাগ সময় জলের উপরেই চলে, বিপদ দেখলেই নীচে যায়।

আগেকার তুলনায় এখন ডুবো জাহাজ অনেক ছোট করা হয়। কিন্তু তাই বলে এর শক্তি কমে নাই, বরং বেড়েই গেছে। আজকাল জাপান নাকি এমন ছোট ডুবো জাহাজ তৈরী করেছে, যা চালাতে একখানা মোটর গাড়ীর মত তেল খরচ হয়। অথচ এ বহুদূর পর্য্যন্ত অনায়াসে বেড়াতে পারবে, এমন দাবী করা হয়েছে।

ডেপ্‌থ্‌ চার্জ্জ

এই যে পরম বিস্ময় ও অধিকতর ভয়াবহ ডুবো জাহাজ তাকেও কাবু করবার যন্ত্র মানুষ ক'রেছে আবিষ্কার। তার নাম হচ্ছে 'ডেপ্‌থ চার্জ্জ'। কত সামান্য পরিশ্রমে এবং কত সামান্য ব্যয়ে যে এটি তৈরী হ'য়েছে, তা দেখলে ও ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়

আগে ডুবো জাহাজ ঘায়েল ক'রবার ব্যবস্থা ছিল একেবারে ছেলেমানুষী। পাহারাদার জাহাজের লোক হাতুড়ী দিয়ে ডুবো জাহাজের পেরিস্কোপ ভেঙ্গে দিত এবং বর্শা—বোমা মারত। আজকাল এই 'ডেপ্থ্ চার্জ্জ' বা জলবোমা যদি ডুবো জাহাজের কাছে ফাটে, তবে জলে যে ভীষণ চাপ হয়, তাতে জাহাজটিকে তুলে আছড়ে ফেলে, এর তলা দেয় তুবড়ে, বৈদ্যুতিক তারগুলি যায় অকেজো হ'য়ে, কলকব্জা যায় বিগড়ে। এতে নাবিকদের মনের সাহস যায় হারিয়ে। এক কথায় ডেপ্থ্ চার্জ্জে আঘাত ক'রলে, সে চার্জ্জ ডুবো জাহাজের গায়ে লাগুক বা না লাগুক, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া জাহাজের পক্ষে হ'য়ে দাঁড়ায় একরকম অসম্ভব।

ডেপ্থ্ চার্জ্জ অতি সাধারণভাবে তৈরী হয়। একটি দেড় ফুট চওড়া এবং সোয়া ফুট লম্বা ষ্টীলের চোঙ্গার মধ্যে তিনশ' পাউণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্য ভরতি করা হয়। উপরে আছে একটি পিস্তল এবং তার উপরে একটি হাইড্রোষ্টাটিক ভাল্ভ। এই ভাল্ভটি স্প্রীং এর দ্বারা বন্ধ থাকে। চার্জ্জটি ছোড়া হ'লেই জলে ডুবে যেতে থাকে। যে গভীরতায় জলের চাপ স্প্রীং এর চাপের চেয়ে বেশী, সেখানে ভাল্ভটি খুলে যায় এবং পিস্তলে লাগান বারুদ গিয়ে পড়ে আসল বিস্ফোরকের উপর। তাইতেই চার্জ্জটি ফেটে যায়। ভিন্ন ভিন্ন গভীরতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্প্রীং এর ভাল্ভ ঠিক ক'রে দেওয়া হয়। কারণ, ডুবো জাহাজ কোথায় আছে, তা ঠিক জানা তো যায় না। ডেপ্থ্ চার্জ্জ এর যা কিছু কল ও কৌশল, তা এই।

এখন ডেপ্থ্ চার্জ্জ কি ক'রে ছোড়া হয়? যে ডেষ্ট্রয়ার থেকে চার্জ্জ ছোড়া হয়, তা যদি বেশী দূর না যেতে পারে, তবে চার্জ্জের চাপে তারই যথেষ্ট ক্ষতি হ'তে পারে। তাই আজকাল ডেষ্ট্রয়ারের পিছন দিয়ে একটি চার্জ্জ গড়িয়ে দিয়ে পাশে হাউইটজার দিয়ে আরও কয়েকটি ছোড়া হয়। অবশ্য সে সময় জাহাজ খুব জোরে সমুখে চলতে থাকে। চার্জ্জটি রাখা হয় একটি পাতলা ষ্টীলের দোলনায়। দোলনায় আছে একটি ডাঁট। দোলনাটি হাউইটজারের মুখ দিয়ে ডাঁটটি নলের মধ্যে দেওয়া হয়। তারপর কামানটি ফুটিয়ে দিলেই দূরে যেয়ে পড়ে।
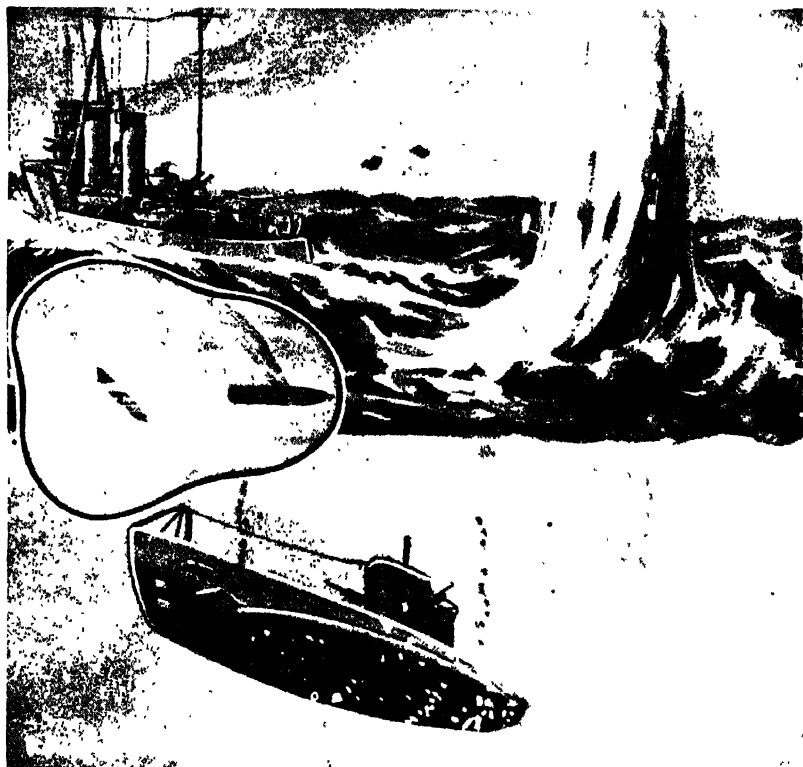
ডেপ্‌থ চার্জ্জ

পেরিস্কোপের চোঙ্গ দেখলেই ডেষ্ট্রয়ার তাকে তাড়া ক'রে, তার চারপাশে বিভিন্ন গভীরতায় চার্জ্জ ছোঁড়ে। আজকাল আবার পেরিস্কোপও দেখ্‌তে হয় না, যন্ত্রেই ডুবো জাহাজের অবস্থান ব'লে দেয়। তাতে কষ্ট এবং খরচও ক'মে যায়।

ডুবো জাহাজে চার্জ্জ কি রকম চাপ দেয়, তা অনেকগুলি জিনিষের ওপর নির্ভর করে; যথা—বিস্ফোরকের শক্তি, জলের চাপ, বায়ুর পারিপার্শ্বিক চাপ এবং জলের লবণাক্ততা।

টর্পেডো

এইবার ব'লব টর্পেডোর কথা—কি ক'রে ডুবো জাহাজ থেকে টর্পেডো ছুঁড়ে শত্রু জাহাজ ঘায়েল করা হয়, তারই কথা।

টর্পেডো একটি জটিল জিনিষ। তার মধ্যে কত যে হিসাব ক'রে কত যে যন্ত্র সাজিয়ে দেওয়া আছে, তার আর ইয়ত্তা নাই। ডুবো জাহাজ থেকে একটি জাহাজ লক্ষ্য ক'রে টর্পেডো ছোড়া হ'ল। এটি ঠিক্ সমান শক্তিতে, আপনার হালে আপনি এদিক ওদিক একটুও না ঘুরে, সেই চলন্ত জাহাজকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে
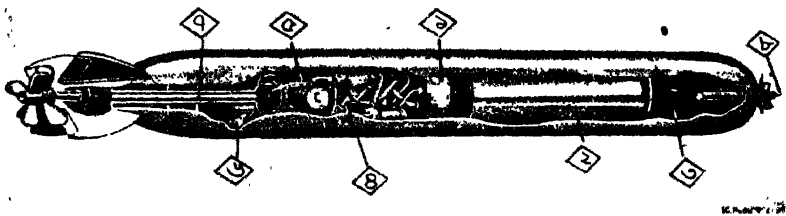
টর্পেডো

(১) জলের প্রকোষ্ঠ, (২) ঘন বায়ুর ঘর, (৩) পাঁচশ পাউণ্ড বিস্ফোরক, (৪) প্যারাফিন প্রকোষ্ঠ, (৫) গরম বায়ুর ইঞ্জিন, (৬) হালের মোটর, (৭) প্রপেলার, (৮) সংঘাত পিন।

গিয়ে আঘাত ক'রে ডুবিয়ে দিল। এই যে অস্ত্র, সে কি সোজা জিনিষ! এতে ঠিক করা থাকে টর্পেডোটি কত কোণে যাবে এবং কি রকম জোরে যাবে, আর কেমন ক'রে আঘাত ক'রবে। মোট কথা জগতের সব চেয়ে ছোট ঘড়িতে যত ছোট কলকব্জা আছে, তার চেয়েও এই টর্পেডোর অংশগুলি ছোট। টর্পেডোর কল একবার বেঁধে দিয়ে ছুঁড়লে তা অব্যর্থ হবেই। একটা একুশ-ইঞ্চি টর্পেডোতে থাকে মোট ছয় হাজার অংশ, আর নির্ম্মাণ ব্যয় পড়ে এর প্রত্যেকটায় দু'হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ কম বেশী আটাশ হাজার টাকা।

টর্পেডোর মুখেই থাকে প্রায় পাঁচশ' পাউণ্ডের বিস্ফোরক। তারপর থাকে ঘন চাপের বায়ুর ঘর। চাকা ঘোরার কল ঘরে ঢোকার আগে এই বায়ু গরম করার ব্যবস্থা আছে। প্রায় সাড়ে তিনশ' অশ্ব-শক্তির সমান এব এই বায়ু

ইঞ্জিন। তার পর আছে ইঞ্জিন ঘর। এখানেই জলের মধ্যে উঠা নামার, গতি ঠিক রাখার, চাকা ঘোরার এবং কোথায় ভেসে উঠবে সেটা ঠিক ক'রে দেবার সমস্ত বন্দোবস্ত আছে। সামান্য এই তিন ফুট জায়গার মধ্যে কি ক'রে যে এত ব্যবস্থা হয়, তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। টর্পেডোর চাকার পাতগুলি পর পর বসান এবং সেগুলি সমস্ত পরস্পরের বিপরীত দিক ঘোরে গতির সমতা রক্ষার জন্য।
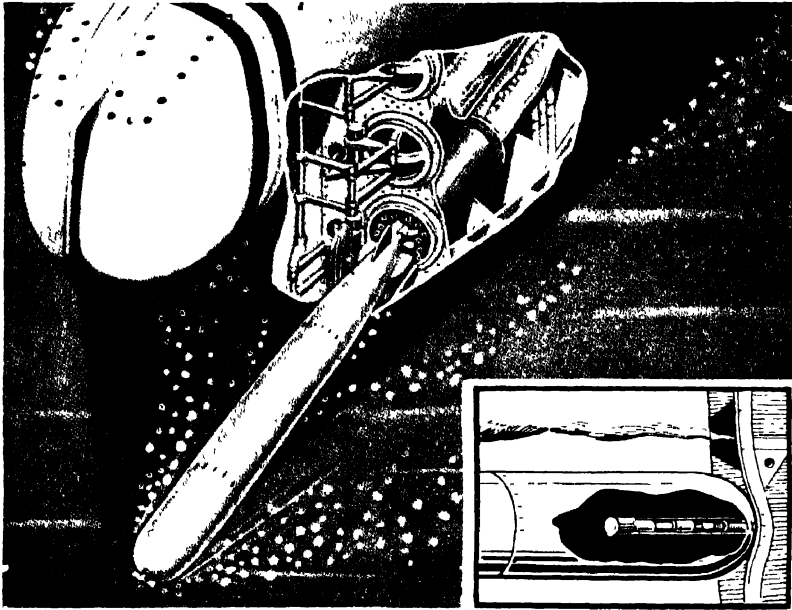
ঠিক যে মুহূর্ত্তে টর্পেডো জাহাজ থেকে বের হয়।

টর্পেডো ছোঁড়া হ'লে, প্রথমে ঘণ্টায় পঞ্চাশ যাট মাইল বেগে এটা ছুটে চলে। কিন্তু ক্রমশঃ এর জোর ক'মে যায়। তখন প্রায় চল্লিশ মাইল জোরে চলে। এজন্য টর্পেডো বেশী দূর হ'তে ছোঁড়া হয় না; তাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার খুব বেশী সম্ভাবনা। জাহাজের পিছনে গিয়ে টর্পেডো ছোঁড়া হয় না; কারণ জাহাজের পিছনের চাকায় যে জলের আবর্ত্ত সৃষ্টি হয়, তাতে টর্পেডোর গতি ঘুরে যেতে পারে, অথবা জাহাজে লাগলেও তত ক্ষতি তার নাও হ'তে পারে।

জাহাজের মাঝামাঝি দিয়ে দু'পাশে লম্ব টেনে তাকে ব্যাস ধ'রে একটি অর্দ্ধবৃত্ত তৈরী ক'রে তার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ থেকে টর্পেডো ছুঁড়লে আর জাহাজের নিস্তার নাই।

সাধারণতঃ পাঁচশ' গজ দূর থেকে টর্পেডো ছোঁড়া হয়। এর বেশীও হ'তে পারে, তবে বেশী দূর গেলে টর্পেডোর গতি ঘুরে জাহাজে নাও লাগতে পারে।

মোটামুটি দু'টি উপায়ে টর্পেডোর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। প্রথম উপায় ডুবো জাহাজের সন্ধান পেলেই জাহাজের গতি বাড়িয়ে কি কমিয়ে দেওয়া। কারণ, জাহাজের গতি কম কি বেশী হ'লে টর্পেডো যে জায়গা লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া হবে, যথাসময়ে জাহাজ সে যায়গায় থাকবে না; হয় একটু বেশী কিংবা একটু কম এগিয়ে যাবে।

টর্পেডো লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েছে

অন্য উপায় জাহাজের পক্ষে সাবমেরিণকে ছাড়িয়ে যাওয়া। জাহাজ যদি

সাবমেরিণকে একবার পেরিয়ে যেতে পারে, তবে তার ভয় অনেকটা কেটে যায়। কারণ জলের নীচে সাবমেরিণ কম জোরে চলে এবং জাহাজের পিছন থেকে টর্পেডো মারলে অনেক সময়ই সেটা না লাগার সম্ভাবনা।

বিমানবাহী জাহাজ

জলযুদ্ধে বিমানের প্রয়োগ অত্যন্ত আধুনিক। তাই প্রথম দিকে পুরাণ রণতরীগুলিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে বিমানবাহী জাহাজ প্রস্তুত করা ছিল সাধারণ প্রথা। বিমানের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়াতে ও অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওযাতে এখন অবশ্য সম্পূর্ণ নূতন নূতন বিমানবাহী জাহাজ নির্ম্মাণ করার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

বিমানবাহী জাহাজের বৈশিষ্ট্য কি? এই সব জাহাজকে হ'তে হবে বিরাট আয়তনের, আর এর উপরে থাকতে হবে বিমান ওঠা নামার জন্য পর্য্যাপ্ত স্থান। এক কথায় এই জাহাজগুলিকে হ'তে হবে ভাসমান বিমান ঘাঁটি এবং বিমান ঘাঁটিতে আবশ্যক সব রকম ব্যবস্থাই এতে বর্ত্তমান থাকা দরকার। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের উপর অবশ্য বিমান ঘাঁটির বিরাট মাঠ পাওয়া সম্ভব নয়; তবুও জাহাজের মাথার উপর প্রকাণ্ড ডেক (deck) নির্ম্মাণ ক'রে মাঠের কাজ চালান হয়। এই ডেকগুলি লম্বায় হয় ছ'শ' থেকে আটশ' ফিট। এতে অবশ্য জাহাজখানির মাথা অনেকটা ভারী হ'য়ে পড়ে—আর এই বিরাট ডেক থাকার জন্যই আকাশ থেকেই হ'ক আর সমুদ্র থেকেই হ'ক, শত্রুর গোলাগুলির পক্ষে একে আঘাত করার সুবিধা হয় অনেক বেশী। নির্ম্মাণ প্রণালীর নূতনত্বের দিক থেকে এই অসুবিধা দূর করা অনেক কঠিন। সেই জন্য বিমানবাহী জাহাজে অনেকগুলি ক'রে জঙ্গী বিমান রাখা হয়। পাহারাদার বিমানগুলি দূরে শত্রুর সন্ধান পেলেই এই জঙ্গী বিমানগুলি এগিয়ে যেয়ে শত্রুকে বাধা দেয়, যাতে ক'রে শত্রুবিমান জাহাজের কাছে মোটেই আসতে না পারে। জলযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলে, এই ধরণের জাহাজগুলি শত্রুর কামানের পাল্লা বাঁচিয়ে দূরে অবস্থান করে, আর কতকগুলি বিমান একে ঘিরে উড়তে থাকে, যাতে শত্রুর বিমান এর কাছে আসতে না পারে। অনেকগুলি বিমান অবশ্য এগিয়ে যেতে পারে শত্রুর জাহাজ
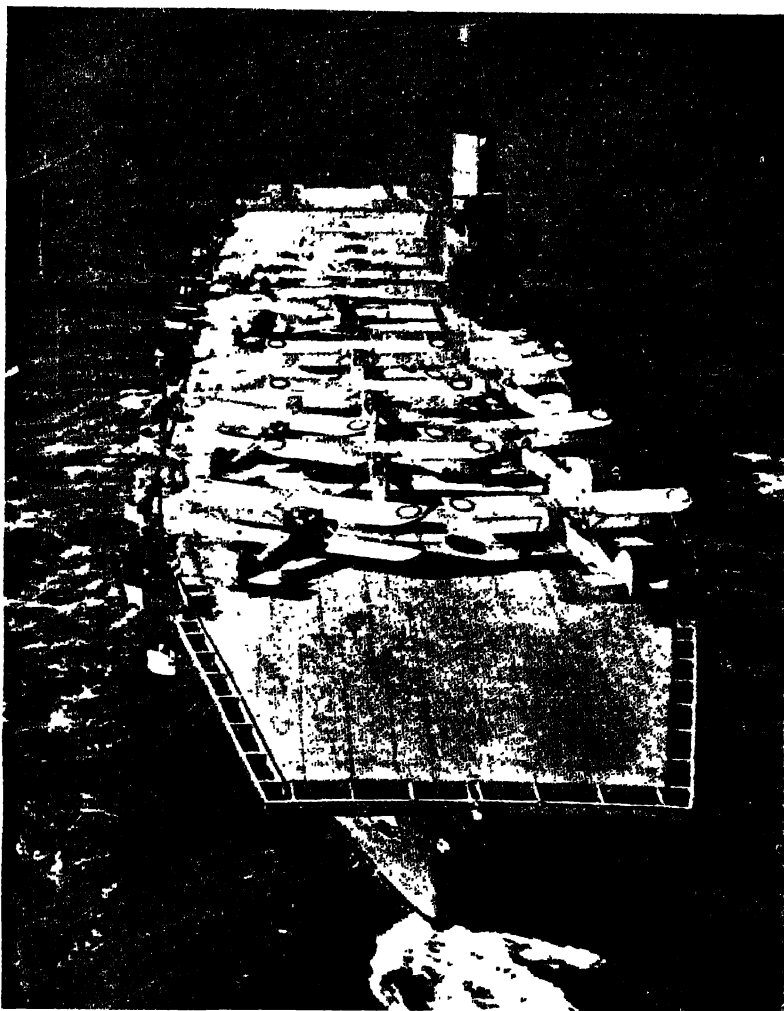
বিমানবাহী জাহাজ

আক্রমণ ক'রতে। বিমানবাহী জাহাজে এই জন্যই বিমান-বিধ্বংসী কামান রাখা হয় প্রচুর পরিমাণে।

বিমানবাহী জাহাজে আরও একটি গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বিমানে ব্যবহারের জন্য এতে প্রচুর পেট্রোল সব সময় মজুত রাখা প্রয়োজন। এর ফলে আগুনের ভয় যায় অসম্ভব রকম বেড়ে। এই জন্যই বিমানবাহী জাহাজে আজকাল তেলগুদাম একটি না ক'রে কয়েকটি করা হয় এবং তাদেরকে যথাসম্ভব অগ্নি-প্রতিরোধক ক'রে তৈরী করা হয়। হঠাৎ যদি কোন প্রকোষ্ঠে আগুন লাগে, তবে তার ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে অনেক কম।
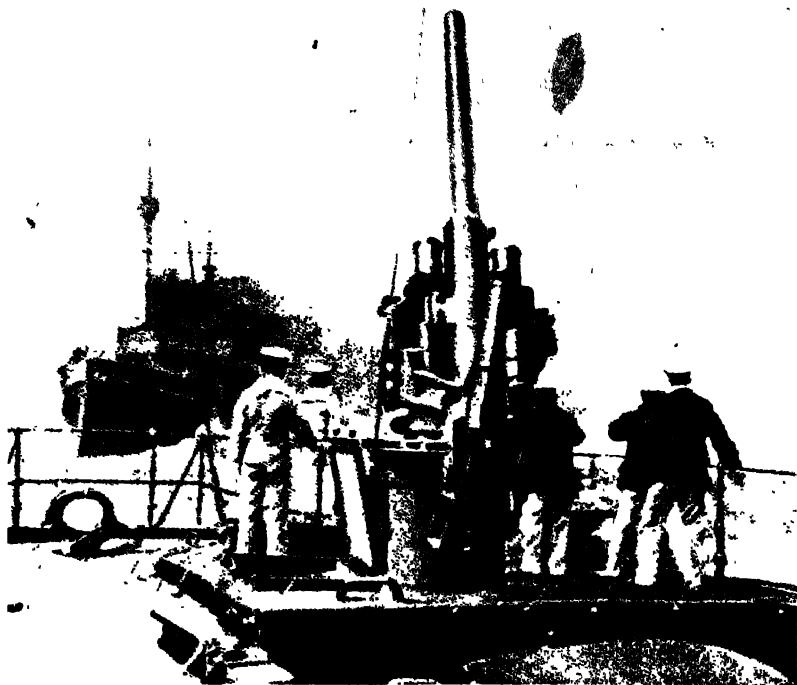
জাহাজের উপর বিমান-বিধ্বংসী কামান

বিমানবাহী জাহাজের গতিবেগ কত? এগুলিকে স্বভাবতঃই হ'তে হয় ক্ষিপ্রগামী। কারণ, জাহাজের গতি যত বেশী হবে, তত সহজে এবং তত অল্প স্থানের মধ্যেই বিমান আকাশে ওঠা নামা ক'রতে পারবে। সাধারণতঃ এই বিমানবাহী জাহাজগুলির গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ত্রিশ নট্ অর্থাৎ প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল।

জল বাহিনীতে বিমানের ব্যবহার সম্বন্ধে দু' একটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। বিমানবাহী জাহাজে নৌ-বিমান ও সাধারণ বিমান দুইই রাখবার ব্যবস্থা আছে।

নৌ-বিমান উঠাতে বা নামাতে সাধারণতঃ ক্রেন এবং ক্যাটাপুল্ট্ ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে, জলবিমানই জল বাহিনীতে অধিকতর কার্য্যকরী হবার সম্ভাবনা—আসলে কিন্তু তা নয়। কেননা স্থির সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে জলবিমান সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁকে উড়ান যেতে পারে অথবা উ'ড়ে এসে জলে প'ড়লে তাকে উঠিয়ে নেওয়া চলে—কিন্তু ঝড়ের সময় দুস্তর সমুদ্রে ঢেউএর মধ্যে এগুলি দিয়ে কোন কাজই হ'তে পারে না।
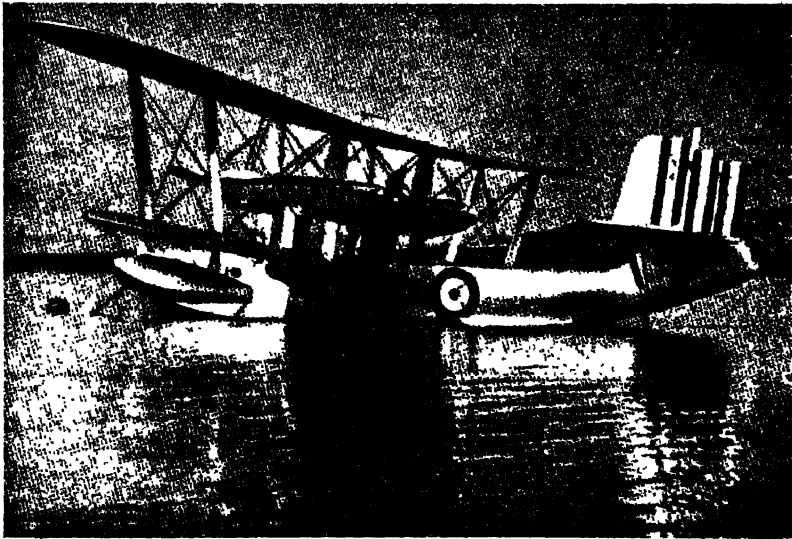
নৌ-বিমান

বিমানবাহী জাহাজে যে শ্রেণীর বিমানই থাকুক না কেন, তাদের কর্ত্তব্য অতি কঠোর। যে সব বিমান মাটীর উপর দিয়ে যায়, আকাশ থেকে তারা নীচের গাছপালা, পাহাড়-পর্ব্বত, দেশ, জনপদ দেখ্‌তে পায় ব'লে তাদের পথ হারাবার

সম্ভাবনা থাকে কম। কিন্তু জল বাহিনীর কোন বিমান আস্তানা ছেড়ে একবার বের হ'লে কেবলই সমুদ্র—আর সমুদ্র। এরই মাঝে পথ চিনে বাহক-জাহাজে ফিরে আসা কত কষ্টকর, সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়।

নৌ-বাহিনীর এই সব বিমান থেকে বোমা ফেলা, টর্পেডো ছোঁড়া আর মেশিন গান চালানো হয়। সাধারণভাবে আকাশ বাহিনী যে ভাবে বোমা ফেলে, এই সব নৌ-বিমান থেকে তেমনি ভাবেই বোমা ফেলা হয়। কিন্তু চলন্ত জাহাজের উপর বোমা ফেলাটা বেশ একটু কঠিন। কেননা শহরের উপর ঘরবাড়ীগুলো থাকে স্থির—জাহাজখানি এগিয়ে চলে তীব্রগতিতে। জাহাজে বোমা ফেলতে হ'লে শত্রুকে অবাক ক'রে দিয়ে বিমানখানি বোমা ফেল্‌তে ফেল্‌তে নেমে আসে জাহাজের দিকে—একেবারে ঠিক খাড়াভাবে, যাতে জাহাজের গতির জন্যে তা'র এই সমকোণে নেমে আসার কোন ব্যাঘাত না ঘটে, বিমান-চালক থাকেন সেদিকে সতর্ক।

যে কোন নৌ-বিমান থেকে কিন্তু টর্পেডো ছোঁড়া যায় না। এর জন্যে দরকার বিশেষ ধরণের বিমান। এই বিমানগুলি অলক্ষিত ভাবে অনেক উপর দিয়ে উড়ে আসে শত্রুর জাহাজের দিকে। টর্পেডোগুলো বিমানের তলায় এমনভাবে সাজান থাকে যে, টর্পেডোর মুখটা থাকে বিমানের চাকা দুটোর মাঝে। এখন বিমানখানা টর্পেডো ছোঁড়বার মুখে উপর থেকে শোঁ ক'রে নেমে আসে জাহাজখানার মাত্র ১০০ ফুটের মধ্যে এবং এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়া টিপে জাহাজের কমবেশী হাজার গজের মধ্যেই ছোঁড়ে এই টর্পেডো। একবার মাত্র একটা টর্পেডো ছোঁড়া হয় না—নানা দিক থেকে অনেকগুলি টর্পেডো জাহাজের দিকে ছোঁড়া হয়ে থাকে, যা'তে ক'রে জাহাজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সাক্ষাৎ যমের হাত এড়ানোর উপায় না থাকে।

জাহাজের এত কাছে যেয়ে টর্পেডো ছোঁড়া কম বিপজ্জনক নয়। বিশেষ ক'রে মুহূর্ত্তের জন্যেও যদি বিমানখানাকে স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে হয়। বিমানের চাইতে জাহাজ সব দিকেই বড়—প্রয়োজন, ব্যয়, যা কিছুই না ধরা হোক। তাই জাহাজ ঘায়েল ক'রবার নেশায় টর্পেডো বিমানের চালক যে কোন বিপদ বরণ

নৌযুদ্ধে একখানা শত্রু জাহাজ ঘায়েল হ'য়েছে।

ক'রে নিতে ভয় পায় না। এই বিপদ বরণ ক'রে নেবার মূলে রয়েছে মানুষের সেই মনোবৃত্তি, যা তাকে চিরদিন বলিয়েছে—

জানি আঘাত আছে, জানি বিপদ আছে,
তাই জেনেই ত বক্ষে পরাণ নাচে।

জাহাজে জাহাজে যুদ্ধ

আকাশে বা মাটীতে যুদ্ধ চালান যত কঠিন কাজ, সমুদ্রে যুদ্ধ চালান তার চাইতে অনেক কঠিন। কেননা, যে আক্রমণ ক'রবে আর যাকে আক্রমণ ক'রবে, তারা একদিকে দুটোই যেমন ন'ড়ে বেড়াচ্ছে, অন্যদিকে আক্রমণকারী বা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত নৌ-সৈন্যদলকেও তেমনি জাহাজের মধ্যেকার সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যেই ক'রতে হবে চলাফেরা। তা ছাড়া আর একটা বিষয়ও বিবেচনা ক'রতে হবে; সেটা হ'চ্ছে এই যে, সৈন্য ধ্বংস বা সৈন্যদের নিরাপত্তা এখানে মোটেই মুখ্য প্রশ্ন নয়; এখানে বড় কথা—শত্রুর জাহাজখানাকে ডুবিয়ে দেওয়া, আর নিজের জাহাজকে অক্ষত রাখা, ঠিক যেন অশ্বারোহীকে বাদ দিয়ে অশ্বের উপর নজর দেওয়া। কিন্তু সমুদ্রের বুকে এই হ'ল যুদ্ধের ধারা।

নৌ-বাহিনীর সেনাপতিকে ইংরাজী ভাষায় বলা হয়—অ্যাড্‌মিরাল (Admiral)। একখানা জাহাজের বুকে দাঁড়িয়ে তিনিই বাহিনীর অন্যান্য জাহাজগুলির সাহায্যে করেন যুদ্ধ পরিচালনা। এই অ্যাড্‌মিরালের কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠিন। কারণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য (অন্ততঃ কয়েক কোটি টাকা মূল্যের) কতকগুলি জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। তা ছাড়া একটা যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপরই নিভর করে তাঁর সব কিছু গৌরব অগৌরব। স্থলযুদ্ধে একবার হেরে গেলে সেনাপতি পুনরায় নূতন ভাবে সৈন্য সংস্থানের পর শত্রুর সঙ্গে লডাই ক'রে হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার ক'রতে পারেন—আকাশ-যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়েও পুনরায় নূতন ক'রে শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রতে যোদ্ধা অগ্রসর হ'তে পারে—অবশ্য যদি শত্রুর হাতে বন্দী না হ'য়ে পালিয়ে আসা সম্ভব হয়। কিন্তু জলযুদ্ধে হেরে যেয়ে পুনরায় শত্রুর সঙ্গে বল-পরীক্ষায়

অগ্রসর হওয়ার সুযোগ আর প্রায় কোন সেনাপতিরই ভাগ্যে ঘটে না। আরও একটা কথা এইখানে মনে রাখতে হবে। নৌযুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে—দিনের পর দিন ধ'রে নৌযুদ্ধ চলে না। তাই মুহূর্ত্তের ভুল, সামান্য একটু ত্রুটিই বিচক্ষণ সেনাপতিকেও পরাজয় বরণ ক'রে নিতে বাধ্য করে। ভুল একবার হ'লে তা আর শোধরাবার কোন পথই নৌযুদ্ধে থাকে না। এই জন্যই আমরা ব'লতে পারি, সত্যিকারের নৌযুদ্ধে অ্যাড্‌মির্যালেব কর্ত্তব্য সবচেয়ে গুরুতর।

যুদ্ধের সময় অ্যাড্‌মির্যালকে প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা ক'রতে হয়, তাঁর নিজের পরবর্ত্তী চাল; আর কল্পনা ক'রে নিতে হয় যে, এর পরেই শত্রু ঠিক্ কোন্ ধারায় অগ্রসর হ'তে পারে। দুইটি নৌ-বাহিনী যুদ্ধার্থে অগ্রসর হ'য়ে দাঁড়ায় দশ পনর মাইল দূরে—এত দূরে যেখানে দৃষ্টি চলে না। সেই জন্যই নিজ পক্ষের নানা রকম জাহাজগুলিকেও রাখতে হয় দূরে দূরেই।—এরাও অ্যাড্‌মির্যালের চোখের উপর সব সময় থাকে না। এই জন্যই যুদ্ধের সময় প্রত্যেকখানি জাহাজ প্রতি মুহূর্ত্তে অ্যাড্‌মির্যালের কাছে সংবাদ পাঠায় নিজে কোথায় কি ভাবে আছে, আর শত্রুর অবস্থান কোথায় কত দূরে এবং তাদের চাল-চলন কেমন। এই সব খবর কিন্তু রেডিওযোগে পাঠান হয় না; কেননা তাহ'লে শত্রুপক্ষ সেই বেতার সংবাদ ধ'রে নিজেদের অবস্থান এবং চাল-চলন জেনে ফেলবে। নানা রকমের নিশান উড়িয়ে রং বেরংএর আলোর সাহায্যে এই সব সংবাদ পাঠান হ'য়ে থাকে। এই সব টুকরা খবর একখানা ম্যাপের উপর রং বেরংএর নিশান দিয়ে দেগে দেওয়া হয়; আর তারই উপর লক্ষ্য রেখে অ্যাড্‌মির্যাল করেন আদেশ জারী কোন্ জাহাজ কখন কোথায় যাবে, কি ক'রবে—এই সব। এক একটা নৌ-বাহিনী নানা আকারের ছোট বড় অনেকগুলি জাহাজ নিয়ে গঠিত; তার প্রত্যেকখানা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে এই সব টুকরা খবরের উপর নির্ভর ক'রে যুদ্ধ চালনা করা কত যে কঠিন, সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়।

দূর থেকে শত্রুবাহিনীর সন্ধান পেলেই অ্যাড্‌মির্যাল চেষ্টা করেন—নিজেব বাহিনীকে সাজিয়ে নিতে। বাহিনীর অগ্রবর্ত্তী ক্রুজারগুলি অথবা বিমানগুলি

যেই দূরে শত্রুর সন্ধান পেল, অমনিই জানিয়ে দিল পিছনের মূল বাহিনীকে সে সংবাদ বেতার যোগে। ব্যাস্, এর পরই বেতারের কাজ গেল বন্ধ হ'য়ে—আর সহজে বেতার যন্ত্র ব্যবহার করা হবে না। "শত্রু কাছেই—সাবধান" এই খবর পাবা মাত্রই অ্যাড্মিরাল হুকুম জারি ক'রলেন, "জাহাজ সাজিয়ে ফেল, যুদ্ধ হবে।" বাহিনীতে বড় রণতরী যদি থাকে, তাকে মাঝখানে রেখে সেনাপতি চেষ্টা করেন এমন ভাবে জাহাজ সাজাতে যে, তা'র নিজের প্রত্যেকখানি জাহাজ থেকে বিনা বাধায় শত্রুর উপর কামান ছুঁড়তে পাবা যাবে, অথচ শত্রুর অগ্রবর্ত্তী জাহাজগুলিই মাত্র গুলি ছুঁড়তে পারবে তার দিকে। শত্রুর পিছনের জাহাজগুলি কামান চালাতে নিজেদের জাহাজেই বাধা পাবে। এইভাবে জাহাজ সাজাতে পারলে যুদ্ধ-জয় নিশ্চিত ; কিন্তু কোন সেনাপতিই শত্রুকে এভাবে ব্যূহ সাজাতে দেবেন না—প্রাণপণে বাধা দেবেন এইভাবে, যাতে তিনি দাঁড়াতে না পারেন। এই জন্যই এভাবে তখনই জাহাজ সাজান যায়, যখন শত্রুপক্ষ নিজেদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন সন্ধান না পায়।

ডেষ্ট্রয়ারগুলি রণতরীর চারদিকে ঘুরে ঘুরে দিতে থাকে পাহারা, যাতে ক'রে শত্রুপক্ষ টর্পেডো ছুঁড়ে রণতরীকে ঘায়েল ক'রতে না পারে। তারপর বিপক্ষবাহিনী যখন নিজেদের কামানের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ে এবং যখন সত্যিকারের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন আর ডেষ্ট্রয়ারগুলিকে এইভাবে খাটান হয় না ; তাদের তখন দেওয়া হয় এগিয়ে যেয়ে বা পেছিয়ে থেকে অন্য কাজ করার ভার।

এর পর ছুটলো উভয় পক্ষ থেকে কামান গোলার আদান প্রদান—প্রতি মুহূর্ত্তে জাহাজগুলি আরম্ভ ক'রল ঢেউয়ের উপর নাচতে।

মাটী থেকে শত্রু ব্যূহের উপর কামান দাগা যত সহজ—জাহাজ থেকে যে তত সহজ নয়, এ কথা বোধহয় না ব'ললেও চলে। কারণ, যেখান থেকে কামান ছোঁড়া হবে, সেই জাহাজই প্রতি মুহূর্ত্তে হেলে দুলে গড়িয়ে প'ড়ছে। এই অবস্থার মধ্যে লক্ষ্য স্থির রেখে কামান দাগা অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব ক'রেই আজকাল চালাতে হয় নৌযুদ্ধ। বিশেষ এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করা

হ'য়েছে যে, হেলে দুলে এদিকে ওদিকে ঘোরবার সময় কামানটি যেই একটা বিশেষ জায়গায় আসবে, অমনি ছুটবে তার গুলি। ক্ষেত্র বুঝে এ জায়গাটা এমন ভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয় যে, এখান থেকে গোলা যেযে প'ড়তে পারে লক্ষ্যবস্তুর উপব।

জাহাজে সাধারণতঃ বসান হয় খুব শক্তিশালী কামান, যার পাল্লা হ'চ্ছে কম পক্ষে ২০।২৫ মাইল। পাল্লা এতটা হ'লেও কিন্তু ১০।১৫ মাইলের বেশী দূরে থেকে নৌযুদ্ধ চালান হয না। যুদ্ধের সময শত্রুর সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে দুই পক্ষই ধোঁয়ার জাল বিস্তার ক'রে আকাশ ছেয়ে ফেলে। তাই যা কিছু ক'ববার, সবই ক'রতে হয চোখে না দেখে।

জাহাজগুলিতে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর কামান থাকে—ভারী, মাঝারি আর হাল্কা; এই হাল্কা কামানেব মধ্যেই থাকে বিমান-বিধ্বংসী। ভারী কামান
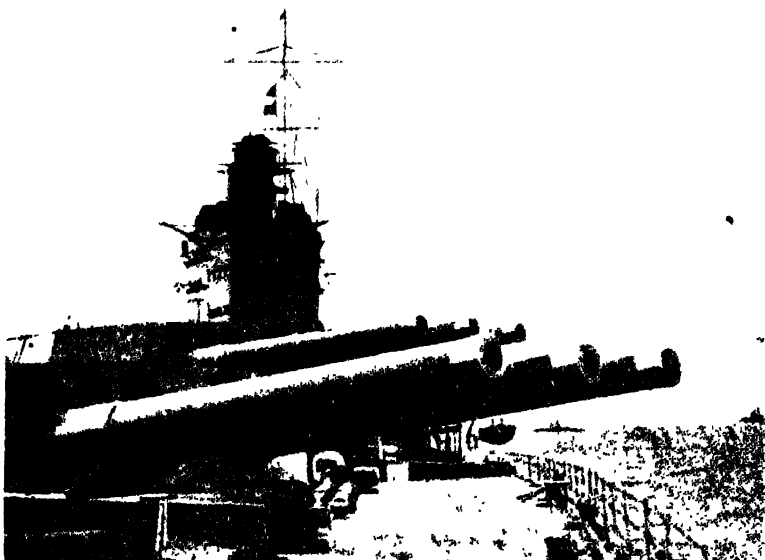
জাহাজেব উপর ভারী কামান শ্রেণী

একমাত্র রণতরী ছাড়া অন্য জাহাজে থাকে না; কিন্তু আর দুই শ্রেণীর কামান থাকে অন্য সব জাহাজেই। এই সব জাহাজী কামানের নল হয় খুব লম্বা। কারণ, নল

যতই লম্বা হবে, তার গোলা ছুটবে তত জোরে। ভারী কামানের গোলাও হয় ভয়ানক ভারী। অনেক সময় এক একটা গোলার ওজন হয় এক টন বা সাতাশ মণেরও বেশী। এগুলি গুদাম থেকে কামানের কাছে আনা, কামানে ভরা—সব কিছুই হয় যন্ত্রের সাহায্যে। এই বিরাট ওজনের গোলা যখন প্রথম ছোটে, তখন যায় ঘণ্টায় প্রায় দু' হাজার মাইলের কাছাকাছি। মাঝারি কামানের গোলা দুই হন্দর পর্য্যন্ত ভারী হয়।

জাহাজ থেকে যখন একটা গোলা ছোটে, তখন সমস্ত জাহাজখানি কেঁপে ওঠে আর এমন তার শব্দ হয় যে, নিকটে যারা থাকে, তারা হ'য়ে যায় বধির। এই জন্যে যে সব গোলন্দাজেরা জাহাজের কামানের কাছে কাজ করে, তারা সব সময় কাণ ঢেকে রাখে। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ শোনবার জন্য প্রত্যেকের কাণে লাগান থাকে টেলিফোন, আর তার চার পাশে থাকে শব্দ-প্রতিরোধক প্যাড। এইভাবে কাণ ঢেকে রেখে কামানের শব্দ অনেক কমিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু গোলা ছুঁড়লে আশে পাশে এতই উত্তাপের স্মৃষ্টি হয় যে, তাতে গোলন্দাজদের একেবারে ঝল্‌সে দেয়। এইজন্য গোলা ছুঁড়বার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কাছাকাছি যে সব সৈন্য থাকে, তাদের সাবধান ক'রে দেওয়া হয়।

সব যখন তৈরী, কামানে গোলা ভরা হ'য়েছে—এখুনি সেটা ছুটবে, এই রকম যখন অবস্থা, তখন একটা যন্ত্রের সাহায্যে কামানের মধ্যে আপনা থেকেই একটা শব্দ হয় এবং সৈন্যদের সাবধান হবার স্থবিধা দিযে কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই গোলাটা যায় ছুটে।

জলযুদ্ধ কঠিন, জলযুদ্ধ ব্যয়বহুল। কিন্তু তবুও সত্যিকারের যুদ্ধে প্রত্যেক জাতিকেই চেষ্টা ক'রতে হয় জলের বুকে প্রাধান্য লাভ ক'রতে। এ চেষ্টায় সফল হ'লে হয়ত বা চূড়ান্ত জয় সম্ভব হ'তে পারে; কিন্তু এতে পরাভূত হ'লে চরম জয় সম্ভব হয় না কোন দিনই।

স্থল বাহিনী

আকাশ বা জল বাহিনী দিয়ে শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব হ'লেও জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা এদের দিয়ে হয় না। শত্রুর মাটীতে পা দিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে তাকে হারিয়ে না দিতে পারলে যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। এই জন্যই প্রত্যেক দেশের পক্ষেই প্রয়োজন সুগঠিত ও শক্তিশালী স্থল বাহিনীর।

স্থল বাহিনীর সৈন্যগণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক। প্রথমতঃ গোলন্দাজ সৈন্যেরা মুহুর্মুহু কামান ছুঁড়ে শত্রু সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলে আর অশ্বারোহী সৈন্যেরা এগিয়ে যেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই সব বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত শত্রু সৈন্যের উপর। পদাতিক সৈন্যেরাও অশ্বারোহী সৈন্যের মতই শত্রুকে সামনাসামনি আক্রমণ ক'রে, হাতাহাতি যুদ্ধ ক'রে এবং বেয়নেট চালিয়ে, হাত বোমা আর বন্দুক ছুঁড়ে শত্রুর ঘাঁটি দখল করে। শত্রুর ঘাঁটি দখল ক'রতে পারলেই কিন্তু স্থল সৈন্যের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল না; কেননা, আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য ক'রতে না পেরে শত্রু সৈন্যেরা আজ যে ঘাঁটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় আবার দুই দিন পরেই যে সে ঘাঁটি পুনরায় দখল ক'রতে তারা চেষ্টা ক'রবে না

তার ত কোনই নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ প্রচণ্ড বিক্রম দেখিয়ে আজ যে ঘাঁটি শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হ'ল জীবন মরণ তুচ্ছ ক'রে সে ঘাঁটি রক্ষা ক'রতেই হবে এই হ'ল স্থল বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য।

গোলন্দাজ সৈন্য মেশিন গান চালনায় রত

এক কথায় বলা যেতে পারে যে গোলন্দাজ সৈন্যেরা কামানের গোলায় শত্রু সৈন্যকে দেয় ছিন্নভিন্ন ক'রে, আর অশ্বারোহী দল পড়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনে পদাতিক দল। বারিধারার ন্যায় গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু অশ্বারোহী দল খুব কমই তাদের আক্রমণ চালায়। যখন শত্রু হয় পলায়নপর তখন ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী দল জয় সুগম করে। পদাতিক দলও আক্রমণের সময় অশ্বারোহী দলের মতই আক্রমণ চালায় বটে কিন্তু ঘাঁটি রক্ষাব দায়িত্ব অনেকটা নির্ভর করে এই পদাতিক দলের উপরই। অবশ্য এদিকে গোলন্দাজদেরও দায়িত্ব কিছু কম নয়।

আক্রমণের সময় অশ্বারোহী ও পদাতিক দল কোন্‌টা বেশী কার্য্যকরী হবে তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। খাল বিল নদী নালার দেশে ক্রমাগত এগিয়ে

যেতে হ'লে পদাতিকদের চেয়ে অশ্বারোহীরা বেশী কর্ম্মক্ষম হবে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানে

বন্ধুর পথে অশ্বারোহী দল

এরা মোটেই চ'লতে পারে না। এ রকম জায়গায় কিন্তু পদাতিক সৈন্যদলই ঢের বেশী কাজ ক'রতে পারে।

যান্ত্রিক বাহিনী

আজকাল প্রায় সকল দেশেই বিস্তর বড় বড় রাস্তা তৈরী হ'য়েছে ব'লে, স্থান থেকে স্থানান্তরে সৈন্য চলাচলের অনেকটা সুবিধা হ'য়েছে। এটা বর্ত্তমান যন্ত্র যুগের মস্ত বড় অবদান। এই সব বড় বড় রাস্তা তৈরী হওয়ায় অশ্বারোহী দলের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানিই ক'মে গেছে এবং তার পরিবর্ত্তে ক্ষিপ্রতর যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে ঢের বেশী কাজ পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে গতির ক্ষিপ্রতার উপর জয় পরাজয় অনেকটাই নির্ভর করে, তাই আজকের দিনে ঘোড়ার চাইতেও ক্ষিপ্রগামী যান যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। ট্যাঙ্ক (Tank) ও সাঁজোয়া গাড়ী (Armoured Car) আজকাল সৈন্যদলে ঘোড়ার কাজ ক'রছে একথা ব'ললে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। এগুলো একদিকে যেমন ক্ষিপ্রগামী অন্যদিকে

তেমনিই দুর্ভেদ্যও বটে। অশ্বারোহীর পরিবর্ত্তে এই সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাঙ্ক ব্যবহারের প্রথাকে বলা হয় যান্ত্রিক বাহিনী (Mechanised army)। এই যান্ত্রিক বাহিনীর উপযোগিতা পুরাপুরি বোঝা যায় পোল্যাণ্ড ও ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধে, কেননা পোল্ ও মিত্রশক্তির সৈন্যেরা প্রাণপণে বাধা দিয়েও জার্ম্মাণীর যান্ত্রিক বাহিনীর সম্মুখে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে নি। যান্ত্রিক বাহিনীর প্রবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান কালের রণনীতিতে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে একথা বলাই বাহুল্য। একটা কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, যে সেনাপতি যত অল্প সময়ে এবং শত্রুর সন্দেহ জাগাবার যত আগে প্রয়োজনীয় জায়গাগুলিতে সৈন্য সমাবেশ ক'রতে পারবেন, জয়লাভ তাঁর পক্ষেই হবে তত সহজসাধ্য। যান্ত্রিক বাহিনী এদিকে কতটা সুবিধে ক'রে দিয়েছে একটু চিন্তা ক'রলেই তা সহজে বোঝা যাবে। আগেকার দিনে একটা বাহিনী এক দিনে বড় জোর কুড়ি মাইল চ'লতে পারত এবং পরদিন সমস্ত সৈন্যদলকে পরিপূর্ণ বিশ্রামের অবসর না দিলে তাদের কাজ করবার কোন ক্ষমতাই থাকত না। কিন্তু আজকার দিনে যে কোন যান্ত্রিক বাহিনী অনায়াসে দৈনিক ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল যেতে এবং বিশ্রাম না ক'রেই শত্রুর সম্মুখীন হ'তে পারে। কেননা দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রলেও এমন কিছু ক্লান্ত তারা হয় না। এই সব সুবিধার দিকে লক্ষ্য ক'রে এখন সব দেশই, কি গোলন্দাজ, কি অশ্বারোহী, কি পদাতিক সব শ্রেণীর সৈন্যকেই যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত ক'রতে লেগে গেছে। এর ফলে বেশ দেখা যাচ্ছে যে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে এক এক বাহিনীতে যতটি ক'রে সৈন্য থাকত আজকার বাহিনীগুলিতে সৈন্য থাকে তার চাইতে অনেক কম, কিন্তু যন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়ায় শত্রু-নিধনে প্রত্যেক বাহিনীরই তৎপরতা গেছে অনেক বেড়ে।

শুধু যে অশ্বারোহী সৈন্যের বদলেই ট্যাঙ্ক বাহিনী ও সাঁজোয়া গাড়ী ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে তা নয়—পদাতিক সৈন্যেরাও আর সব সময় পায়ে হেঁটে যায় না। পদাতিক সৈন্যদলকে স্থানান্তরিত করবার জন্য আজকার দিনে ব্যবহার করা হয় মটর লরী, মটর বাইক ইত্যাদি। যদি চলাচলের ভাল রাস্তা না পাওয়া যায় তবে ট্যাঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়ে ট্যাঙ্কযোগেই পদাতিক সৈন্যদলকে স্থানান্তরিত

করা হয়। যে সৈন্যকে পঁচিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে আসতে হ'য়েছে তার চাইতে যে সৈন্য একশ' মাইল গাড়ীতে এসেছে সে থাকে অনেক বেশী কার্য্যক্ষম। এদিক দিয়ে আধুনিক পদাতিক দল আগেকার পদাতিক দলের চেয়ে বেশী কাজ ক'রতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এই পদাতিকদলই গোটা সৈন্যবাহিনীর মেরুদণ্ড। শত্রু যখন যুদ্ধে হেরে গিয়ে কোন স্থান থেকে পালিয়ে গেছে তখন পদাতিক সৈন্যকেই সে স্থান দখলে রাখতে হবে, না হ'লে অন্যান্য বাহিনীর কাজ হ'য়ে যাবে একদম ব্যর্থ। অধিকন্তু যারা পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করে তাদের পক্ষে স্থান ও কালোপযোগী ব্যবস্থা করার অনেক সুবিধা হয়। দরকার হ'ল তারা গাছের ওপর উঠে শত্রুর গতিবিধি

পদাতিক দল এগিয়ে চ'লেছে

দেখে নিল, প্রয়োজন হ'ল জলার মধ্যে নেমে পড়ল, নয়ত বা শস্যক্ষেত্রে বুকে ভর রেখে শুয়ে প'ড়ে ধাবমান শত্রুকে ফাঁকি দিল—যন্ত্র এগুলো ক'রতে পারে না। ঠিক সময়মত লুকিয়ে পড়া, বাঁধা পথ ছাড়া ঘোরা পথে যাওয়া—যন্ত্র তা পারে না।

পদাতিক দল খাল ডিঙ্গিয়ে যাবার জন্য প্রাণ দিচ্ছে

যন্ত্রের শক্তি আছে মানুষের চেয়ে বেশী কিন্তু বুদ্ধি ত নেই এক ফোঁটাও। মানুষের শক্তি কম কিন্তু বুদ্ধি আছে অনেক বেশী, তাই শুধু যন্ত্রের উপর নির্ভর ক'রে যুদ্ধ চলে না। এক কথায় আমাদের এখন পদাতিক সম্বন্ধে এতদিনের ধারণা বদলে দেওয়ার দরকার হ'য়ে প'ড়েছে কেননা আগেকার দিনে পদাতিক ব'ললে বুঝতে হ'ত—যারা পায়ে হেঁটে চলে, আজকের দিনে আমরা পদাতিক ব'ললে বুঝি যারা পায়ের উপর ভর রেখে যুদ্ধ করে—তা সে যাতে কেনই না তারা যাতায়াত করুক।

ব্যূহ রচনা

যুদ্ধের জন্য তৈরী হ'য়ে সৈন্যেরা যখন খোলা মাঠে ছাউনী গাড়ে তখন কি ভাবে ব্যূহ সাজায়? এই ব্যূহ-রচনা-প্রণালীর উপর চিরকালই জয় পরাজয় অনেকখানি নির্ভর করে। এই ব্যূহ রচনার সমস্ত কৃতিত্ব হ'চ্ছে সেনাপতির। কোন স্থানে সৈন্য সংস্থান করা হবে সেটা ঠিক করবার আগে সেনাপতি প্রথমে দেখেন দরকার মত পিছু হ'টবার সুযোগ আছে কি না, কারণ যুদ্ধের সময় এই পশ্চাদপসরণ সত্যিই মূল্যবান। অনেক সময় ক্রমশঃ পিছু হ'টে সেনাপতি শত্রুকে একেবারে ফাঁদের মধ্যে নিয়ে এসে ফেলেন এবং নিজে নিরাপদ স্থানে থেকে শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদের একেবারে শেষ ক'রে দেন, তাই পলায়নপর শত্রু বাহিনীকে অনুসরণ করবার সময় প্রত্যেক সেনাপতি অতিশয় সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হ'য়ে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে যখন শত্রু কোন জায়গায় ছাউনী ফেলে দাঁড়ায় অথবা সম্মুখে এগিয়ে চলে তখন তাদের উপর যতটা তীব্রতার সঙ্গে আক্রমণ চালান হয় তার চাইতে ঢের বেশী তীব্র আক্রমণ চালান হয় যখন শত্রু সৈন্য পিছু হটতে থাকে। পিছু হটবার সময় সাধারণতঃ সৈন্যদের মানসিক বল অনেক ক'মে যায় ব'লে সামান্য আক্রমণেই তারা অনেকটা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে—আর এই আক্রমণ যদি প্রবল হয় তবেত' সৈন্যদের ঘাঁটি থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সত্য সত্যই এক ভীষণ কঠিন কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়। ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গর্ট (Lord Gort) যে ভাবে তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ইংরাজ সৈন্য অক্ষত দেহে রণক্ষেত্র হ'তে সরিয়ে নিয়ে আসেন তা সত্য সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। চারিদিক থেকে শত্রু আসছে এগিয়ে, মাথার উপর থেকে শত্রু

পিছু হটবার সময়ে যে রকম ব্যূহ
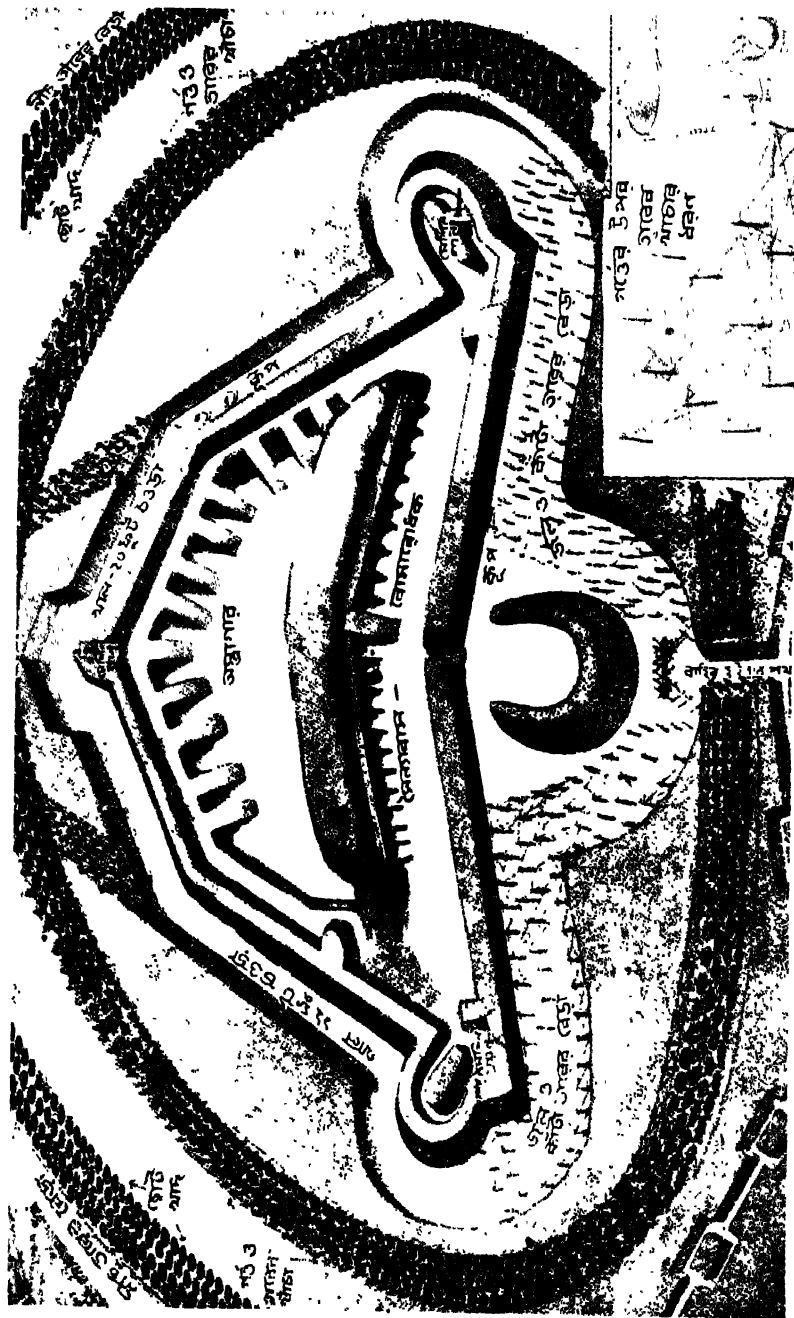
বিমান ক'রছে বোমা বৃষ্টি—তার মধ্যে অবসাদগ্রস্ত পরিশ্রান্ত বিরাট বাহিনীকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালিয়ে নিয়ে আসা কি সহজ কাজ ?

এর পর সেনাপতি লক্ষ্য করেন শত্রুসৈন্যের অবস্থান। তারা যে অবস্থায় র'য়েছে সে অবস্থায় সহজেই যদি তারা কোন বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারে, তবে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আক্রান্ত বাহিনী বিপদাপন্ন হ'য়ে প'ড়বে। শত্রু যদি কোন রকমে একবার ঘিরে ফেলতে পারে তবে আর নিস্তার নাই—একেবারে যাঁতিকলে ফেলে শত্রুদলকে চেপে মারবে। এই জন্য বিচক্ষণ সেনাপতি কখনই এমন জায়গায় ছাউনী ফেলেন না যেখানে শত্রুসৈন্য ভাল পথ ঘাটের সুযোগ নিয়ে তার বাহিনীকে বেষ্টন ক'রে ফেলতে পারে।

ব্যূহ রচনার ধারা অনেক রকম হ'তে পারে। এর কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। তবে যেখানে পশ্চাদপসরণ ক'রতে হয়, সেখানে যে ধরণের ব্যূহ রচিত হয় আক্রমণ করবার বেলা ব্যূহ রচনা তার চাইতে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের—কারণ পিছিয়ে আসবার সময় কোনস্থানে বেশীক্ষণের জন্য ছাউনী ফেলে ব'সে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয়—তাই মাত্র কয়েক ঘণ্টার নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে ক'রতে হয় ব্যূহ রচনা।

আক্রমণ করবার সময় যে ধরণের ব্যূহ রচিত হয় তার একটা নমুনা এখানে দেওয়া হয়ত অসঙ্গত হবে না। এক্ষেত্রে শত্রু যাতে হঠাৎ এসে ছাউনীর ভিতর ঢুকতে না পারে তার জন্য মাঠের চারিদিক ঘিরে দেওয়া হয় কাঁটা তারের বেড়া। তারপর থাকে আঁকা বাঁকা পরিখার মধ্যে লৌহ শিরস্ত্রাণ প'রে পদাতিক সৈন্যদল। সেখান থেকে রাইফেল ছুঁড়ে তারা অগ্রগামী শত্রুসৈন্যদলকে দেয় প্রবল বাধা। এই সংশ্রবে পরিখা সম্বন্ধে দু'একটি কথা ব'লে রাখা ভাল। অনেক আগে পরিখার ব্যবহার লোকের জানা ছিল না। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধের সময় মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত বুয়র সৈন্য গর্ত্তে লুকিয়ে দেখিয়েছিল কি ক'রে সামান্য শক্তি নিয়েও প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুসৈন্যকে বাধা দেওয়া যায়। সত্যি কথা ব'লতে গেলে এই বুয়র যুদ্ধের পর থেকেই পরিখায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার রীতি প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে।

নগর রক্ষা ক'রতে হ'লে নগরের উপকণ্ঠে সব সময় পরিখা খনন করা সম্ভব হয় না ব'লে আজকাল সহরের প্রান্ত দেশে ও বড বড় রাস্তার উপরে সারি সারি

পরিখায় সৈন্যদল

বালির বস্তা সাজিয়ে রেখে তার আড়ালে দাঁড়িয়ে পদাতিক সৈন্যদল যুদ্ধ চালায়। পরীক্ষা দ্বারা এটা আজ বেশ বোঝা গেছে যে বড় বড় দালান কোঠা ভেঙ্গে ফেলতে যে সব বোমা বা গোলাগুলি কার্য্যকরী হয়, মাটী বা বালির বস্তায় বাধা পেলে তাদের ধ্বংস করবার ক্ষমতা একদম্ নষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্যই এখন বাড়ী ঘরের দরজা জানলা অথবা প্রবেশদ্বারে বালির বস্তা সাজিয়ে রেখে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা হয়।

পরিখার সামনেও দরকার মত এই জন্যই বালির বস্তা সাজিয়ে দেওয়া হয়। এই সব পরিখা কিন্তু কোন সময়ই সোজা লাইনে করা হয় না, সব সময়ই এগুলি

সহরের উপকণ্ঠে বালির বস্তার আড়ালে দাঁড়িয়ে নগর রক্ষার আয়োজন

যায় এঁকে বেঁকে, কারণ উপর থেকে বিমান যদি পরিখার মধ্যে বোমা ফেলে তবে পরিখার যেটুকু সোজা তার মধ্যেই সৈন্যদের প্রাণহানি হয় এবং যেখানে পরিখার গতি ঘুরে যায় সেখানেই মাটীতে বাধা পেয়ে বিস্ফোরণ শেষ হয় এবং অন্য সারের সৈন্যেরা থাকে অক্ষত।

পরিখার পিছনে বিভিন্ন দিকে সাজানো থাকে গোলন্দাজ বাহিনী ভারী কামান নিয়ে। আশে পাশের জায়গাগুলিতে সাজানো থাকে ট্যাঙ্ক বাহিনী, সৈন্যশ্রেণীর অগ্রগতির সময় এই সব ট্যাঙ্কগুলিকে নিয়ে আসা হয় একেবারে সম্মুখে এবং এরাই চলে আগে আগে পথ কেটে। ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান, রাইফেল, বিমান-বিধ্বংসী কামান প্রভৃতিও এমন ভাবে সাজানো হয় যে, যে কোন দিক থেকেই শত্রু আক্রমণ করুক না কেন এগুলিকে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায় শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত ক'রতে।

আক্রমণের উদ্দেশ্যে সজ্জিত ব্যূহ

এর পরই থাকে রসদ, অগ্রবর্ত্তী শ্রেণীর সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য অন্যান্য সৈন্য, মোটর লরী, খাদ্য ভাণ্ডার, সাময়িক রাস্তা তৈরী করবার উপযুক্ত উপকরণ, ইঞ্জিনিয়ার, হাসপাতাল, স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা—আর এই সকল স্থানান্তরিত ক'রবার মত যান বাহন। তাদের সঙ্গে পুরোভাগে এবং পাশে থাকে পাহারাদার সৈন্য, বিমানশ্রেণী, সন্ধানী আলো, বিমান-বিধ্বংসী কামান, শব্দগ্রাহী যন্ত্র ইত্যাদি। বিরাট প্রান্তরে সৈন্য চলাচলের জন্য রেল লাইন পাতা হয়, টেলিফোন বসান হয়, কেননা চলাচলের ও সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা ভাল না থাকলে কোন মতেই কাজ চ'লতে পারে না। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশ কিছু মুখে দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা মুখের কথা কে সেখানে শুনতে পাবে? কামান বন্দুকের ও গোলাগুলি ফাটার শব্দে, যুদ্ধক্ষেত্রে এমন বিরাট শব্দের সৃষ্টি হয় যে মানুষ অনেক সময় যায় একেবারে বধির হ'য়ে। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে দেখা গেছে অনেক গোলন্দাজ তাদের শ্রবণ-শক্তি চিরতরে হারিয়েছে।

সেনাপতি

এই যে বিপুল সম্ভার এ কার ইঙ্গিতে চলে? এই মহাযজ্ঞের নায়ক কে এবং তিনি থাকেন কোথায়? তিনি হচ্ছেন সেনাপতি আর থাকেন অনেক পিছনে এবং দূর থেকে করেন সমস্ত বাহিনীটিকে নিয়ন্ত্রণ। তাঁর ঘরে র'য়েছে যুদ্ধক্ষেত্রের একটা মানচিত্র তাতে পরিষ্কার ভাবে আঁকান আছে আপন বাহিনীর বিভিন্ন অংশের অবস্থান। সহকারী যারা আছেন তারা কেউ বা ব'সে আছেন নানা রকম রংএর কতকগুলি ছোট ছোট নিশান হাতে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন রকম অবস্থান্তর ঘটবামাত্র টেলিফোন বা রেডিও যোগে সে সংবাদ আসছে সেনাপতির ঘরে—একজন সহকারী সেই সংবাদ পাবামাত্রই তা জানিয়ে দিচ্ছেন যে কর্ম্মচারীটি নিশান হাতে ব'সে আছেন তাকে, তিনি তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত রংএর একটা নিশান মানচিত্রের যোগ্য স্থানে পুতে দেন। সেখানার দিকে তাকালেই সেনাপতি বুঝতে পারেন দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় কি আছে, ঠিক এই মুহূর্ত্তে কোথায় কি ঘটছে, কোথায় কোন্ উপকরণ সরাবার দরকার, কোথায় কোন্ সৈন্যশ্রেণীকে চালনা ক'রতে হবে। শুধু যে স্বপক্ষের মানচিত্রই র'য়েছে সেনাপতির ঘরে তা নয়;

সেনাপতি অনেক মাইল পিছনে থেকে বাহিনী পরিচালনা করেন

ঘরের দেওয়ালে র'য়েছে শত্রুপক্ষেরও বিশিষ্ট স্থানের মানচিত্র, বিমান থেকে তোলা শত্রুর আয়োজন ও অবস্থানের নানা রকম নিখুঁত ফটো। এই সব ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে, সব কিছু ধীরভাবে চিন্তা ক'রে সমস্ত দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সেনাপতি প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর আদেশ জানাচ্ছেন যুদ্ধক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের এবং তাঁরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে যাচ্ছেন যন্ত্রের মত—কোথায়ও এতটুকু বিলম্ব নাই—এতটুকু ইতস্ততঃ নাই। এমনি হ'চ্ছে সৈন্যদলের সামরিক সংহতি।

যোদ্ধা আর অযোদ্ধা

যুদ্ধক্ষেত্রে যারা উপস্থিত থাকে তারা সবাই কিছু যুদ্ধ করে না। প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক বাহিনীকে দু'টি মূল বিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যারা কামান বন্দুক ঘাড়ে ক'রে শত্রুর দিকে এগিয়ে যায় বা পরিখার মধ্যে বন্দুক বাগিয়ে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে, আর দ্বিতীয় হ'চ্ছে যারা সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ করে না—কিন্তু যুদ্ধের সময় সৈন্যদলকে নানাভাবে সাহায্য করে। প্রথম শ্রেণীকে বলা যেতে পারে যোদ্ধা (combatants) আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে বলা যায় অযোদ্ধা (noncombatants)। যারা হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে তাদের কাজ আমরা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু অযোদ্ধারা বাহিনীতে থেকে কি করে এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উঠ্‌তে পারে। এই অযোদ্ধাদের মধ্যে থাকে অনেক রকমের লোক। তাঁরা কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা মটর ড্রাইভার—কেউ বা ডাক্তার, কেউ বা পাচক এমনি কত কি!

ইঞ্জিনিয়ার কোর

এই সব অযোদ্ধাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ ক'রতে হয় ইঞ্জিনিয়ার বা স্যাপার দের (Sapper) কথা। সৈন্য যখন বনবাদাড় ভেঙ্গে, নদী পেরিয়ে, বেড়া ডিঙ্গিয়ে সম্মুখ দিকে চ'লেছে এগিয়ে তখন বাহিনীর পুরোভাগে থেকে এই সব স্যাপারেরা বাহিনীর যাত্রাপথ পরিষ্কার ক'রতে ক'রতে চলেছেন, বিপক্ষ হয়ত পালাবার সময় পথে দিয়ে গিয়েছে একটা কাঁটা তারের বেড়া, নিজেদের বাহিনী সেখানে এসে পৌছুবার আগেই স্যাপাররা এসে সেটা ভেঙ্গে দিলেন কিম্বা পথের মধ্যে গাছ কেটে ফেলে রেখে শত্রু ক'রে রেখেছে বাধার সৃষ্টি, স্যাপাররা

আগে থেকে এসে গাছ সরিয়ে ফেলে রাস্তা রাখলেন পরিষ্কার ক'রে। হয়তঃ সৈন্যেরা এগিয়ে যাচ্ছে, পথের মাঝে পড়ল নদী, স্যাপাররা তখনই কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ'ড়ে তুললেন একটা সেতু এবং তার সাহায্যে সৈন্যেরা অতি সহজে নদী পার হ'য়ে গেল। যখন কোন একটা বাহিনী পিছু
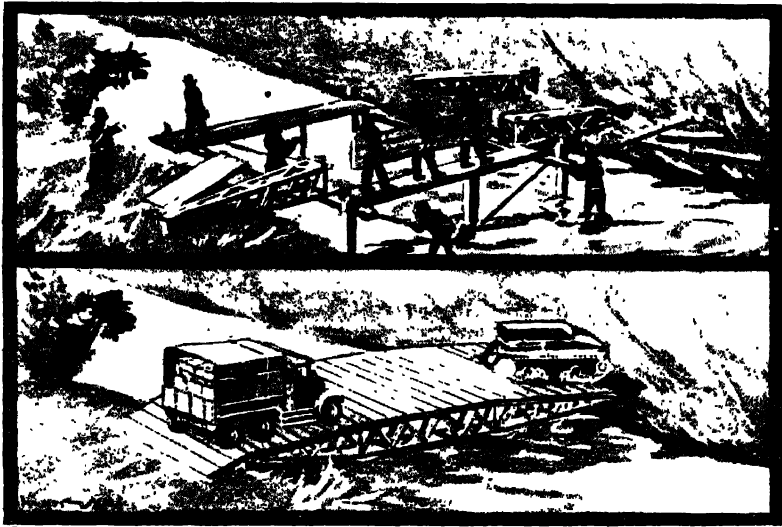
দু'ঘণ্টায় সেতু গ'ড়ে তোলা
উপরে—বেলা ১টায় সেতু তৈরীর কাজ সুরু হ'য়েছে
নীচে —বেলা ৩টায় তৈরী সেতুর উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক ও লরী পার হ'চ্ছে

হট্‌ছে তখন এই সব ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ যায় আরও বেড়ে। কারণ সৈন্য চলাচলের পথ ত এদের পরিষ্কার রাখতেই হয়, তা ছাড়াও যে পথে নিজের দলের সৈন্য এগিয়ে যাচ্ছে পিছন থেকে সেই পথ ভেঙ্গে, তাতে নানা বাধার সৃষ্টি ক'রে রেখে যেতে হয়, কেননা তা না হ'লে ধাবমান শত্রু তৈরী রাস্তায় অতি সহজে এসে পলায়মান বাহিনীকে ধ'রে ফেলতে পারে। এতে শত্রুকে শেষ পর্য্যন্ত আটকানো যায় না সত্য কিন্তু তার গতিবেগ অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায় তাতে কোন সন্দেহ নাই। এইভাবে বাধা সৃষ্টি করবার জন্য স্যাপাররা সারি সারি কংক্রীটের থাম গেঁথে যান—নদীর সেতু, যে সেতুর উপর দিয়ে এইমাত্র নিজের দলের শেষ

সৈন্যটি পার হ'য়ে গেল, তাকে—উড়িয়ে দিলেন। গাছের পর গাছ কেটে পথের উপর ফেলে রেখে রাস্তা বন্ধ ক'রে রাখেন এই স্যাপাররাই। এমনিতরো অনেক কাজ এই স্যাপারদের ক'রতে হয়। এ'রা বন্দুক ঘাড়ে ক'রে কাজ না ক'রলেও প্রতি মুহূর্ত্তেই তাদের জীবন বিপন্ন হ'তে পারে তা সে তাঁরা দলের পুরোভাগে অথবা শেষভাগে যেখানেই থাকুন না কেন!

সৈন্যদলের চলাচলের সময়ই যে স্যাপারদের উপর কাজের চাপ পড়ে ও সৈন্যরা যখন ছাউনী গেড়ে বসে তখন যে এরা বিশ্রামের অবকাশ পায় তা কিন্তু নয়। সত্যি কথা ব'লতে গেলে তখনও তাদের কিছু কাজ কমে না। কেননা, সৈন্যদের জন্য পরিখা তৈরী করা, তার তদ্বির করা এ সবের দায়িত্বও থাকে এই সব স্যাপারদের উপর। পরিখা তৈরী ক'রবার অনেক রকম প্রথা আছে—শুধু খানিকটা মাটী কেটে নিলেই কিছু পরিখা হ'তে পারে না। কেননা, জল বৃষ্টিতে হয়ত পরিখার মধ্যে জল দাঁড়িয়ে যাবে এক বুক, আর সে রকম অবস্থায় যদি দিনের পর দিন কোন পদাতিক সৈন্যকে ঐ জলে দাঁড়িয়ে কাজ ক'রতে হয় তবে সৈন্যদের মধ্যে প'ড়বে অসুখ ছড়িয়ে এবং তার ফলে সৈন্যদলের কাজ ক'রবার ক্ষমতাই থাকবে না। সেই জন্যই আজকার দিনে পরিখার মধ্যে বেশ ভাল রকম নর্দ্দমার বন্দোবস্ত করা হয়। তা ছাড়া যদি জল না দাড়িয়ে পরিখার মাটী ভিজে খুব নরম হ'য়ে পড়ে তবুও সৈন্যরা সেখানে দাড়িয়ে শত্রুর উপর তাক্ মাফিক বন্দুক বা হাত বোমা ছুঁড়তে পারে না। এই সব বিষয় বিবেচনা ক'রে আজকাল পরিখা কংক্রীট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং যদি প্রয়োজন দেখা যায় তবে ক্ষেত্র-বিশেষে এই সব পরিখার উপর কংক্রীটেরই বোমা প্রতিরোধক আচ্ছাদন দিয়ে দেওয়া হয় যাতে ক'রে রোদ-বৃষ্টির জন্য সৈন্যবাহিনীর কোন অসুবিধায় না প'ড়তে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই সব বৃহদাকার পরিখা নির্ম্মাণের জন্য এবং সেগুলি কার্য্যকালে ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্যও স্যাপারদের বিশেষ দরকার হয়।

আর্ম্মি সার্ভিস কোর

অযোদ্ধা সৈন্যদলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট বিভাগ আর্ম্মি সার্ভিস কোর (Army Service Corps)। এদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সৈন্যদলের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র

সরবরাহ। সাধারণতঃ দুই দিনের উপযুক্ত গোলাবারুদ আর আহার্য্য ও পানীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মজুত থাকে। সুতরাং প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে রসদ ও গোলাবারুদ যোগানোর ব্যবস্থা না ক'রতে পারলে কোন বাহিনীই কার্য্যক্ষম থাক্‌তে পারে না। যদি হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিপদ ঘ'টে সরবরাহ বন্ধ হয়, তবে খুব বেশী হ'লেও মাত্র ৪৮ ঘণ্টা একটা বাহিনী কাজ ক'রতে পারে; যদি তার মধ্যেও আর্ম্মি সার্ভিস কোরের সঙ্গে সংযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে বিরাট বাহিনী অকর্ম্মণ্য ত হয়ে পড়বেই—চাই কি অনাহারে ম'রতেও তাদের প্রস্তুত হ'তে হবে।

শত্রুপক্ষও এই জন্যই সব সময় চেষ্টা করে যাতে এই আর্ম্মি সার্ভিস কোরের কাজে বাধা দেওয়া যায়। তারা এদের কাজে একটা বিভ্রাট বাধিয়ে দিয়ে শত্রুর বিরাট বাহিনীকে যাতে অতি স্বাভাবিকভাবে পঙ্গু ক'রে দেওয়া যায় তার জন্য এদের উপরই চালায় অতি প্রচণ্ড আক্রমণ।

আর্ম্মি মেডিক্যাল কোর

এর পরই উল্লেখ ক'রতে হয় আর্ম্মি মেডিক্যাল কোরের (Army Medical Corps)। এদের কাজ আহত ও অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা। আহত সৈন্যকে অ্যাম্বুল্যান্স যোগে শিবিরের মধ্যেকার হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গেই থাকে অ্যাম্বুল্যান্স কোর (Ambulance Corps)। এদের কাজ রণক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে আহতদের সন্ধান করা এবং তাদের নিয়ে এসে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। তারপর মেডিক্যাল কোরের লোকেরা গ্রহণ করে এই সব হতভাগ্য আহতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার। হাসপাতাল শিবির থাকে বাহিনীর একেবারে শেষের অংশে যেখানে কামান বন্দুকের শব্দ ও গোলমাল অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স কোর থাকে সমস্ত বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে। আহত রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল যান সাহায্যে সম্ভবমত নিকটস্থ সহরের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। যে সমস্ত যানবাহনে এই শ্রেণীর আহত সৈন্যদের স্থানান্তরে পাঠান হয় সেগুলি

হয় (+) ক্রুস চিহ্নিত। আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে শত্রুপক্ষের এই সব গাড়ীর উপর কোন আক্রমণ চালান নিষেধ, কিন্তু মানুষের বর্ব্বরতা সময় সময় সীমা ছাড়িয়ে যায় ব'লে এই সব অ্যাম্বুল্যান্স্ কারের উপরও আক্রমণ হ'যে থাকে।

অ্যাম্বুলান্স কোরে লোকেরা আহত সৈনিককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহন ক'রে আনছে

রণক্ষেত্রে আহত সৈন্যের চিকিৎসার জন্য যতদূর সম্ভব সুন্দর ব্যবস্থা রাখা হয়, এবং এই সব আহতের সংখ্যা রোজই অনেক বেশী হ'যে থাকে। কিন্তু হাসপাতাল শিবিরে অসুস্থ সৈন্যের চিকিৎসারও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থা রাখতে হয়, কেননা হয়ত একজন সৈন্যের কোন একটা বিশেষ রোগ উপেক্ষা ক'রলে, অথবা তার চিকিৎসায়

বিলম্ব ক'রলে, সমস্ত সৈন্যদলের সে ব্যাধি সংক্রামক হ'য়ে দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে বাহিনীটি হ'য়ে যেতে পারে একেবারে পঙ্গু। এইজন্যই সৈন্যদের সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হ'য়ে থাকে এবং এই কাজের দায়িত্ব থাকে মেডিক্যাল কোরের উপর। নার্স হিসাবে অনেক মেয়ে এই বিভাগে কাজ করেন।

ভেটারিনারী কোর

প্রত্যেক বাহিনীতেই যথেষ্ট সংখ্যক জীবজন্তু থাকে—এবং এক হিসাবে মানুষের মত তারাও বাহিনীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ। অশ্বারোহীদের জন্য থাকে ঘোড়া, সংবাদ আদান প্রদানের জন্য থাকে পায়রা, তা ছাড়া থাকে প্রহরী ও গুপ্তচরের এদের কাজের জন্য কুকুর। এ সবই যুদ্ধের কাজের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং আবশ্যক মত এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আছে 'ভেটারিনারী কোর' (Vaterinary Corps)। এঁদের সৈন্যদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবজন্তুর স্বাস্থ্যের প্রতি ত' দৃষ্টি রাখতে হয়ই, তা ছাড়াও স্থানীয় নাগরিকগণের গৃহপালিত পশুপক্ষীরও চিকিৎসা এই সব পশু চিকিৎসকগণের ক'রতে হয়। তা না হ'লে গৃহপালিত স্থানীয় পশুপক্ষীর ব্যাধি অনেক সময় বাহিনীতে রক্ষিত পশুপক্ষীর মধ্যে সংক্রামিত হ'য়ে ঘোর বিপদের কারণ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে।

অন্যান্য লোক

এ ছাড়া আরও অনেক কাজের জন্যই অনেক রকমের লোক প্রত্যেক বাহিনীর সঙ্গে থাকে—কেউ বা টেলিফোন অপারেটার, কেউ বা মটরচালক, কেউ হয়ত বেতার যন্ত্র চালনা করেন, কেউ করেন ধোপার কাজ, কারও কাজ হ'চ্ছে পাক করা, কেউ রয়েছেন মুচীর কাজে, কেউ রয়েছেন পশুপক্ষীর তদ্বির ক'রতে—এমনি আরও আরও রয়েছেন অনেক অনেক কাজে, এ ছাড়া প্রত্যেক বাহিনীর সঙ্গে থাকেন ব্যাণ্ড্-বাদক; তাদের কাজ হ'চ্ছে ছোট ছোট পদাতিক দলের সম্মুখে ব্যাণ্ড্ বাজিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। এই যে ব্যাণ্ড্ বাজনা, এ কিছু সঙ্গীত চর্চ্চার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় না—ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে সৈন্যদের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা ও প্রেরণা এনে দেওয়াই এই ব্যাণ্ড্ বাজানোর একমাত্র

উদ্দেশ্য। বাজনার তালে তালে পা ফেলে সৈন্যদল যখন চলে তখন তারা দুঃখদুর্দশা আপন পর একেবারে ভুলে যায়। এইজন্যই সৈন্যদের সম্মুখে ব্যাণ্ড্‌ বাজানোর প্রথা অতি আদিমকাল থেকেই চলে আসছে।

বাজনা বাজিয়ে কি ক'রে অসাধ্য সাধন করা যায়, কি ক'রে শ্রান্ত অবসন্ন সৈন্যদলকে উৎসাহিত ক'রে তোলা যায় তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যাণ্ড্‌ বাদন

একদল ইংরাজ সৈন্য একবার পশ্চাদপসরণ ক'রতে যেয়ে বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে তিন দিন তিন রাত্রি একাদিক্রমে চ'লে দুপুর বেলা ফ্রান্সের এক পল্লীতে এসে উপস্থিত হ'ল। একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা অবিশ্রাম চলে তারা

ক্লান্তিতে অবসন্ন হ'য়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল ফরাসী পল্লীটির মধ্যে। ক্ষুৎপিপাসায় আচ্ছন্ন, পা ফুলে যন্ত্রণায় সবাই অস্থির—আর চ'লতে না পেরে তারা একটা বাগানে গাছের ছায়ায় সবাই প'ড়ল শুয়ে—আর তারা পারে না। এদিকে কিন্তু বিশ্রামের সময় নাই—চতুর্দ্দিকে শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসছে, বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়বার নির্দ্দিষ্ট সময়েরও বিলম্ব নাই—এখন বিশ্রাম অর্থ অবধারিত মৃত্যু। কিন্তু শরীর যেখানে অচল সেখানে আসন্ন মৃত্যুকে ভয় ক'রে লাভ কি? সৈন্যেরা একজোট হ'য়ে ব'লে ব'সল—আর পারি না বাপু! মরণকে এড়াতে যেয়ে এভাবে মরণকে ডেকে আনা কেন? এভাবে পথের মাঝে ম'রেই বা লাভ কি? বিশ্রাম ক'রে একটু সুস্থ হ'লে তবে আবার যাত্রা ক'রব। দলপতি এসে অনেক বোঝালেন—শত্রু নিকটে, চারদিক থেকে তারা এই পরিশ্রান্ত বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে অগ্রসর হ'চ্ছে, এখন ইতস্ততঃ করবার সময় নাই। তাঁর অনুনয় বিনয়, উৎসাহ দান, এমন কি ভয় দেখানো সব গেল নিষ্ফল হ'য়ে; সৈন্যেরা একেবারে নিশ্চল পাথরের মত রইল ব'সে। বিপন্ন নায়ক তখন কি মনে ক'রে নিকটের একটা মনিহারী দোকান থেকে নিয়ে এলেন কয়েকটি বাঁশী—যতগুলি বাঁশী পল্লীতে ছোট দোকান কয়টিতে পাওয়া গেল সবগুলিই নিয়ে আসা হ'ল। তারপর তিনি নিজে একটা বাঁশীতে "রুল ব্রিটানিয়া" (Rule Britania) গানটি বাজাতে আরম্ভ ক'রলেন এবং বাকী বাঁশীগুলি সৈন্যদের মধ্যে দিলেন বিলিয়ে। দলপতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সৈন্যেরাও ঐ একই সুরে ঐ গানটিই বাজাতে আরম্ভ ক'রলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যেরা উঠে দাঁড়াল এবং সব ক্লান্তি সব অবসাদ ভুলে বাঁশীর তালে তালে অগ্রসর হ'তে লাগল। এইভাবে বাঁশীর সুরে দলপতি গোটা বাহিনীটিকে নিয়ে এসে বন্দরে পৌছুলেন ঠিক জাহাজ ছাড়বার আগে। তাঁর সামান্য একটু উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সমস্ত বাহিনীটি আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

উইমেন্‌স্ অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়াল ফোর্স্

মেয়েরাও কিছু স্থল বাহিনীর কাজে কম সাহায্য করে না। অনেক মেয়ে 'উইমেন্‌স্ অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়াল ফোর্সে' (Women's Auxiliary Territorial

সঙ্কেত জ্ঞাপনের কাজে নিযুক্ত নারী সৈনিক

নারী সৈন্যেরা অনেক দূর মার্চ্চ করে আসার পর অধিনায়িকা তাদের প্রত্যেকের পা পরীক্ষা করছেন

Force) ভর্ত্তি হ'য়ে সৈন্যদলে যোগ দেয় এবং মোটর চালক, কেরাণী প্রভৃতির কাজ করে। এদেরও সৈন্যদের মত উর্দ্দি প'রতে হয় এবং পূরাপূরি না হ'লেও অনেকখানি সামরিক নিয়ম-কানুন মেনে চ'লতে হয়। এই সব নারী সৈনিকদেরও ঠিক পুরুষ সৈনিকদের মতই পায়ে হেটে মার্চ্চ্ ক'রতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোরতা তাদের ভোগ ক'রতে হয় না--এমন কথা মনে করার কোনই কারণ নাই। যারা যুদ্ধ করে তারা সৈনিক—তা সে পুরুষই হোক বা নারীই হোক।

সামরিক নিয়ম-কানুন

এইবার সৈন্যদলের সামরিক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা দরকার। লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে এক একটা বাহিনী গঠিত হয়, আর যুদ্ধের সময় এই বাহিনী গুলির উপরই সর্ব্বাংশে নির্ভর করে দেশের নিরাপত্তা, জাতির মান ইজ্জৎ, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য। এক একটা বাহিনী এত লোক নিয়ে গঠিত হ'লেও গোটা বাহিনীটাকে চ'লতে হয় একজন মানুষের মতে—নইলে নানা মুনির নানা মত হ'লে যুদ্ধ জয় কোন কালেই সম্ভব হবে না। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, মতামত, বিচারবুদ্ধি যদি সবাই চালাতে চেষ্টা করে তবে যুদ্ধস্থলে শত্রুকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কোন বাহিনীরই থাকবে না, তার পরিবর্ত্তে সেখানে চ'লবে একটা গোলমাল একটা বিচ্ছিন্ন বিত্রস্ত আবহাওয়া—একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলা। তা ছাড়া বাহিনীর প্রত্যেকটি অংশ পরস্পর সংযোগ রক্ষা ক'রতে না পারলে সমর প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যায়, কেন না কোন এক অংশের কাজে শৈথিল্য ঘটলেই অন্য অংশের কাজেও স্বভাবতঃই বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এই জন্যই সৈন্যগণের মধ্যে কাউকেই স্বাধীন বুদ্ধিতে চলতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেক সৈন্যকেই নীরবে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ মেনে চলতে হবে। তার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রতে হবে—কোন প্রতিবাদ চ'লবে না। সৈন্যদলে ব্যক্তির চেয়ে পদমর্য্যাদা অনেক বড় ব'লে গণ্য করা হয়। একজন অযোগ্য লোক হয়ত একটা খুব সাহসের পরিচয় দেখিয়ে তার পুরস্কার স্বরূপ উচ্চ পদে উন্নীত হ'লো। যোগ্যতর লোককে হয়ত সুযোগের অভাবে পড়েই থাকতে হ'লো নীচে, কিন্তু কোন ক্রমেই তার পক্ষে

উচ্চতর পদের এই সৈনিকটির নির্দেশ অমান্য করা চলবে না কোন রকমে অমান্য ক'রলে তার হবে চরম দণ্ড—অর্থাৎ অপরাধীকে গুলি ক'রে মেরে ফেলা হবে।

এইবারে বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। প্রথমেই দেখা যাক গোলন্দাজ বাহিনীর কর্ত্তব্য কি এবং কিভাবে তারা তাদের কাজ করে। আক্রমণ বা আত্মরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই গোলন্দাজদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে পদাতিক ও অশ্বারোহী দল কিম্বা ট্যাঙ্ক বাহিনীর কাজে সাহায্য করা। এই গোলন্দাজরাই বাহিনীর যত কিছু কামান বন্দুক চালনা করে—অবশ্য ট্যাঙ্কের মধ্যে যে সব কামান বন্দুক থাকে সেগুলি এবং সৈন্যদের প্রত্যেকের হাতে যে সব রাইফেল বা বন্দুক থাকে সেগুলি ছাড়া। কামানের পাল্লা আজকাল গেছে অনেক বেড়ে—এইজন্যেই

টেলিফোনের নির্দেশ মত গোলন্দাজেরা কামান চালাচ্ছে

গোলন্দাজ বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণতঃ বেশ একটু পিছনেই রাখা হয়—আর এই ব্যবস্থার ফলে তারা কিছু লক্ষ্যবস্তু চোখের উপর দেখতে পায় না। কিন্তু তাই ব'লে নিতান্ত অন্ধকারেও এরা কামান দাগে না; সৈন্যদল যেখানে এসে ঘাঁটি

গাড়ে তার চতুর্দ্দিকে তারা তৈরী করে নিরীক্ষণ-মঞ্চ (observation post)। এই সব মঞ্চের উপর থেকে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শত্রুসৈন্যের অবস্থান লক্ষ্য ক'রে, দর্শক সৈন্যটি সে কথা টেলিফোনযোগে গোলন্দাজদের জানিয়ে দেয় এবং তাদের নির্দ্দেশ পেলেই দরকার মত কামানের মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর কামান দাগা হয়। সময় সময় শুধু নিরীক্ষণ-মঞ্চের উপর নির্ভর না ক'রে বিমানযোগে আকাশ থেকে শত্রুসৈন্যের অবস্থান লক্ষ্য করা হয় এবং সেই অনুসারে গোলন্দাজদের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কামান ছুঁড়তে হ'লে কামানের মুখে প্রায়ই অগ্নিশিখা জ্বলে থাকে—শত্রুর কামানের মুখের অগ্নিশিখা লক্ষ্য ক'রে নিরীক্ষণ-মঞ্চ অথবা বিমানের সাহায্য না নিয়েও অনেক সময় কামান ছোড়া হ'যে থাকে, কিন্তু এতে সময় সময় বড় জব্দ হ'তে হয়। শত্রুপক্ষ ধাপ্পা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়ত একটা অতি বাজে জায়গায় কতকগুলি নকল কামান পেতে রেখে তার মুখে নকল অগ্নিশিখা জ্বালাতে থাকে এবং মিথ্যা শব্দ ক'রে শত্রুর গোলন্দাজ সৈন্যকে ধাপ্পা দেয়।

নকল কামান

এতে অযথা অনেক গোলাগুলি নষ্ট হয় বলে সচরাচর এইভাবে গোলন্দাজেরা কামান ছুঁড়তে চায় না। ট্যাঙ্কধ্বংসী অথবা বিমানধ্বংসী কামান ছাড়া অন্য সমস্ত

কামান যে সব গোলন্দাজ চালায়, তাদের কর্ত্তব্য অনেকটাই বহুমুখী। আত্মরক্ষার দিক থেকে তাদের লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে শত্রু এসে পরিখার মধ্যস্থ পদাতিক দলের উপর চড়াও ক'রতে না পারে। আবার আক্রমণের সময় এরা চেষ্টা করে শত্রু-পরিখার সামনের কাঁটা তারের বেড়া ভেঙ্গে দিতে, তাদের গোলন্দাজ বাহিনী নষ্ট ক'রে দিতে, তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিতে।
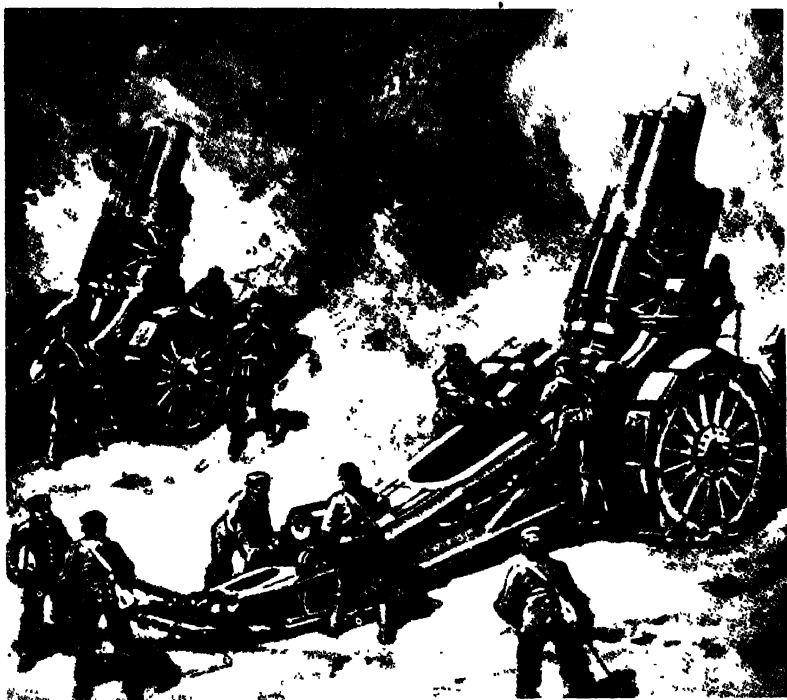
ভারী হাউইটজার কামান গোলা ছুঁড়ছে

স্থলযুদ্ধে গোলন্দাজ দল যে সব কামান ব্যবহার করে সেগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, ভারী কামান (heavy guns), মাঝারী কামান (medium guns) এবং ফিল্ড্ গান (field guns)। ভারী কামানের মধ্যে নাম করা যেতে পারে ১৮ ইঞ্চি, ১৬ ইঞ্চি, ১৪ ইঞ্চি, ৯·২ ইঞ্চি অথবা ৮ ইঞ্চি হাউইট্জার

কামানগুলির। এদের মধ্যে কোন কোনটার পাল্লা ২০।২৫ মাইল পর্য্যন্ত হ'তে পারে। এই শ্রেণীর দূর পাল্লার কামানগুলি প্রায়ই জলযুদ্ধে ব্যবহার করা হ'যে থাকে। এই ভারী কামানগুলির ব্যবহার হ'চ্ছে দূরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তুসমূহ আক্রমণ করবার জন্য। সাধারণতঃ দু'পক্ষ থেকেই এগুলি দিয়ে আক্রমণ করা হয় শত্রুর অনুরূপ কামানশ্রেণীকে।
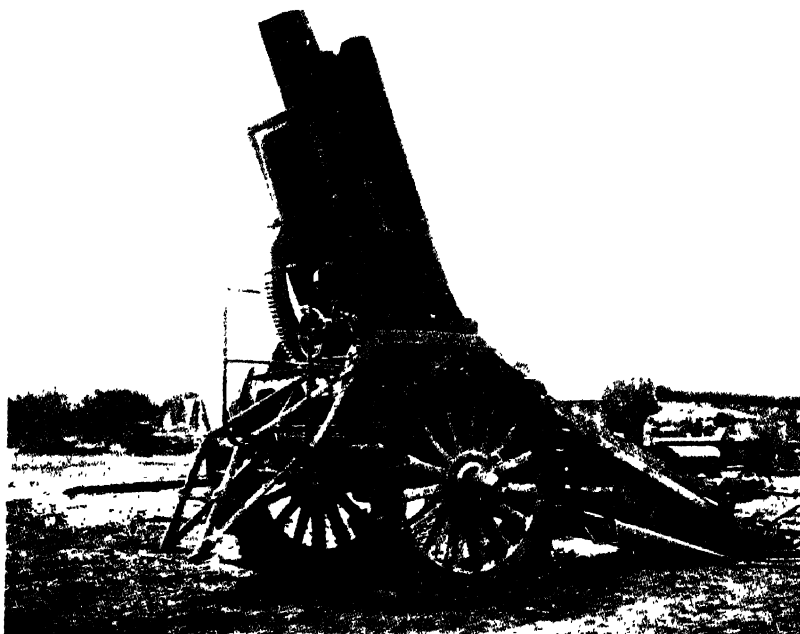
মাঝারী হাউইট্জার কামান

মাঝারী কামানের মধ্যে পড়ে ৪'৭ ইঞ্চি, ৬০ পাউণ্ডার আর ৬ ইঞ্চি গোলা ছুঁড়তে পারে এই ধরণের হাউইট্জারগুলি। এগুলির পাল্লা অনেক কম—মাত্র ১২।১৩ মাইল। আর ফিল্ড্ গানের উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ১৬ পাউণ্ডার, ১৮ পাউণ্ডার ও ২৫ পাউণ্ডারগুলি। এদের পাল্লা হয় বড়জোর ৮ মাইল, মাঝারী কামান ও ফিল্ড গানের ব্যবহার হয় শুধু শত্রুর পরিখা বা ঐ জাতীয় জিনিষের উপর।

এইখানে বলা যেতে পারে দূর পাল্লার কামান—যার গোলা ছুটে যায় একশ' মাইল কি তারও বেশী—তার কথা। ১৯১৪ সালে জার্ম্মাণী প্রথম এই ধরণের কামান ব্যবহার ক'রে প্যারির উপর গোলা বর্ষণ করেছিল। 'বিগ বার্থা' (Big Bertha) নামে পরিচিত এই কামানগুলির ব্যবহার কিন্তু ছড়িয়ে প'ড়তে পারেনি, কারণ এগুলি একদিকে ব্যয়সাধ্য অন্যদিকে অনিশ্চিত। এই ধরণের কামানের প্রধান অসুবিধাই এই যে এগুলি পঞ্চাশটা গোলা ছুঁড়বার পরই হ'য়ে যায় একেবারে অকর্ম্মণ্য, আবার এদিকে প্রত্যেকটা গোলা পিছু খরচ পড়ে তের হাজার টাকা। বর্ত্তমানে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে জার্ম্মাণী অধিকৃত ফরাসী বন্দরেও যেমন এই ধরণের কতকগুলি কামান বসান হ'য়েছে, তেমনি চ্যানেলের অপর পারে ইংরেজরাও বসিয়েছে কতকগুলি কামান। সময় ও সুবিধা বুঝে উভয়পক্ষই এই সব কামান চালায়, বেপরোয়া ভাবে এগুলো চালানো হয় না।

ভার্সাই সন্ধির পর যখন জার্ম্মাণীর অস্ত্রসজ্জা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সংবাদ পাওয়া গেল তখন দেখা গেল জার্ম্মাণীর এই ধরণের তিনটি কামান আছে। ইংরাজ, ফরাসী ও ইটালীর কারখানায় তখন একটা ক'রে এই জাতীয় কামান তৈরী আরম্ভ হ'য়েছিল বটে কিন্তু যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাওয়ার ফলে সে যাত্রায় এই কামান আর শেষ পর্য্যন্ত তৈরী হয় নি।

একশ' মাইল পাল্লার কামানের প্রয়োজন বর্ত্তমানকালে কমই। কেননা যে পরিমাণ খরচ ক'রে দুটি বা চারটি গুলি ছোড়া যায় তার চাইতে কম খরচে বিমান পাঠিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা চলে সহজে। এই জন্যই একশ' মাইল পাল্লার কামান কিছু দেশ ছেয়ে ফেলতে পারে নি।

বর্ত্তমান কালে যান্ত্রিক বাহিনী প্রবর্ত্তনের ফলে যে অশ্বারোহীর প্রয়োজন অনেকটা ক'মে গেছে সেকথা আগেই ব'লেছি। কাজ হিসাবে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রায় একই রকম মূল্যবান, শুধু গতির ক্ষিপ্রতার জন্যই দরকার ছিল অশ্বের। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, মোটর লরী, মোটর বাইক প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে এখন অশ্বারোহী দলের অস্তিত্ব একরকম নাই ব'ললেই চলে। সত্যি কথা ব'লতে গেলে, শান্তির সময় বিশেষ কোন উৎসব ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রের স্থল বাহিনীতে

অশ্বারোহী দলের ব্যবহার এখন মোটেই হয় না ব'ললেও কিছু অন্যায় বলা হয় না। যান্ত্রিক বাহিনীর প্রবর্ত্তনের ফলে অশ্বারোহীর অশ্ব আর ব্যবহৃত হয় না,

একশ' মাইল পাল্লার কামান 'বিগ বার্থা'

কিন্তু তাই ব'লে তাদের কাজের প্রয়োজন কিছু শেষ হ'য়ে যায় নাই। বহুদূর যেয়ে শত্রুর গতিবিধির সন্ধান ক'রে আসা, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রুকে আক্রমণ ক'রে

তার ব্যূহ ভেঙ্গে দেওয়া, অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে শত্রুকে হতভম্ব ক'রে দেওয়া এবং পিছনের পদাতিক দল না এসে পড়া পর্য্যন্ত শত্রুর ঘাঁটি দখল ক'রে ব'সে থাকা—চিরকালই এই ছিল অশ্বারোহী দলের কাজ। ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ীতে চেপে যে কোন সৈন্য আজ এই সব কাজ ক'রতে পারে।

ট্যাঙ্ক

ট্যাঙ্ক জিনিষটা কি—এখন সেই আলোচনাই ক'রব। এটা বিংশ শতাব্দীর একটা অদ্ভুত আবিষ্কার সন্দেহ নাই—কিন্তু একেবারে অপ্রত্যাশিতও নয়। মহাভারতে দেখা যায় রথে চ'ড়ে যুদ্ধ চলত, খৃষ্টের জন্মের বারশ' বছর আগে চীন দেশেও রথে চেপে যুদ্ধ হ'ত জানা যায়, সুদূর অতীতেও আসিরীয় আর মিশরীয়গণও একপ্রকার চলমান দুর্গ ব্যবহার ক'রত—এ'টা জানা গেছে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে টিউডর ওয়ার কার্ট (Tudor War Cart) বলে একরকম যুদ্ধশকট প্রচলিত ছিল। তারপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রনির্ম্মাতা ট্যাঙ্কের মত অনেক যন্ত্র তৈরী ক'রেছেন বা করবার চেষ্টা করেছেন সত্যি, কিন্তু ব্যাপকভাবে সেগুলির ব্যবহার তখন ছিল এক রকম কল্পনার বাইরেই।

১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে একদল ইংরাজ যন্ত্রবিদ ট্যাঙ্কের উপকারিতা সম্বন্ধে দৃঢ় মত প্রচার করেন, কিন্তু তখন এর বিরোধীই ছিলেন অনেক বেশী। স্থলযুদ্ধের এই প্রধান অস্ত্রের প্রবর্ত্তন হয় মুখ্যতঃ সেই সময়কার নৌবিভাগীয় মন্ত্রী চার্চ্চিল (বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী) সাহেবের চেষ্টায়। জার্ম্মাণীতে ১৯১৩।১৪ সালে ট্যাঙ্ক সম্পর্কে অনেক আলোচনা হ'য়েছিল সত্যি, কিন্তু তারা ট্যাঙ্কের কার্য্যকারিতায় তখন বিশেষ আস্থা স্থাপন ক'রতে পারেনি। কিন্তু ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ ট্যাঙ্কের একখানা জার্ম্মাণদের হাতে পড়ায় তারা এদিকে সজাগ হ'য়ে উঠল এবং ট্যাঙ্কের ব্যবহারে তাদের যা কিছু 'কিন্তু' ছিল সব নষ্ট হ'য়ে গেল।

এই বিচিত্র যন্ত্রটির নাম ট্যাঙ্ক হ'ল কেন? ১৯১৬ সালে যখন ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজেরা ট্যাঙ্ক পাঠাতে আরম্ভ ক'রল, তখন শত্রুর গুপ্তচরের চোখে

ধূলো দেবার জন্যে প্যাকিং কেসের গায়ে লিখে দেওয়া হ'ত 'রাশিয়ার জন্য ট্যাঙ্ক' (Tanks for Russia)। এই থেকে 'ট্যাঙ্ক' কথাটার প্রচলন হ'ল।

খাল বিল নদী নালা ডিঙ্গিয়ে যাতে একেবারে শত্রুর ব্যূহের মধ্যে হানা দেওয়া যায় মুখ্যতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই হ'য়েছে ট্যাঙ্কের আবিষ্কার। বাহির থেকে দেখতে গেলে ট্যাঙ্কগুলি এক একটা চলমান দুর্গ। শত্রুর উপর গোলাগুলি বর্ষণ ক'রতে ক'রতে এই সব ট্যাঙ্ক ছুটে চলে একেবারে সম্মুখ দিকে। আর তার পিছনে ছোটে পদাতিক সৈন্য বোঝাই সাঁজোয়া গাড়ী, আর মটর বাইকে ক'রে পদাতিক সৈন্যের দল। হাল্কা, মাঝারী আর ভারী এই তিন রকম ট্যাঙ্কই আজকাল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ট্যাঙ্কের অগ্রগতি

ভারী ট্যাঙ্কগুলির ওজন হয় পঞ্চাশ থেকে সত্তর টন অর্থাৎ ১৩৫০ থেকে ১৮৯০ মণ। ভারী ট্যাঙ্কে ফরাসীরা শ্রেষ্ঠ একথা স্বীকার ক'রতেই হবে। এই ধরণের ট্যাঙ্কগুলি বাহিনীর আগে আগে চলে এবং পথের সমস্ত বাধাবিপত্তি নিজের গতিবেগ ও ওজনের দ্বারা নষ্ট ক'রে দেয়, আর পিছনে যারা আসে তাদের সম্মুখে বিরাট দুর্গের মত দাঁড়িয়ে থেকে তাদের শত্রুর আক্রমণ থেকে আড়াল ক'রে রাখে। এত ভারী ট্যাঙ্ক ব্যবহারের বিপদও আছে কম নয়। প্রথমতঃ ট্যাঙ্ক

যত বড হয়, শত্রুর পক্ষে তাকে তাক্ করারও হয় ততই সুবিধা, আবার বড ট্যাঙ্কের গতিবেগ হয় অনেক কম। ট্যাঙ্ক বড হ'লে তাতে অস্ত্রসজ্জাও রাখ্তে হবে বেশী এবং তার ফলে ট্যাঙ্কের মধ্যে যে সব সৈনিক থাকবে বাইরে তাদের দৃষ্টিপাত করবার স্থানও যাবে অনেকখানি ক'মে। বস্তুতঃ পক্ষে এই তিনটি অসুবিধার উপর ভিত্তি করেই আজকার দিনে ট্যাঙ্কধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হ'য়েছে। ভারী ট্যাঙ্কগুলির গতিবেগ হয় ঘণ্টায় বড জোর ছয় সাত মাইল, কিন্তু মাঝারী হাল্কা ধরণের ট্যাঙ্কগুলি ছোটে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত। ছোট ট্যাঙ্কগুলি ওজনে হয় ছয় টন বা একশ' বাষট্টি মণ এবং মাঝারী ধরণের ট্যাঙ্কগুলির ওজন হয় ষোল টন বা চারশ' বাইশ মণ। জার্ম্মাণী চার টন বা তারও কম ওজনের হাল্কা ট্যাঙ্ক বের ক'রেছিল বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ বোঝা গেছে যে এগুলি খুব বেশী কার্য্যকরী হ'তে পারে না। সেই জন্যই জার্ম্মাণী এখন হাল্কা ট্যাঙ্ক তৈরী করা বন্ধ ক'রে মাঝারী ওজনের ট্যাঙ্কই বেশী তৈরী ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে।

ট্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ দেড় বা দু ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয় যাতে ক'রে শত্রুর গুলি এতে সহসা ঢুকতে না পারে। কিন্তু এই ভাবে দুর্ভেদ্য করা হ'য়েছে বলেই এর ব্যবহার প্রবর্ত্তন করা হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। ট্যাঙ্কের আসল বৈশিষ্ট্য হ'ল এর চাকায়। সাধারণ মোটর গাড়ী বা সাঁজোয়া গাড়ীতে চাকায় থাকে টায়ার, যার ফলে ভাল রাস্তায় এগুলির গতিবেগ যায় বেড়ে। রাস্তা খারাপ হ'লে অবশ্য এই সব গাড়ীর চ'লতে অসুবিধা হয় কিন্তু তবুও তারা এগিয়ে যেতে পারে। যদি রাস্তা হয় বেশী অসমান, কোন যায়গায় যদি টিলা থাকে বা তার পরই যদি পড়ে ছোট খাল, তবে এই সব টায়ারওয়ালা গাড়ীগুলি হ'য়ে পড়ে একেবারে অচল। ট্যাঙ্ক কিন্তু অনায়াসেই এসব ডিঙ্গিয়ে চ'লে যেতে পারে—এবং সেটা সম্ভব হয় শুধু এর চাকার বৈশিষ্ট্যের জোরে। ট্যাঙ্কের চাকায় পরান থাকে একটা খাঁজ কাটা বেল্ট—ইংরাজীতে যাকে বলে ক্যাটার-পিলার ট্র্যাক্টার (Caterpillar Tractor)। এই সব দিয়ে মাটি কামড়ে ধ'রে ট্যাঙ্ক পথ চলে ব'লেই চষা জমি, উঁচু নীচু জমি, ছোট খাট বনজঙ্গল ভেদ করে চ'লতে ট্যাঙ্কের কোনই অসুবিধা হয় না। উন্নত ধরণের ট্যাঙ্কগুলিতে সাধারণতঃ দেড়শ মাইল চলবার মত তেল থাকে

প্রত্যেক ট্যাঙ্ক ছোটখাট খাল পার হ'য়ে যেতে পারে। খাল দেখ্‌তে পেলে দূরে থেকে পূর্ণবেগে চালিয়ে খালের পারে এসেই চালক হঠাৎ দেন ট্যাঙ্কের ব্রেক ক'ষে এবং তার ফলে ট্যাঙ্কখানা যায় লাফিয়ে গর্ত্ত বা খাল পার হ'য়ে। আজ পর্য্যন্ত কুড়ি ফিট চওড়া খাল ট্যাঙ্ক স্বচ্ছন্দে পার হ'তে পারে দেখা গেছে। এই ভাবে লাফিয়ে পার হ'তে গেলে দুই রকম বিপদের সম্ভাবনা আছে। প্রথমতঃ এত ভারী জিনিষ লাফিয়ে প'ড়লে ধাক্কা লেগে গোটা ট্যাঙ্কখানাই ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা আছে—একথা বোধ হয় না ব'ললেও চলে। কিন্তু ট্যাঙ্ক তৈরী ক'রতে সকল সময় নানা রকম পরীক্ষার পর এমন সব বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাত ব্যবহার করা হয় যে এই রকম ভীষণ ঝাঁকুনিতেও ট্যাঙ্কের কিছু হয় না। দ্বিতীয়তঃ লাফ দেওয়ার পর যখন ট্যাঙ্ক পুনরায় মাটিতে এসে পড়ে তখন থাকে ট্যাঙ্কের আর এক বিপদের সম্ভাবনা যার ফলে ট্যাঙ্কখানা যেতে পারে একেবারে উল্টে। কিন্তু সাধারণতঃ ট্যাঙ্কের তলাটা মাথাটার চাইতে থাকে ভারী—এইজন্য ট্যাঙ্কের ভারকেন্দ্র এসে পড়ে নীচে, আর হঠাৎ কোন কারণে ভীষণ হেলে প'ড়লেও শেষ পর্য্যন্ত ট্যাঙ্কখানি উল্টে না যেয়ে আবার এর আসল অবস্থায় এসে পৌছায়।

ট্যাঙ্ক কতটা খাড়া উঁচু জমিতে উঠ্‌তে পারে? সাধারণতঃ মাটি থেকে চল্লিশ ডিগ্রি কোণের উঁচু জায়গা পর্য্যন্ত ট্যাঙ্ক্ বেয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তার বেশী খাড়া হ'লে ট্যাঙ্ক সেখানে হ'য়ে পড়ে অচল।

আজকাল সব দেশেই একেবারে পৃথক ট্যাঙ্কবাহিনী গ'ড়ে উঠেছে এবং জলযুদ্ধে যেভাবে জাহাজগুলির ব্যবহার করা হয়, স্থলযুদ্ধে ট্যাঙ্কগুলি ঠিক সেই কাজ ক'রে থাকে। শত্রুকে আক্রমণ করবার সময় হাল্কা ট্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া হয় গোয়েন্দাগিরির ভার, পাহারার ভার এই সব।

এগুলির পিছনেই থাকে অতিকায় ট্যাঙ্কগুলি। ভারী ট্যাঙ্কগুলির ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে আজকাল প্রায় সকল দেশই দুরকমের মাঝারী ট্যাঙ্ক উদ্ভাবন করেছে। এর সব প্রথম শ্রেণীর ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয় শত্রুকে আঘাত করবার জন্য। শত্রুর কামান বন্দুক নষ্ট করে সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে যখন প্রথম শ্রেণীর অগ্রবর্ত্তী ট্যাঙ্কগুলি এগিয়ে যায় তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্যাঙ্কগুলি তাদের

পিছনে পিছনেই এগিয়ে যেতে থাকে। এগুলির কাজ হচ্ছে শত্রুর ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানশ্রেণীকে নষ্ট করা আর ধোঁয়ার জাল বিস্তার ক'রে বাহিনীর পরবর্ত্তী অংশকে লুকিয়ে রাখা।

হাল্কা ট্যাঙ্কগুলিতে থাকে একটি ক'রে ভাইকার কামান এবং একটি ক'রে হাল্কা মেশিন গান, আর মাঝারি ট্যাঙ্কগুলিতে দেওয়া হয় তিনটি ভাইকার আর একটি তিন পাউণ্ডার কামান। সব ট্যাঙ্কেরই নির্ম্মাণপ্রণালী এখনও রাখা হ'য়েছে বিশেষ গোপনীয়, সুতরাং আভ্যন্তরীণ কলকব্জার কোন বিবরণ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে এইমাত্র বলা যেতে পারে যে ট্যাঙ্ক চালকের পাশেই বসে থাকে একজন ক'রে বেতার চালক এবং ট্যাঙ্কখানি যতদূরে যেয়েই পড়ুক না কেন সেই বাহিনীর নায়কের সঙ্গে বেতার সাহায্যে সংযোগ রক্ষা ক'রে থাকে। খুব হাল্কা ট্যাঙ্ক-গুলিতে অনেক সময় এই বেতার যন্ত্র না থাকায় তারা সাঙ্কেতিক চিহ্ন অর্থাৎ নং রেখা এর নিশান উড়িয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলে।

বড় ট্যাঙ্কে সাধারণতঃ ৮ জন পদাতি সৈন্য বসবার ব্যবস্থা আছে। তার মধ্যে কেউ বেতারবিদ, কেউ বা কামানচালক গোলন্দাজ; কিন্তু সব রকম কাজ ক'রবার ক্ষমতা ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রত্যেকটা সৈন্যেরই থাকা দরকার। হঠাৎ যদি শত্রুর আক্রমণে ট্যাঙ্কের চালক আহত বা নিহত হন তবে বেতারবিদই হ'ন বা গোলন্দাজই হ'ন একজন ট্যাঙ্কখানি চালাবার ব্যবস্থা করেন—সেইজন্যেই ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিককে সব রকম কাজ জেনে রাখতে হয়।

ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো কথা এখানে বলা দরকার। শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক যে পথে আসতে পারে মনে হয় সে পথে কংক্রীটের থাম গেঁথে তোলা হয় অথবা মাঝে মাঝে পেতে রাখা হয় চোরা খাদ। এই খাদগুলি বিশেষ ভাবে তৈরী এবং কংক্রীট দিয়ে গাঁথা। এর উপর খানিকটা লতাপাতা চাপা দেওয়া থাকে যাতে ট্যাঙ্কচালক আসন্ন বিপদের কথা বুঝতে না পারে। ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে আসতে আসতে যেই ট্যাঙ্ক এসে পড়ে এই চোরা খাদের মুখে অমনি তার ঘটে বিপদ। সমস্ত ট্যাঙ্কখানা নিজের ভারে গর্ত্তের মধ্যে যায় তলিয়ে —কোনমতেই আর উপরে উঠতে পারে না।

চোরা খাদে ট্যাঙ্ক প'ড়েছে। ডাইনে —চোরা খাদ, ট্যাঙ্ক পড়বার আগে।
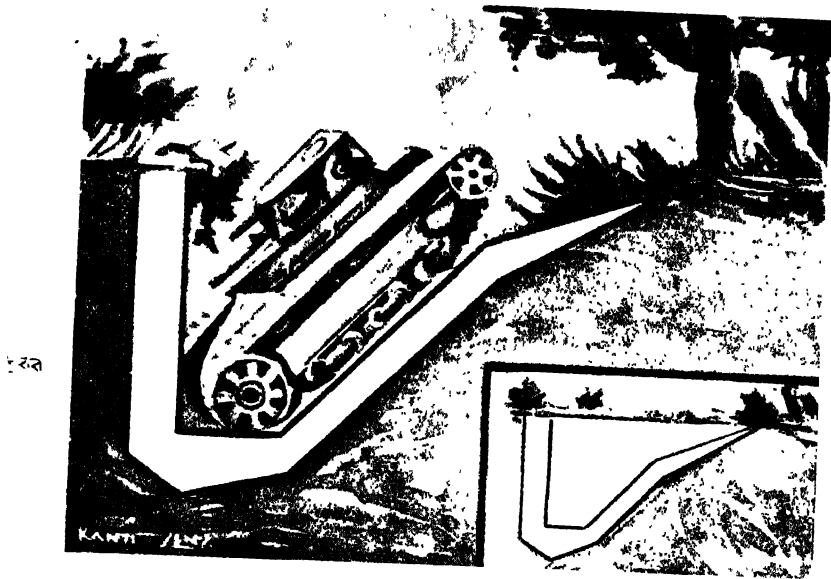
ট্যাঙ্ক ধ্বংস করবার আর এক রকম অস্ত্র হ'ল ট্যাঙ্ক প্রতিরোধক রাইফেল। মাত্র একজন পদাতিক এই রাইফেল চালাতে পারে—এই হ'ল এর সব চাইতে বড় সুবিধে। প্রত্যেক বাহিনীর অগ্রবর্ত্তী শ্রেণীর পদাতিকগণকে এই অস্ত্রে সুসজ্জিত
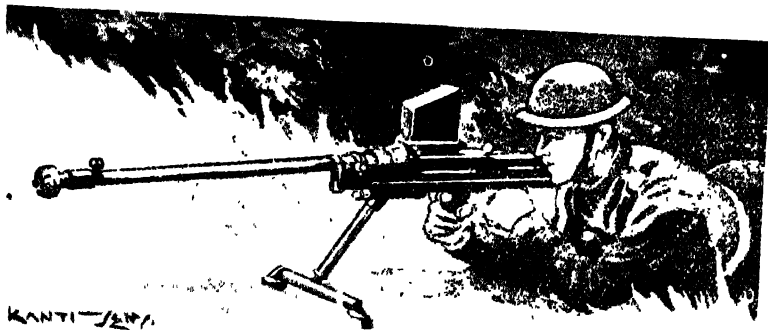
ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী রাইফেল

করা যায় যাতে শত্রু এগিয়ে এলে জীবন-মরণ তুচ্ছ ক'রে এই সৈন্যদল ট্যাঙ্ক আক্রমণ প্রতিহত ক'রতে পারে।

সাঁজোয়া গাড়ী

সাঁজোয়া গাড়ী সম্বন্ধে কিছু ব'লতে গেলে প্রথমেই ব'লতে হয় ট্যাঙ্কের সঙ্গে এর যেটুকু অমিল আছে তারই কথা। বিরাট আকৃতি এবং অস্ত্রসজ্জার জন্য দূর থেকে সাঁজোয়া গাড়ী দেখতে ঠিক ট্যাঙ্কের মতই দেখায় বটে, কিন্তু ট্যাঙ্কের সঙ্গে এর মৌলিক প্রভেদ হ'চ্ছে চাকার গড়নে। ট্যাঙ্কে চাকার বদলে থাকে খাঁজকাটা বেল্ট, কিন্তু সাঁজোয়া গাড়ীতে থাকে টায়ারের চাকা। এর জন্যই ভাল রাস্তা বা সমান জমি ভিন্ন সাঁজোয়া গাড়ী চ'লতে পারে না। অসমান জমির মধ্যে সাঁজোয়া গাড়ী হ'য়ে পড়ে একেবারেই অচল। এই সব গাড়ীর ভিতরেও থাকে বেতার যন্ত্র, আর দু'টি ক'রে মেশিন গান এবং এগুলি ছুটতে পারে ঘণ্টায় কম পক্ষে চল্লিশ মাইল ক'রে।

সাঁজোয়া গাড়ীগুলি মরুভূমির মধ্যে বিশেষ কার্য্যকরী হয় ব'লে যুদ্ধের সময় এর একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। তীব্র গতির জন্য এবং অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত থাকার জন্য এগুলি সাধারণতঃ সৈন্য অপসারণ ও পাহারা এবং সন্ধানী কাজের জন্যই বেশী ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

যুদ্ধের সময় ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী ছাড়া আরও অনেক রকম গাড়ীই ব্যবহার করা দরকার হয়। অল্প সময়ে অনেক পথ উত্তীর্ণ হ'তে হবে এই যখন উদ্দেশ্য হয়, তখন কোন বিশেষ যান বাহনের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকা চলে না। তা ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে কখন কোন্ ধরণের যান কার্য্যকরী হবে তাই বা কে জানে। আবার কোন দেশে হয়ত পার্ব্বত্য নদী নালা বেশী, সেখানে ব্যবহার ক'রতে হবে ট্যাঙ্ক; আবার কোন দেশে হয়ত সুন্দর পথঘাট মিলবে, সেখানে সাঁজোয়া গাড়ী, মোটর বাইক, মোটর লরী এই সবই হবে উপযুক্ত যানবাহন। এক কথায় যুদ্ধের সময় সকল রকম যানবাহনেরই ব্যবস্থা রাখা হয় এবং স্থানীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে দরকার মত নির্দ্দিষ্ট যানবাহন ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।
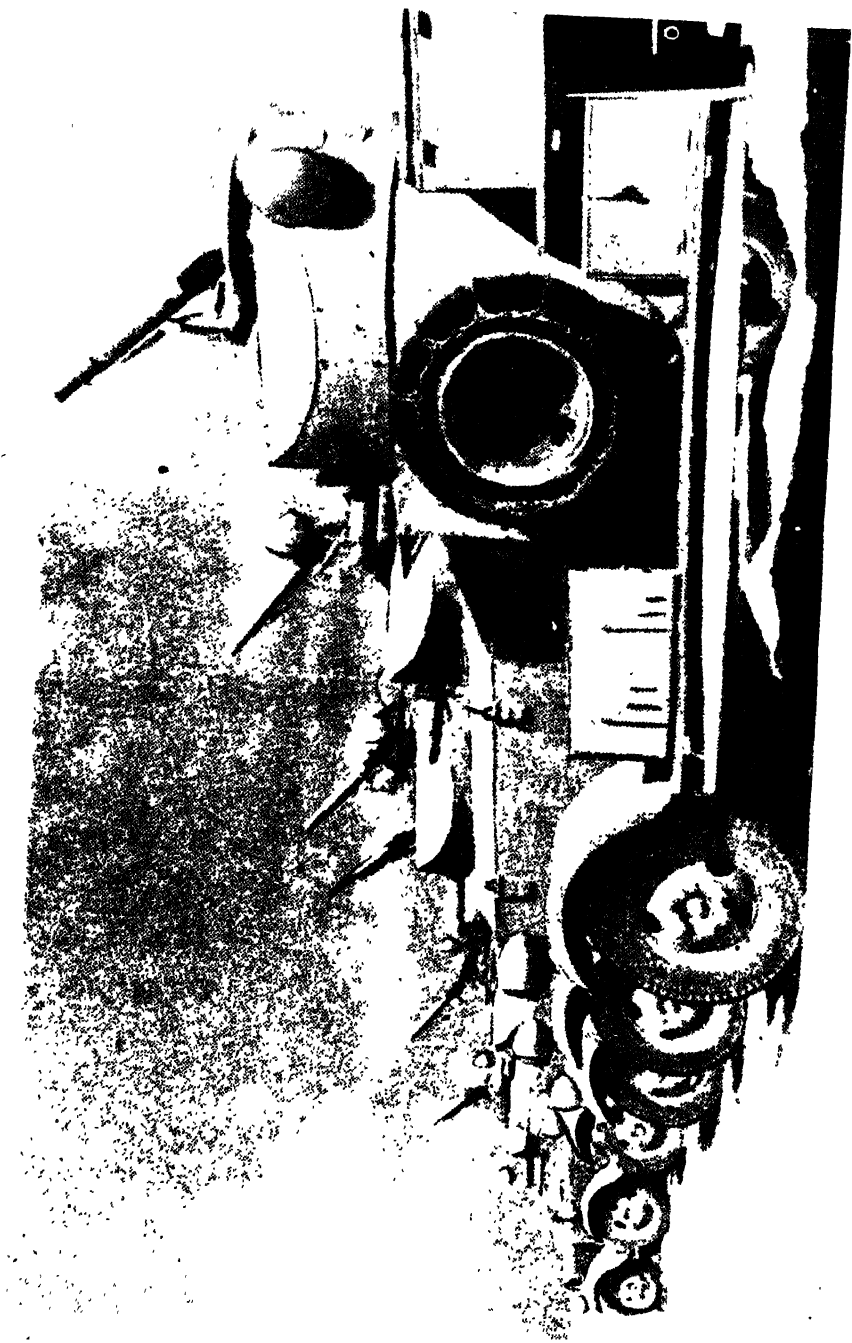
পদাতিক দলের অস্ত্রসজ্জা

পদাতিক সৈন্যদলকে যে সব কাজ ক'রতে হয় এবং তাদের স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য মোটর বাইক, মোটর লরী, সাঁজোয়া গাড়ী ইত্যাদি যে সব যান ব্যবহার করা হয় সে সম্বন্ধে আগেই বলা হ'য়েছে। এখন আলোচনা করা যাক পদাতিক সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জা সম্বন্ধে। কিন্তু তার পূর্ব্বে একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে সব সময়ই কিছু পদাতিক সৈন্যের জন্য যানবাহন নিয়োগ করা হ'বে এমনও কথা নাই—দরকার হ'লে দশ পনর বিশ মাইল বা তারও বেশী সৈন্যদের হাটতে হয়। এইজন্যই পদাতিক সৈন্যদলের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। আধুনিক পদাতিক সৈন্যের পোষাক এমন ভাবে পরিকল্পিত যে সমস্ত বোঝা থাকে তার কোমরবন্ধের উপর, যাতে করে পা দুখানির উপর অহেতুক ভার কিছু না পড়ে। কারণ কোমরবন্ধের নীচে ভার বেশী হ'লে তার হেঁটে দাঁড়াবার শক্তি যাবে অনেক ক'মে। অবশ্য কোমরবন্ধের নীচে আজও তার বেয়নেট ঝুলে থাকে, তবে এই বেয়নেটের ওজন আগে যেখানে ছিল সাড়ে তিন পাউণ্ড এখন সেখানে করা হ'য়েছে পৌনে ১ পাউণ্ড মাত্র। পদাতিক সৈন্যের সঙ্গে থাকে রাইফেল, জলের বোতল, নিত্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্য, বেয়নেট, গ্যাস-প্রতিরোধক যন্ত্র, কিছু গুলি বারুদ ও হাতবোমা, অন্ততঃ একদিনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য, আর জলপান ক'রবার একটি পেয়ালা। এ ছাড়া অন্য যা কিছু তার প্রয়োজন হ'তে পারে সেগুলি থাকে ঘাটিতে এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে যাবার সময় সেগুলি যায় মালবাহী লরীতে।

পদাতিক সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল রাইফেল, রিভলভার, ভারী মেশিন গান, হাল্কা মেশিন গান বা ব্রেন গান, রাইফেল বোমা আর হাত বোমা। রিভলভারগুলি হয় সব ছ'ঘরা অর্থাৎ একসঙ্গে ছ'টি ক'রে গুলি এ থেকে একসঙ্গে ছোড়া যেতে পারে। আক্রমণ ক'রতে যেয়ে যখন পদাতিক দল শত্রুসৈন্যের সামনাসামনি এসে পড়ে তখনই ব্যবহৃত হতে পারে এই রিভলভার—দূর থেকে এর ব্যবহারে কোন ফলই হয় না।

পদাতিক সৈন্যের শেষ অস্ত্র ব'লতে গেলে বেয়নেট আর বন্দুকের কুঁদা। সম্মুখে এসে যখন দুই-দল প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করে তখন বেয়নেট আসে শেষ পর্যন্ত কাজে। এ রকম ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বন্দুকের গুলি বা বোমা কোনই কাজে আসে না।

হাতাহাতি লড়াই

রাইফেলের গুলি অনায়াসে এক হাজার গজ পর্য্যন্ত যেতে পারে এবং প্রত্যেক গুলির যেতে সময় লাগে মাত্র চার সেকেণ্ড। শত্রু যখন ছ'শ গজের মধ্যে এসে পড়ে তখন মাটিতে শুয়ে প'ড়ে রাইফেল ছুঁড়লে গুলি মাটি থেকে ছয় ফিটের উপরে উঠে না। এইজন্যে সাধারণতঃ এরকম ক্ষেত্রে মাটিতে শুয়েই সৈন্যেরা গুলি ছুঁড়তে থাকে। কোন কোন উন্নত ধরণের রাইফেল থেকে প্রতি মিনিটে তাক্ মাফিক পনরটি ক'রে গুলি ছোঁড়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ পাঁচটির বেশী গুলি

ছোড়ার দরকার হয় না। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে যখন জার্মাণ সৈন্যদল মন্‌স্ থেকে পশ্চাদপসরণ ক'রছিল তখন মিত্রপক্ষ তাদের উপরে এমন তীব্র বেগে এবং তাড়াতাড়ি রাইফেলের গুলি ছুঁড়লে যে জার্মাণরা ধারণা ক'রেছিল যে তাদের উপর মেশিন গান ছোড়া হ'চ্ছে।

আজকার দিনে পদাতিক সৈন্যদলকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'চ্ছে যে তারা আস্তে আস্তে শত্রুসৈন্যের পরিখার কাছে গিয়ে রাইফেল বাগিয়ে লতাপাতার মধ্যে লুকিয়ে শুয়ে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! কোন রকমেই তারা কোন শব্দ ক'রবে না, এমন কি তাদের নিশ্বাসের পর্য্যন্ত কোন শব্দ পাওয়া যাবে না—সব এমনি নিশ্চল হ'য়ে পড়ে থাকবে যাতে শত্রুপক্ষ তাদের কোন সন্ধান না পায়। তারপর সুযোগ বুঝলেই দলপতি সৈন্যদের ক'রবেন ইঙ্গিত, আর তারা

রাইফেল হাতে পদাতিক সৈন্য

একসঙ্গে চালাতে থাকবে রাইফেলের গুলি মিনিটে দশ পনরটা ক'রে। ভারী কামান বন্দুক নিয়ে এই রকম ভাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব—তাই এ ব্যবস্থা। এতে কিন্তু আক্রমণকারীদের কতদূর বিপদের সম্ভাবনা সে ত অনায়াসেই বোঝা যায়—তা ছাড়া এই সব সৈন্যের পক্ষে জীবন্ত ফিরে আসার সম্ভাবনা নাই ব'ললেই

চলে। এই ধরণের অতর্কিত আক্রমণের মূল্য কিন্তু কম নয়, কেননা একসঙ্গে কয়েকদিক থেকে এমনিতর আক্রমণ চালাতে পারলে শত্রু যাবে হতভম্ব হ'য়ে এবং ঠিক সেই সময়ই দূর থেকে ছুটে এসে মূল বাহিনী ক'রবে তাদের উপর চড়াও। পদাতিকদের ব্যবহারের উপযুক্ত উন্নত ধরণের রাইফেলগুলির ওজন হয় আট থেকে নয় পাউণ্ড মাত্র এবং এক একটি তৈরী ক'রতে খরচ হয় আট পাউণ্ড বা একশ' বার টাকা।

ব্রেন গান্—এইগুলি হ'ল হাল্কা মেশিন গান যা নাকি ইচ্ছামত মাটিতে রেখে, হাতে রেখে, বুকে রেখে অনায়াসে ছুঁড়তে পারা যায় এবং চালাতে একজনের বেশী লোকের প্রয়োজন হয় না, অথচ ছ'শ' গজের মধ্যে এর লক্ষ্য একদম অব্যর্থ। আবশ্যক হ'লে এই মেশিন গান বিমানবিধ্বংসী হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলির ওজন হয় মাত্র একুশ পাউণ্ড বা সাড়ে দশ সের।

এই জাতীয় বন্দুকের সুবিধা সম্বন্ধে দু একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। সব বন্দুকই বেশীক্ষণ চ'ললে গরম হ'য়ে উঠে ব'লে বন্দুক ঠাণ্ডা রাখবার বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়। ব্রেন গান ঠাণ্ডা হয় বাতাসেই, অন্যান্য বন্দুকের মত ঠাণ্ডা জলের দরকার হয় না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ ধ'রে বন্দুক চললে বাতাসে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় না। সেরকম ক্ষেত্রে বন্দুকের নলটি খুলে ফেলে নূতন নল পরিয়ে নিলেই চলে। এই নল বদল সৈনিকেরা নিজেরাই অনায়াসে ক'রতে পারে, অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, এমন কি কোন যন্ত্রপাতিও এর জন্য দরকার হয় না। সব বন্দুকেই গুলি ছুঁড়বার সময় একটা অগ্নিশিখা দেখা যায়, আর রাত্রি বেলা এই অগ্নিশিখা লক্ষ্য ক'রেই শত্রুসৈন্য বিপক্ষ পদাতিকের অবস্থান বুঝতে পারে। কিন্তু ব্রেন গানের মুখে থাকে একটা লম্বাটে ঢাকনি এবং এরই জন্য অগ্নিশিখা মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না।

গুলি ছোঁড়ার পর প্রত্যেক বন্দুকের নলই পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়, না হ'লে পরবর্ত্তী গুলি ছোঁড়া হয় অসম্ভব। ব্রেন গানের এ কাজেরও কোন দরকার হয় না। গুলি ছুঁড়লে নলের মধ্যে যে ধোঁয়া জন্মে তারই খানিকটা একটা ভাল্‌বের সাহায্যে অন্যদিকে গুলির প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং গুলির অবশিষ্টাংশ, যা সেই

প্রকোষ্ঠে প'ড়ে থাকে—তাকে ঠেলে বের ক'রে দেয় ও নিজেও বের হ'য়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংএর সাহায্যে একটা নূতন গুলি এসে দাড়ায় এই প্রকোষ্ঠে।

এইসব বন্দোবস্ত এবং সুবিধার জন্য ব্রেন গানই আজকাল হ'য়ে দাড়িয়েছে স্থল বাহিনীর অন্যতম প্রধান অস্ত্র।

ভারী মেশিন গানগুলি একসঙ্গে অনেকটা জায়গা নিয়ে গুলি ছড়াতে পারে ব'লে শত্রুর অবস্থান একবার দেখে নিতে পারলে অন্ধকারে অথবা কুয়াসার মধ্যেও এগুলি বেশ চালান যায়। গুলি ক'রবার সময় গরম হ'য়ে ওঠে বলে বন্দুকের মধ্যে জল দিয়ে রাখা হয় এবং মধ্যে মধ্যে এই জল ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা জল দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই বন্দুকগুলি তৈরী ক'রতে ব্যয় হয় বন্দুক-পিছু দু'শ' পাউণ্ড বা প্রায় তিন হাজার টাকা। প্রত্যেকটা বন্দুকের সঙ্গে গুলি থাকে সাড়ে তিন হাজার এবং বেশ আস্তে আস্তে ছুঁড়লেও মিনিটে ছুঁড়তে পারে যাট, পঁয়ষট্টিটি গুলি।

ভারী মেশিন গান

আক্রমণের সময় পদাতিক সৈন্যেরা অনেক সময় হাত বোমা ছুড়ে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করে এবং পরিখা-মধ্যস্থ পদাতিক শত্রুদলকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। দেখা গেছে একজন শিক্ষিত সৈন্য প্রায় ত্রিশ গজ পর্যন্ত বোমা ছুঁড়তে পারে।

এই হাত বোমাগুলি দেখতে ডিমের মত এবং এর খোলটা হয় ঢালাই লোহার। এর প্রত্যেকটার ওজন হয় দেড় পাউণ্ড। বাইরের খোলের গায়ে

একটা হাতল ও পিন দিয়ে এমন ভাবে বোমাটার কলকব্জা লাগান থাকে যে হাতের উপর কম বেশী ঝাঁকুনী লাগলেও বোমাটি ফেটে যাবে না। ছুঁড়বার মুহূর্ত্তে সৈনিকটি এই পিনটি সরিয়ে নিয়ে একটা স্প্রিং চেপে ধরে। তার হাত থেকে বেরিয়ে পড়তেই স্প্রিংটি যায় খুলে আর যেয়ে আঘাত করে বোমাটির মধ্যে সাজান একটা হাতুড়ীতে। এই আঘাতের ফলেই বোমায় রক্ষিত সহজদাহ্য বারুদ জ্বলে ওঠে ও তার ফলে বোমাটি যায় ফেটে। এই হাত বোমাগুলি আজকালকার যুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত হয় এবং এই বোমা ছোড়বার কায়দা প্রত্যেক পদাতিককে শেখান হয়। এখানে একটা কথা ব'লে রাখা ভাল যে স্পেনের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে যে এই হাত বোমা ছুঁড়ে হাল্কা ট্যাঙ্কগুলিকে নষ্ট করাও সম্ভব।

দুর্গ-প্রাকার

যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করা অথবা আত্মরক্ষা করা আর দেশের মধ্যে শত্রুকে না ঢুকতে দেওয়া এ দুটার মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। যখন দেশের দোর গোড়ায় শত্রু এসে হানা দেয়, তখন তাকে প্রবল বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশের সীমান্তে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রবার ব্যবস্থা সব দেশে সব কালে প্রচলিত ছিল। পূর্ব্ব সীমান্ত থেকে যাতে কোন শত্রু ফ্রান্স আক্রমণ ক'রতে না পারে এই উদ্দেশ্য নিয়ে ফ্রান্স বরাবর নিজের সীমান্ত জুড়ে সুইজার ল্যাণ্ড থেকে লুক্সেমবার্গ এবং সেখান থেকে বেলজিয়ামের সীমান্ত ধ'রে একেবারে উত্তর সাগর পর্য্যন্ত এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রছে। এই দুর্গ প্রাকারটির পরিকল্পনা করেন সার্জ্জেন্ট্ ম্যাজিনো। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে ম্যাজিনো গুরুতর আহত হ'য়ে যখন হাসপাতালে প'ড়েছিলেন তখন তিনি দিবারাত্রি চিন্তা ক'রছিলেন কি করে ভবিষ্যৎ জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা যায়। এই চিন্তাই তাকে পরবর্ত্তীকালে ম্যাজিনো লাইনের পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে। ১৯২৯ সালে ম্যাজিনো যখন ফ্রান্সের যুদ্ধমন্ত্রী তখন আরম্ভ হয় এই দুর্গ নির্ম্মাণ— আর ১৯৩৪ সালে সমাপ্ত হয় এর নির্ম্মাণকার্য্য। সমাপ্তি কিন্তু ম্যাজিনো দেখে যেতে পারেন নি, কারণ ১৯৩২ সালে তিনি মারা যান।

ঠিক এরই অনুকরণে জার্মাণী গ'ড়ে তুলেছে তার সিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন—আর ফিনল্যাণ্ড গড়েছে তার ম্যানারহাইম লাইন। সিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন তৈরী হ'য়েছে বড় তাড়াতাড়িতে, মাত্র এক বৎসরে—তাই অনেকের ধারণা সিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন ততটা দুর্ভেদ্য হ'তে পারে নি যতটা দুর্ভেদ্য একে কল্পনা করা হয়।

সিগফ্রিড লাইনের সামনে কংক্রিটের স্তূপ

এই সব দুর্গ ক'রবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে তিন রকম। (১) দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করার ব্যয়সাধ্য প্রচেষ্টায় শত্রু সহজেই অগ্রসর হ'তে চাইবে না, (২) যদি বা করে তবুও হঠাৎ সে দেশের শিল্পকেন্দ্রগুলি নষ্ট ক'রতে পারবে না ও (৩) দুর্গ ভেঙ্গে ফেলতে যে সময় তার লাগবে তার মধ্যেই দেশের সৈন্যদলসমূহ তৈরী হ'য়ে শত্রুকে বাধা দিতে এগিয়ে আসবার অবকাশ পাবে।

এই ম্যাজিনো লাইন হ'চ্ছে ভূগর্ভে অবস্থিত একটা চ'ওড়া রিইনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীটের বাড়ী। এর বিরাটত্ব কতকটা অনুমান করা যেতে পারে এই থেকে যে

পনর হাজার লোক ছয় বৎসর অনবরত পরিশ্রম ক'রে একে তৈরী ক'রেছে—আর এর জন্য কম পক্ষে সোয়া লক্ষ টন মাটি খুঁড়তে হ'য়েছে এবং সাড়ে পনর লক্ষ টন কংক্রীট আর পঞ্চাশ হাজার টন ইস্পাত লেগেছে এ'টা গড়তে। ব্যয়ের অঙ্কও কিছু সামান্য নয়—ম্যাজিনো লাইন তৈরী ক'রতে ফ্রান্সের খরচ হয়েছে আটশ' কোটি টাকা।

কেল্লাগুলি র'য়েছে মাটির নীচে, উপর থেকে কিছুই দেখবার উপায় নাই ভিতরে কি আছে। শুধু মাঝে মাঝে মাটির উপর দেখা যায় গম্বুজের মত দু'চারিটি টিলা। টিলার মধ্যে রয়েছে দূরবীণ হাতে প্রহরীদল, দূরবীণগুলিও যাতে শত্রুর আক্রমণে ভেঙ্গে না পড়ে তারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই সব দুর্গের সামনে অনেক দূর পর্যন্ত গেঁথে তোলা হ'য়েছে কংক্রীটের স্তম্ভ—যাতে অন্ততঃ বিনা বাধায় শত্রু এসে এর দোর গোড়ায় হানা দিতে না পারে।

যাতায়াতের জন্য লাইনের মধ্যে বিস্তীর্ণ রেল রাস্তা পাতা হয়েছে—আদেশ নির্দ্দেশ জানাবার জন্য ডবল টেলিফোনের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। নিত্যকার প্রয়োজনীয় বা যুদ্ধের সময় দরকার হয় এমন সব কিছুই ভূগর্ভের এই সব বিরাট দুর্গে রাখা হ'য়েছে। অর্থাৎ শত্রু যদি মাসের পর মাস দুর্গ অবরোধ ক'রে ব'সে থাকে তবুও বাহিরের কোন সাহায্য না পেলেও দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যশ্রেণী অক্লেশে দীর্ঘদিন ধ'রে শত্রুকে বাধা দিতে পারবে। এ যেন পাতালপুরীর একটা বিরাট শহর। শুধু যে বাইরে থেকে রসদপত্র অস্ত্রশস্ত্র এনে এতে পূরে রাখা হয় তা নয়, অবরোধ হ'লে যাতে দরকারমত সব কিছু এখানেই তৈরী ক'রে নিতে পারা যায় তার ব্যবস্থাও এখানে রাখা হ'য়েছে।

ম্যাজিনো লাইন কিন্তু একটা মাত্র কেল্লা নয়, ছোট ছোট অনেকগুলি দুর্গের সমষ্টি। প্রত্যেকটি দুর্গ গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের মধ্যে সব রকম সংযোগ র'য়েছে—তবুও তারা মোটের উপর পরস্পর নির্ভরশীল নয়। হঠাৎ কোন কারণে একটা দুর্গের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার কিছু গোলমাল ঘটলে যাতে সমস্ত ম্যাজিনো লাইনের কাজ অচল হ'য়ে না পড়ে তার জন্যই করা হ'য়েছে এই ব্যবস্থা।

ম্যাজিনো লাইন আর সিগ্‌ফ্রিড্‌ লাইন দুটাই আগাগোড়া গ্যাস-প্রতিরোধক ক'রে তৈরী করা হ'য়েছে। বোমা দিয়ে বা কামান দিয়ে দুর্গ ভাঙ্গতে না পেরে শত্রু যদি গ্যাস ঢেলে সৈন্যদলকে মেরে ফেলতে পারে, তবে এই সব লাইন থেকেও কোন লাভ নেই—তাই এদিকে প্রথমাবধিই যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হ'য়েছে।

ম্যাজিনো লাইনের প্রাচীর সব জায়গায় সমান পুরু করা হয় নাই। যে সব জায়গায় শত্রুর গোলাগুলির আক্রমণ বেশী হবার সম্ভাবনা সেখানে প্রাচীর দশ ফুট পর্য্যন্ত পুরু করা হ'য়েছে। প্রথমতঃ কংক্রীটের একটা প্রাচীর গেঁথে নিয়ে তাতে কামান দেগে বোমা মেরে পরীক্ষা করা হ'য়েছে কতটা পুরু হ'লে তবে শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত ক'রতে পারে। তার পর এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে তৈরী করা হ'য়েছে এই ম্যাজিনো লাইন।

এই ম্যাজিনো লাইনের সামরিক সংহতি, সৈন্যসম্ভার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ কেন যে শোচনীয় পরাজয় বরণ ক'রে নিতে বাধ্য হ'ল এখানে তার কারণ সম্বন্ধে দুএকটা কথা আলোচনা করা হয়ত অসঙ্গত হবে না। জার্ম্মাণী যুদ্ধ আরম্ভ করবার পূর্ব্বেই সংবাদ পেয়েছিল ম্যাজিনো লাইনের দুর্ব্বলতা কোথায়—এবং ঠিক সেইখানেই সে চালিয়েছিল তার প্রচণ্ডতম আক্রমণ। সেডানের নিকটে আছে আর্ডেনসের ঘন বন। বনই হবে শত্রুর অগ্রগমনে একটা স্বাভাবিক বাধা এই ভেবেই ম্যাজিনো লাইনের এই অংশ অপেক্ষাকৃত কম দুর্ভেদ্য করা হ'য়েছিল—আর শেষ পর্য্যন্ত এইখান দিয়েই জার্ম্মাণী ফ্রান্সে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল। সেডানের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে জার্ম্মাণী একদিনে পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রগমন ক'রে যান্ত্রিক বাহিনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রেকর্ড ক'রে রেখেছে।

জার্ম্মাণী যে ধারায় এবার আক্রমণ চালিয়েছিল সেটা নূতন নয়। ১৯১৪ সালের যুদ্ধে জার্ম্মাণ সেনাপতি ভন সাফেন্ আক্রমণের এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং সেবারেও এই ধারায়ই আক্রমণ চালান হয়। এই আক্রমণের নাম বলা চলে "আবেষ্টনী আক্রমণ" (Enveloping attack), পর পর পাঁচটি

ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে জার্মাণীর আক্রমণের ধারা

আক্রমণকারী বাহিনীকে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সাজিয়ে নিয়ে দক্ষিণের তিনটি বাহিনী শত্রুর সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া হয়। শত্রু যখন এই তিনটি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে তখন উত্তর প্রান্তের বাহিনী দুটি ক্রমে এগিয়ে এসে শত্রু বাহিনীকে ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করে। সে যুদ্ধে জার্ম্মাণীর এই আক্রমণ প্রথা সফল হয় নাই এবং জগতে প্রথম যান্ত্রিক বাহিনীর প্রবর্ত্তন ক'রেও জার্ম্মাণ বাহিনীর সামান্য একটু দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ফ্রান্স জার্ম্মাণীর এই প্রথা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেয়।

দুইটি বাহিনী দিয়ে আবেষ্টন করাকে বলা যায় "ডবল আবেষ্টনী"। যদি আবেষ্টনী বাহিনীর একটি কোন কারণে ব্যর্থ হ'য়ে যায়, তখন দ্বিতীয় বাহিনী দিয়ে অনায়াসে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। বাহিনীর পঞ্চম অংশ সব সময় কিছু কাজে লাগান হয় না, শুধু সাজিয়ে রাখা যায় মাত্র।

প্রত্যেক দিন সকাল বেলায় প্রথমেই যাত্রা করত চারশ' থেকে পাঁচশ' খানা জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক। আর তাদের মাথার উপরে নীচু দিয়ে উড়ে চল্‌ত কতগুলি বিমান। ট্যাঙ্ক বাহিনীর পিছনে গাড়ীতে আসত জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী। দিনের পর দিন এই ভাবেই চলেছিল জার্ম্মাণীর ঝটিতি যুদ্ধ। (Lightning warfare) যাকে জার্ম্মাণ ভাষায় বলা হয় ব্লিৎস্‌ক্রিগ্ (blits-krieg)। জার্ম্মাণ বাহিনীর পুরোবর্ত্তী অংশ এমন ক্ষিপ্রগতিতে এবং অতর্কিতে এসে ফরাসী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছে যে পরবর্ত্তী ফরাসী বাহিনী তার কোন খবরই জান্‌তে পারেনি। যখন তারা নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে এই পুরোবর্ত্তী বাহিনীর উপর নির্ভর ক'রে বসেছিল, তখন জার্ম্মাণরা এসে তাদেরও করেছে আক্রমণ। বিস্মিত সৈন্যগণ বাধা দেওয়ার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণী তাদের নিরস্ত্র ও বন্দী ক'রবার সুযোগ পেয়েছে।

জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ড্ বেতারধ্বনি যন্ত্রের সাহায্যে আক্রমণকারী বাহিনীর প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। এইখানেই হল জার্ম্মাণ সমর পরিষদের সর্ব্বাধিক কৃতিত্ব।

সন্ধ্যার অন্ধকারে জার্ম্মাণ বাহিনীর অধিনায়ক যখন স্থির করলেন আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় তখন তিনি রেডিও যোগে সংবাদ পাঠালেন বার্লিনে সমর

পরিষদের দপ্তরে। সেখান থেকে বাহিনীর বিভিন্ন অংশের উপর হুকুম হ'ল—কোথায় তারা থাম্‌বে—কি অবস্থায় রাত্রে তারা থাক্‌বে, কখন তারা খাবে এবং পরদিন কি ভাবে কখন কি অবস্থায় পুনরায় তাদের যাত্রা আরম্ভ ক'র্‌তে হ'বে। এ হুকুম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হ'ল। এই ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে মাত্র এক মাসের মধ্যেই হিট্‌লারের জার্ম্মাণী নেপোলিয়নের ফ্রান্সকে আত্মসমর্পণে বাধ্য ক'রল।

বিস্ফোরক হোক অথবা বিষবাষ্প হোক, এগুলি ব্যবহারের অর্থ অল্প সময়ে অনেক বেশী শত্রু নিপাত করা—রণনীতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় আজকাল শুধু যে বিপক্ষ সৈন্যই হয় বিস্ফোরক বা বিষবাষ্পের লক্ষ্য তা নয়, নিরীহ নাগরিকগণেরও নিস্তার নাই এই মরণাস্ত্রগুলোর হাতে। বিস্ফোরকগুলো প্রায় সবগুলিই মূলতঃ এক—তা সে বিমান থেকেই ফেলা হোক অথবা স্থলযুদ্ধ বা জলযুদ্ধ যাতেই কেন না ব্যবহার করা হোক।

বিমান, মোটরলরী বা যুদ্ধজাহাজ এর কোনটাই সাক্ষাৎভাবে শত্রু নিধন করে না—এমনকি হাউইটজার, ট্যাঙ্ক, বন্দুক—এগুলোও না। শত্রুর মৃত্যুর জন্য এগুলোর দরকার নাই। এগুলোর দরকার, যা দিয়ে শত্রুকে মারা হবে সেইগুলি যথাসময়ে ও যথাস্থানে পৌঁছে দিতে। বাস্তবিকপক্ষে শত্রুকে মারতে হ'লে দরকার গোলাগুলি ও আজকের দিনের নূতন অস্ত্র বিষবাষ্প। ভবিষ্যতের যুদ্ধে আরও মারাত্মক জিনিষ যে ব্যবহার হবে তার কতকটা আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। এই মারাত্মক জিনিষটি হ'চ্ছে জীবাণু।

গোলাগুলি

প্রথমে আমরা আলোচনা করি গোলাগুলি ও এই জাতীয় বিস্ফোরক সম্বন্ধে। আজ পর্য্যন্ত মানুষ একের পর আর অনেক রকম বিস্ফোরকই আবিষ্কার ক'রেছে।

নূতনতর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে নিষ্ঠুরতর। কিন্তু মূল তত্ত্বের দিক থেকে দেখতে গেলে বিভিন্ন বিস্ফোরকের গোড়ার কথা একই। অল্প পরিমাণ কঠিন পদার্থ যখন আঘাতের ফলে অকস্মাৎ গরম হ'য়ে গ্যাস হ'য়ে যায়, তখন তাদের আয়তন অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়। সঙ্কীর্ণ স্থানে এই আয়তন বৃদ্ধি পেলে উদ্ভূত গ্যাস স্বভাবতঃই চাইবে ছড়িয়ে প'ড়তে এবং এরই ফলে ছুঁড়ে দেবে বড় বড় কামানের গোলাকে বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ, চাইকি একশ' মাইল দূরে। বারুদ জিনিষটায় থাকে গন্ধক, সোরা আর কয়লা, এর কোনটাই মারাত্মক নয়। মিশ্রিত অবস্থায় এরা এমন কিছু একটা বেশী আয়তন (volume) অধিকার ক'রে থাকে না। একটা বন্দুকের নলের মধ্যে সামান্য খানিকটা বারুদ রেখে যদি তাকে অকস্মাৎ গরম করে দেওয়া যায়, তবে তা গ্যাসে পরিণত হবে আর তার আয়তন হবে অন্ততঃপক্ষে হাজার গুণ বেশী।

বন্দুকের ঘোড়া টিপ্‌বার সাথে সাথেই গুলি ছোটে। কিন্তু এর মধ্যেই গুলির ভিতর ধাপে ধাপে অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটে যায়। গুলি, গোলা ও বোমা হঠাৎ যখন ফেটে যায়, তখন তার ইস্পাতের খোল এই চাপ সহ্য ক'রতে না পেরে যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে—আর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ভীষণ চাপের গ্যাস। এর ফলে চারপাশের বাতাসেও একটা ভীষণ চাপ পড়ে। সে চাপ যে কতটা তা কল্পনা করাও কঠিন। চাপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে এই থেকে যে একটা সাধারণ রাইফেলের গুলির উপরে চাপ পড়ে প্রায় দুই টন অর্থাৎ চুয়ান্ন মণ। সাধারণতঃ একটি মাঝারী ওজনের বোমা ফাটলে আশেপাশে প্রতি বর্গ ইঞ্চিস্থানে অর্থাৎ এক ইঞ্চি লম্বা আর এক ইঞ্চি চওড়া জায়গার উপর চাপ পড়ে কম্‌সে কম তিন হাজার মণের উপর। বোমার বা গোলার ঘায়ে দালান-কোঠা ভেঙ্গে পড়ে মানে সত্যিকারের ঘা না খেলেও এই চাপে ঘরবাড়ী যায় উড়ে। পৃথিবীতে এমন কয়টা ঘরবাড়ী আছে যা এই অপরিমিত চাপ সহ্য ক'রতে পারবে?

বিস্ফোরক

এবারে ব'লতে হয় বিস্ফোরকের কথা। বন্দুকের গুলিতে যেমন বিস্ফোরক থাকে কামানের গুলি বা শেলেও তেমনি থাকে বিস্ফোরকই। আবার বোমার

সাহায্যে অথবা বিমান যোগে। বিমান থেকে যদি লোকালয়ে গ্যাসের ধারা ছেড়ে দেওয়া যায় তবে ঈপ্সিত ফল হ'তে পারে না—কারণ উপর থেকে আসতে আসতে
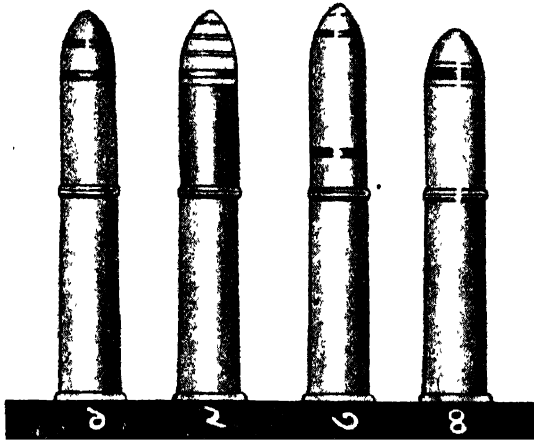
বিভিন্ন জাতীয় শেল
(১) স্মোক শেল (২) শ্রাপনেল শেল (৩) হাইএক্সপ্লোসিভ শেল (৪) আণ্টিট্যাঙ্ক শেল

বায়ুস্রোতে গ্যাস যাবে ভেসে—লোকালয় পর্যন্ত পৌছুবে কি না সন্দেহ। তাই বোমার মধ্যে এমন সব তরল বা বায়বীয় পদার্থ ভ'রে দেওয়া হয় যে মাটিতে এসে ফেটে গেলেই কাছাকাছি সমস্ত জায়গাটা বিষাক্ত গ্যাসে ভর্তি হ'য়ে যায়। এই গ্যাস বোমাগুলোর ওজন হ'তে পারে কুড়ি থেকে ছ'শ পাউণ্ড পর্যন্ত—যদিও আড়াই শ' পাউণ্ডের বোমাই বেশী ব্যবহার করা হয়। বাতাসের গতির ওপর গ্যাস বোমার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। গ্যাস্ আক্রমণ সেখানেই হয় সার্থক যেখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় পাচ মাইলের বেশী নয়। গ্যাসগুলি হ'তে পারে স্থায়ী (persistent) অথবা অস্থায়ী (non-persistent)। স্থায়ী গ্যাস সাধারণতঃ হয় তরল পদার্থ এবং তরল অবস্থায়ও যেমন বিপজ্জনক হয়—ধীরে ধীরে খোলা জায়গায়, গ্যাসে পরিণত হ'য়েও থাকে ঠিক তেমনিই বিপজ্জনক। অস্থায়ী গ্যাসগুলি গ্যাস অবস্থায়ই ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। যুদ্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি গ্যাসের গুণাগুণ বর্ণনা করা গেল।

	বিষ বাষ্পের রাসায়নিক নাম	স্থায়ী বা অস্থায়ী	শ্রেণী সংক্ষিপ্ত নাম	উপসর্গ	শ্রেণী
১।	ক্লোরো অ্যাসিটো ফিনোন	অস্থায়ী	সি এ. পি (C. A. P.)	এই গ্যাস লাগবামাত্র চোখে ব্যথা হয় ; অঝোরে জল পড়তে থাকে ; চোখের পাতা নাচতে থাকে আর নরম চামড়া এই গ্যাসে আক্রান্ত হ'লে জলতে আরম্ভ করে।	
২।	ইথাইল আয়ডো এ্যাসিটেট্	স্থায়ী	কে এস্ কে. (K. S. K.)	এর কাজও 'সি এ. পির'. মতই। অধিক মাত্রায় শুঁকলে ফুসফুসে প্রদাহ হয়।	কাঁদুনে গ্যাস
৩।	ব্রোমো বেনজাইল সায়ানাইড	ঐ	বি বি সি (B. B. C.)	ঐ	
৪।	ডাই ফিনাইল ক্লোরো আর্সাইন	অস্থায়ী	ডি. এ (D. A.)	এগুলি সেঁকো বিষ বা আর্সেনিক ঘটিত যৌগিক। শুঁকবার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে আক্রান্ত ব্যক্তি হাঁচতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় তার বুকের, গলার, মুখের ও নাকের ব্যথা। এই গ্যাসে আক্রান্ত ব্যক্তির মন অবসাদগ্রস্ত ও বিষাদময় হ'য়ে পড়ে।	
৫।	ডাই ফিনাইল এ্যামিন ক্লোরো আর্সাইন	ঐ	ডি এম্. (D. M.)		নাসা প্রদাহী
৬।	ডাই ফিনাইল সায়ানো আর্সাইন	ঐ	ডি সি. (D. C.)		
৭।	ক্লোরিন (Chlorine)	ঐ	...	এই গ্যাস অতি বিষাক্ত, প্রথমতঃ চোখ, নাক, গলা জ্বলে যেতে আরম্ভ করে, তারপর নিশ্বাস নিতে অসহ্য কষ্ট হয়। প্রতি মুহূর্তে মনে হ'তে থাকে দম বন্ধ হ'য়ে এই বুঝি মৃত্যু হ'ল।	
৮।	ফস্জিন (Phosgene)	ঐ		ক্লোরিনের চেয়ে দশগুণ বেশী বিষাক্ত। এতে চোখ, নাক, গলা অবশ্য খুব বেশী জ্বলে না।	ফুসফুস্ প্রদাহী

আর্সেনিউরেটেড হাইড্রোজেন	অস্থায়ী	আর্সাইন	আক্রান্ত ব্যক্তি বারম্বার বমি ক'রতে থাকে—এবং তার রক্ত দূষিত হ'য়ে যায়।	রক্ত পচনকারী
ডাইক্লোরো ডাই ইথাইল সালফাইড	স্থায়ী	মাষ্টাড গ্যাস	এই গ্যাসের ফলাফল বোঝা যায় অনেক পরে—সাধারণতঃ দুই থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পরে। এই হিসাবে এ অতি মারাত্মক। শরীরের কোন অংশে অল্প পরিমাণে লাগলে, ফল না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বোঝা যায় না। এই গ্যাসে শরীরে ফোস্কা পড়ে, ফুস্ফুসে যন্ত্রণা হয়, চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যায়। কোন খাদ্যের সঙ্গে পেটে গেলে পাকস্থলী একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, ফুস্ফুসে ঢুকলে প্রথমতঃ কাশি হয়, পরে ব্রঙ্কাইটিস দেখা দেয় এবং শেষ পর্য্যন্ত চিরকালের জন্য স্বর বন্ধ হ'য়ে যায়।	ফোস্কা গ্যাস
ক্লোরো ভিনাইল ডাই-ক্লোর-আর্সাইন	ঐ	লিউসাইট্	মাষ্টার্ড গ্যাস অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে এর ফলাফল বোঝা যায়। প্রথমেই নাসিকায় প্রদাহ ঘটে ব'লে এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কতকটা সম্ভাবনা আছে। চোখে লাগবা মাত্র চোখ অন্ধ হ'য়ে যায় এবং চামড়ায় লাগবার এক মিনিটের মধ্যে সেখানে লাল রংএর ফোস্কা দেখা দেয়—এই সব ফোস্কার মধ্যে আর্সেনিক ঘটিত জল বা পূঁজ দেখা যায় এবং ঘা সারতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে। ঔষধ দিয়ে সমস্ত আর্সেনিক বের ক'রে না দেওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ঘা সারে না।	

জীবাণু-যুদ্ধ

ভবিষ্যতে জীবাণু-যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে একথা এখানে বলা চলে। যদি বাস্তবিকই এই রকম কিছু ঘটে তবে মানব-সভ্যতার পূর্ণচ্ছেদে যে বিলম্ব হবে না একথা নিশ্চিত ক'রে বলা যায়। ব্যাপারটা হবে হয়ত এই— বোমার খোলে মারাত্মক কোন ব্যাধির জীবাণু পূরে—হ'ক না কেন প্লেগ—হ'ক না কেন বসন্ত —হ'ক না কেন ইয়োলো ফিবার—ফেলা হ'বে শত্রু-পুরীতে। আমরা আশা অবশ্যই ক'রতে পারি যে এই জীবাণু আক্রমণের প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক যথাসময়ে আবিষ্কৃত হবে। তবুও এই আক্রমণ মানুষের উপর মানুষের নিষ্ঠুরতম আক্রমণ বলে ঘৃণা ক'রতেই হবে। কেন না উপযুক্ত প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হ'লেও গ্যাস আক্রমণের চাইতে জীবাণু আক্রমণ অনেক বেশী মারাত্মক হ'তে বাধ্য। প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক যদি হঠাৎ কার্য্যকরী না হয়, তবে গ্যাস আক্রমণে ম'রবে একজন লোক, কিন্তু জীবাণু দ্বারা একদল আক্রান্ত হলে যে বিষ সে ছড়িয়ে যাবে তাতে থাকবে অনেক লোকের মরণের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান যুদ্ধের সূচনাতেই হিটলার সমস্ত সভ্যজগৎকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন এই কথা ব'লে যে দরকার হ'লে জীবাণু-আক্রমণ ক'রতে জার্ম্মাণী পিছপা হবে না, মানবতার দোহাই দিয়ে হিটলারের জীবাণু-আক্রমণ ঠেকানো যাবে না—একথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। এতে ফল কি হবে তা ভবিতব্যই জানেন—তবে যা হ'তে পারে তা হচ্ছে এই যে, মানুষের সভ্যতা ও সমাজ যাবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে।

আক্রমণের বিভিন্ন প্রথা সম্বন্ধে কিছু ধারণা হ'লে যে প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে তা হ'চ্ছে এই যে এর প্রতিকারের উপায় কি? আক্রমণের যেমন নূতন নূতন রীতির প্রচলন হ'চ্ছে তার হাত থেকে বাঁচবারও ঠিক তেমনিই নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'চ্ছে। এই সব আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় গুলিকে দুই পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্য্যায়ে পড়ে সেই সব ব্যবস্থা যা নাকি ধাপ্পা দিয়ে শত্রুকে দূরে রাখার জন্য অবলম্বন করা হয়। এ ছাড়া ধাপ্পায় না ভুলে শত্রু যদি সত্যি সত্যিই আক্রমণ চালায় তবে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার অথবা তার অগ্রগতি বন্ধ করবার জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হ'য়েছে সে গুলিকে ফেলা হয় দ্বিতীয় পর্য্যায়ে।

ধাপ্পা বা কামোফ্লেজ

প্রথমে ধরা যাক শত্রুকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ধাপ্পা দেওয়ার রকম অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে হবে ভিন্ন ভিন্ন। কেননা লক্ষ্য বস্তুর আকার, আয়তন, বৈশিষ্ট্য, আক্রমণের সম্ভাবনা ও তীব্রতার উপরই নির্ভর করে সব কিছু, সুতরাং দরকারমত ব্যবস্থা না ক'রলে চলবে কেন? কয়েকটা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের উদাহরণ নিয়ে জিনিষটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই দেখা যাক্ কোন একটা বিমান ঘাঁটির উপর শত্রুর আক্রমণের

সম্ভাবনা কতটুকু এবং এক্ষেত্রে শত্রুকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যই বা কি করা যায়। শত্রুপক্ষ প্রথম সুযোগেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'রবে এই সব বিমান ঘাঁটি-- যাতে ক'রে আকাশ বাহিনীর সব চাইতে বড় জিনিষ বিমান পোত, যা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ঘাঁটিতে মজুত র'য়েছে, তা নষ্ট হবে; বৈমানিকদের রসদপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অব্যবহার্য্য হবে, তাদের সমস্ত ব্যবস্থা যাবে একদম ওলট পালট হ'য়ে। আকাশ থেকে বিমান ঘাঁটির ঘরবাড়ীগুলি, প্রকাণ্ড মাঠ,—যার দরকার বিমান উঠাবার বা নামাবার জন্য—বিপক্ষ বৈমানিক স্পষ্ট দেখতে পাবেন, সুতরাং শত্রুকে ধাপ্পা দিতে হ'লে এমন ব্যবস্থা ক'রতে হবে যাতে এই সবগুলি আকাশচারী শত্রুর নজরে না পড়ে।

বিমান ঘাঁটির মাঠের উপর রাস্তা আর গাছ পাতা এঁকে রাখা হ'য়েছে

শুধু বিমান ঘাটি কেন—যেখানে বড় বড় দালান কোঠা র'য়েছে সেখানেও শত্রুর নজর পড়বে আগে। তাই দালানের ছাদ এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন রঙ্ দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে ওপর থেকে দেখলে সারবন্দী দালান মনে হবে,—এবরো খেবরো ঘর বাড়ী আর তার মধ্যে মধ্যে মাঠ। যাতে মাঠ দেখতে পেয়ে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে শত্রু বৈমানিক কোন ধারণা করতে না পারে, সেইজন্য বালি আর আলকাত্‌রা দিয়ে মাঠের বুকে নকল রাস্তা, আর সবুজ রঙ দিয়ে

আশে পাশে গাছ এঁকে রাখা হয়। বিমান ঘাটির প্রকাণ্ড মাঠ এই জন্যেই আকাশ থেকে দেখায় এক একটা ছোট ছোট গ্রামের মত।

ঘাঁটিতে এরোপ্লেনগুলো রাখা হয় ক্যানভাসের ঢাকনির মধ্যে আর তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয় গাছের ডালপালা।

ঘাঁটিতে বিমান রাখা হয় ক্যানভাসের ঢাকনির মধ্যে

ধাপ্পা দেওয়া জিনিষটা খুব সহজ নয়। এতে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির যথেষ্ট দরকার আছে। কারণ উভয় পক্ষই বিশেষরূপে জানে, ধাপ্পা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং সে জন্য উভয়েই প্রস্তুত থাকে। তাছাড়া শত্রুপক্ষের ক্যামেরা এক সময়ে মাত্র একটা ফটো নিয়েই বিপক্ষের আয়োজন সম্বন্ধে কোন ধারণা ক'রতে চায় না। ভিন্ন ভিন্ন দিনে, দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, নানা রকম কোণ থেকে, নানা রকম অবস্থায় প্রত্যেকটা জিনিষের অনেকগুলি ক'রে ফটো নেওয়া হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে কোন ধাপ্পাই কার্যকরী হবে না। তবে এ

কথাটা ঠিক যে সহজ এবং বেপরোয়া ধাপ্পা অনেক সময়ই জটিল ও ব্যাপক ধাপ্পার চাইতে বেশী কার্য্যকরী হয়।

সাদা কালা ডোরা কাটা পোষাক প'রে সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে।

আলো ছায়ার খেলা দিয়ে শত্রুকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়। যে সৈন্যদল বরফের উপর দিয়ে চ'লছে, তাকে সব সাদা পোষাক পরিয়ে দেওয়া হ'ল—যে সৈন্য সবুজ মাঠের ভিতর দিয়ে চ'লছে, তাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ল সব সবুজ উর্দ্দি—যারা গাছের উপর চড়ে ব'সে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে—তাদের

দেওয়া হ'ল সাদা কালোর ডোরা কাটা পোষাক—এমনি ক'রে পারিপার্শ্বিক রঙের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শত্রুকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

স্থল বাহিনী যখন এক স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করে তখন তা'দের অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র সব কিছুই শত্রু বিমানের লক্ষ্য থেকে লুকিয়ে রাখতে হয়। এই জন্যই অনেক সময় গাছ পাতা দিয়ে কামান বন্দুক ঢেকে দেওয়া হয়।

লতাপাতায় ঢেকে কামান স্থানান্তরিত করা হ'চ্ছে

এমন কি সৈনিকদিগের সঙ্গেও গাছের ডালপালা এমনভাবে দেওয়া হয় যে আকাশ থেকে দেখলে তাদেরকে দেখাবে গাছের মত।

সৈন্যদল যখন এগিয়ে যায় তখন শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য উপযুক্ত লোক রেখে যেতে হয় পথে। তা'দের হাতে থাকে টেলিফোন—এরই সাহায্যে পিছন থেকে তারা অগ্রগামী সৈন্যদলের সঙ্গে রাখে সংযোগ, কি ভাবে তারা তা রাখে, নীচের ছবিখানা দেখলেই সেটা বেশ বুঝ'তে পারা যাবে।

নকল জাহাজ ভাসিয়ে নকল পরিখায় নকল কামান পেতে শত্রুকে যে ধাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সে কথা অনেক আগেই ব'লেছি। খোলামাঠে

কোথাও কিছু নেই, এই নকল কামানগুলি ঠিক আসল কামানের মতই শব্দ করে, মধ্যে মধ্যে এর মুখে ঠিক আসল কামানের মতই দেখা যায় অগ্নিশিখা।

সৈনিকেরা লতাপাতা সঙ্গে নিয়ে চ'লেছে

এই ধাপ্পা দেওয়ার কাজে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ইংলণ্ড আর আমেরিকা। সেখানে বৈজ্ঞানিকভাবে এই সম্বন্ধে চর্চ্চা করা হ'য়ে থাকে। সম্প্রতি ইটালীও এদিকে বেশ খানিকটা বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিয়েছে : যাতে নকলকে কোন মতেই

নকল ব'লে চেনা না যায়—তার বিধিমত চেষ্টা করা হয় খুবই সাবধানে। কারণ মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যত সোজা—ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দেওয়া তা'র চাইতে অনেক কঠিন।

খড়ের ছাউনির ভিতর থেকে টেলিফোনে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে

এইবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা আলোচনা করি। ম্যাজিনো বা সিগফ্রিড লাইন অথবা আত্মরক্ষার জন্য এই রকমের সব দুর্গের কথা আগেই ব'লেছি—

সুতরাং এবারে এইসব দুর্গ ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য যে সব অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা আবিষ্কার হ'য়েছে সেইগুলির কথা বলি।

প্রথমেই ধরা যাক্ যাকে গোলাগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে সত্যিকার যুদ্ধ ক'রতে হয় তার কথা। গোলাগুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্য এরা মাথায় পরে ধার তোলা শিরস্ত্রাণ (helmet), বুকে পরে ব্রেষ্ট্ প্লেট (breast plate), আর শরীরের নীচের দিকটা রক্ষার জন্য ব্যবহার করে একরকম বিশেষ বর্ম্ম ইংরাজীতে যাকে বলা হয় থাইপিস্ (thigh piece)। এগুলি ব্যবহার করায় সৈন্যদলে মৃত্যুসংখ্যা গেছে বেশ কমে।

ব্যাপকভাবে আত্মরক্ষার যে সব ব্যবস্থা করা হ'য়েছে সেগুলি বেশ আশ্চর্য্যজনক। শত্রু যে যে দিক্ থেকে আসতে পারে ব'লে সন্দেহ করা হয়, সেই সেই দিকে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয় এমনভাবে যে শত্রু হঠাৎ এ'সে পড়লে খুব কম সংখ্যক লোক দিয়ে তাদের অনেক বেশী ক্ষতি করা যায়—এর জন্য পাহাড়ের বুকে যে সব গুহা আছে তার সাহায্য নেওয়া হয়। সমভূমির মধ্যে হঠাৎ যে সব টিলা বা একটু উঁচু জায়গা দেখা যায় সেগুলিও কাজে লাগান হয়—শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য। আত্মরক্ষায় শত্রুর গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় একথা বলাই বাহুল্য।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি সমুদ্রতীরের দেশগুলিতে আত্মরক্ষার জন্য অনেকগুলি খাল কেটে রাখা হ'য়েছে। শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য এই খালগুলি দরকার মত জলে ভর্ত্তি ক'রে দেবার ব্যবস্থা আছে। রুমানিয়ায় যথেষ্ট পেট্রল পাওয়া যায়, তাই সেখানে ব্যবস্থা করা হ'য়েছে যে দরকার মত পেট্রল দিয়ে খাল ভ'রে ফেলে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে শত্রুর অগ্রগতি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। পেট্রলের খালে আগুন দিলে যে লঙ্কাকাণ্ড হবে, সেই আগুনের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কে এগিয়ে আসতে সাহস করবে?

এর পর ব'লতে হয় কাঁটা তারের বেড়ার কথা। এগুলিও শুধু আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই ব্যবহার করা হয় এবং সৈন্যসজ্জার সম্মুখে ও পিছনে থেকে এরা শত্রুর পক্ষে বিশেষ বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

একদল সৈন্য যখন স্থলপথে সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তখন তাদের প্রধান লক্ষ্য হয় কোন দিক থেকে হঠাৎ শত্রু তাদের আক্রমণ না করে। শত্রু সৈন্য যাতে পিছন থেকে এসে বিপদ ঘটাতে না পারে, সেজন্য যে পথে পিছু হটা

কাঁটা তারের বেড়া

হ'য়েছে সে পথে মাটির নীচে মাইন পাতা হয়, এবং দরকার মত নকল গাছ তৈরী ক'রে তার মধ্যে মাইন ভরে রাখা হয়। শত্রু না জেনে যেই মাইনের উপর এসে প'ড়বে অমনিই হবে সর্ব্বনাশ। নকল গাছের ভিতরে যে মাইন

থাকে সেগুলি হয় নিয়ন্ত্রিত—অর্থাৎ দূরে নিরাপদ স্থানে ব'সে অপারেটার সময়মত কলটি টিপে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন করেন।
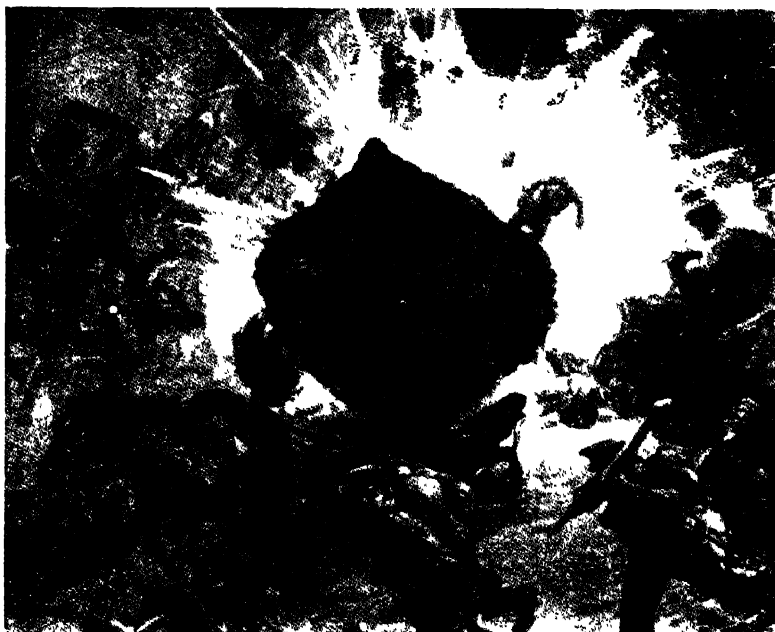
মাটির নীচে পাতা স্থল মাইনের বিস্ফোরণ

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের উপকূল ভাগে এমনিভাবে মাইন বসান হ'য়েছে, অবশ্য উপকূলের বাসিন্দাদের সব অন্যস্থানে নেওয়া হ'য়েছে সরিয়ে, কারণ তা না হ'লে যখন তখন হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটা কিছু আশ্চর্য্য নয়। এই ত' সেদিন লর্ড নর্থ উপকূলভাগে তার পল্লীগৃহে বেড়াতে যেয়ে অকস্মাৎ একটি ল্যাণ্ড-মাইনের বিস্ফোরণে জীবন দিয়েছেন।

শত্রুসৈন্যের অগ্রগতি বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে, পথে অনেক সময়ই হয়ত কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, অথবা মাঝে মাঝে নকল বনের সৃষ্টি ক'রে শত্রুর পথ বিঘ্নবহুল করে তোলা হয়। দু'চারটি নকল গাছ অথবা দু'চারটি আসল গাছ দাঁড় করিয়ে রেখেই এই নকল

বন তৈরী কিছু শেষ হয় না। নকল পশুপক্ষী পর্যন্ত এমন ভাবে এই বনের মধ্যে সাজিয়ে দেওয়া হয় যে বিমান থেকে ফটো নিলেও সেটাকে নকল বন ব'লে বোঝা যায় না। নকল বনের মধ্যে হয়ত একটা নেকড়ে বাঘের মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ল, তার পিঠের উপর হয়ত শিকারী পর্যন্ত বসিয়ে দেওয়া হ'ল—কে সন্দেহ করে—এটা আসল বন নয়? এই বনের উপযুক্ত স্থানগুলিতে বসান থাকে নানা রকম কামান, বন্দুক, কিন্তু এর উপরও দেওয়া হয় যোগ্য আবরণ।

নকল মধ্যে মাইন পাতা হ'য়েছে

আবার কোন কোন সময় হয়ত কংক্রীটের ছোট ছোট স্তম্ভ গেঁথে তুলে শত্রুর অগ্রগামী ট্যাঙ্কগুলোকে নাস্তানাবুদ করবার ব্যবস্থা করা হয়। ট্যাঙ্কের চাকায় যে দাঁত আছে—সেগুলো এই সব কংক্রীটের থামে আটকে যেয়ে অনেক সময়

নকল বন

নকল বনে নকল পশুর মূর্তি

ভেঙ্গে যেতে পারে। এতে কিন্তু শত্রুকে ঠেকান যায় না কোনমতেই, এতে যায় শুধু তাদের বিলম্ব ঘটান।

সমুদ্রের বুকেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন কিছু কম নয়। সাবমেরিন আবিষ্কারের ফলে আত্মরক্ষার আয়োজন করতে হ'য়েছে মানুষের আরও অনেকখানি ব্যাপক। এই সংশ্রবে বলা চলে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথমদিকে জার্ম্মাণ সাবমেরিনগুলির হাতে ইংরাজ, ফরাসী ও অন্যান্য জাতির মাল জাহাজ, যাত্রী জাহাজ এবং অন্যান্য জাহাজগুলো খুবই নাকাল হ'য়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।
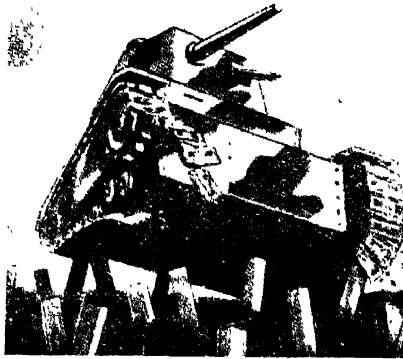
কংক্রীটের থাম গেঁথে ট্যাঙ্ক ঘায়েল করা

স্ফটিক স্বচ্ছ জলের নীচে যদি সাবমেরিন ডুব দেয়, আকাশে বিমান থেকে তা'কে স্পষ্ট দেখা যায়। দূর আকাশ থেকেই যখন দেখা যায়, তখন সমুদ্রে জাহাজ থেকে আরও ভাল দেখাবে নিশ্চয়ই—এই ভরসা নিয়ে কিন্তু কোন জাহাজের পক্ষে তাকে দেখতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। কেন না যে দেখতে যা'বে তাকে আর ফিরে আস্‌তে হ'বে না। টর্পেডো ছুঁড়ে শত্রু তাকে দেবে তখনই ঘায়েল ক'রে। ডুব দিয়ে সাবমেরিন চোখের দৃষ্টি এড়াতে পারে, কিন্তু জলের নীচে যেয়েও সে তার শব্দ বন্ধ ক'রতে পারবে না। যত আস্তেই মেশিন চলুক না কেন—শব্দ তার হবেই। এই শব্দ ধ'রবার জন্য আজকাল অনেক রকম শব্দগ্রাহীযন্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে—তা'দের অধিকাংশেরই কার্য্যপ্রণালী রাখা হয়েছে বিশেষ গোপনে। এই যন্ত্রগুলিকে বলা হয় ইকোমিটার্স (Echometers)।

বিমান থেকে জলের নীচে সাবমেরিন যেমন দেখায়

য়ের মুখ ম

ডেপ্‌থ-চার্জ্জের কথা আগেই ব'লেছি। একবার সাবমেরিনের অবস্থান টের পেলে ডেপ্‌থ-চার্জ্জ ছুঁড়ে তা'র সাবমেরিনলীলা ঘুচাতে কতক্ষণ ?

শত্রুজাহাজ নষ্ট করবার জন্যে জলের নীচে পেতে রাখা হয় লোহার জাল, আর তার গায়ে থাকে ছোট বড় অনেক রকম মাইন। সাধারণতঃ এই জাল পেতে রাখা হয় পোতাশ্রয়ের মুখে, আর নদী ও সাগর-সঙ্গমে। খানিকটা পথ অবশ্য খোলা থাকে, যাতে ক'রে নিজেদের জাহাজগুলো পথ জানা থাকায় স্বচ্ছন্দে আসা যাওয়া ক'রতে পারে।
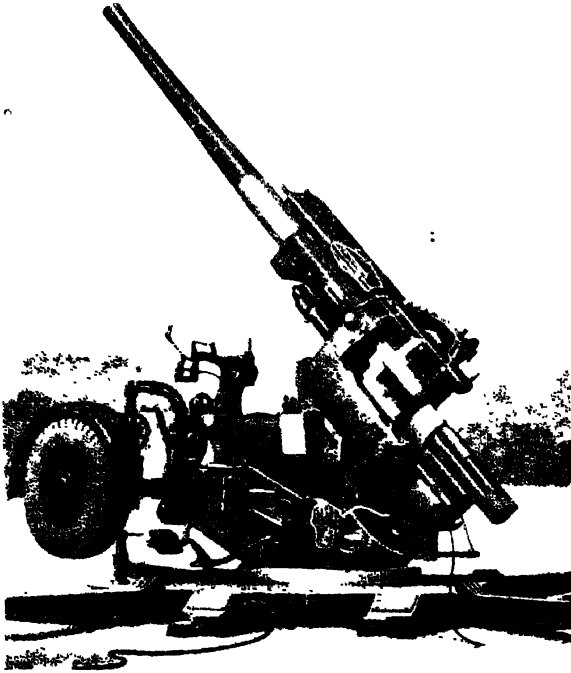
বিমানবিধ্বংসী কামান

বিমান আক্রমণের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি, এবং একথাও বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে জল বাহিনী ও স্থল বাহিনী নিরস্ত্র নাগরিকগণের উপর নির্ব্বিচারে কোন আক্রমণ না চালালেও, আকাশ বাহিনীর হাতে এদের নিস্তার নেই। আকাশ বাহিনীর এই বর্ব্বর ও ব্যাপক আক্রমণের হাত থেকে

আত্মরক্ষার জন্য আবিষ্কার হ'য়েছে বিমান-বিধ্বংসী কামান। এই কামানগুলি অনায়াসে প্রতি মিনিটে আটটি করে ছাপান্ন পাউণ্ডের গোলা ছুঁড়তে পারে এবং আটাশ পাউণ্ডের গোলা ব্যবহার করলে চল্লিশ হাজার ফুট পর্যন্ত হ'তে পারে তার পাল্লা। বিমান আক্রমণ হয় সাধারণতঃ অতর্কিত। এই বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো যাতে দু' এক মিনিটের মধ্যেই স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়—তার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। আজ পর্যন্ত যত রকম কামান আবিষ্কার করা হ'য়েছে, বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তা'র কোনটাই এই কামানগুলোর কাছে দাঁড়াতে পারে না। বিমান যত নিখুঁতই হোক, এর পাল্লায় পড়লে আর তার নিস্তার নাই।

বিমানগুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, আগে থেকে বিমানবিধ্বংসী কামানে গুলি ছুঁড়বার ব্যবস্থা না রাখলে তা'দের ঘায়েল করা কোনরকমেই সম্ভব হ'বে না। গুলি ছুঁড়বার আগেই বিমানগুলো যাবে পালিয়ে। আজকাল বিমানবিধ্বংসী কামানের কাছাকাছিই থাকে একরকম শব্দগ্রাহী যন্ত্র—যাতে করে বহুদূরে থাকতেই আক্রমণকারী বিমানের শব্দ ধরা যায়, এবং বুঝতে পারা যায় তার গতিবেগ। এগুলি যেন বিমানবিধ্বংসী কামানের কান। কানের কাজ শেষ
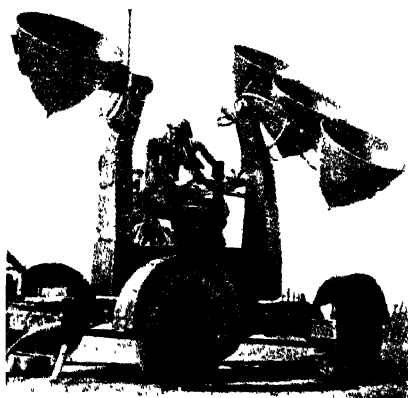
বিমান-শব্দগ্রাহী যন্ত্র

হ'লেই আরম্ভ হয় চোখের কাজ। বিমানবিধ্বংসী কামানের এই চোখগুলির ইংরাজী নাম প্রেডিক্টার (Predictor), বাংলায় আমরা বলতে পারি 'গণক', যন্ত্র।

গণনা করাই এদের কাজ ; একবার যদি শত্রুবিমানের দিকে এই গণকযন্ত্র ফিরিয়ে বিমানের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে যন্ত্র থেকে অতি সহজে এবং নিখুঁতভাবে জানা যাবে—কতটা উঁচু দিয়ে, কোন্ দিকে, শত্রুবিমান, কত জোরে, অগ্রসর হ'চ্ছে এবং ঠিক কোন্ দিকে কতটা কোণ ক'রে গুলি ছুঁড়লে বিমানের গায়ে লাগবে। ঠিক এই মুহূর্তে বিমানখানি কোথায় আছে—এর হিসাব না দিয়ে গণক যন্ত্র বলে দেয় গুলি করবার মুহূর্তে শত্রুবিমানখানি কোথায় থাকতে পারে।
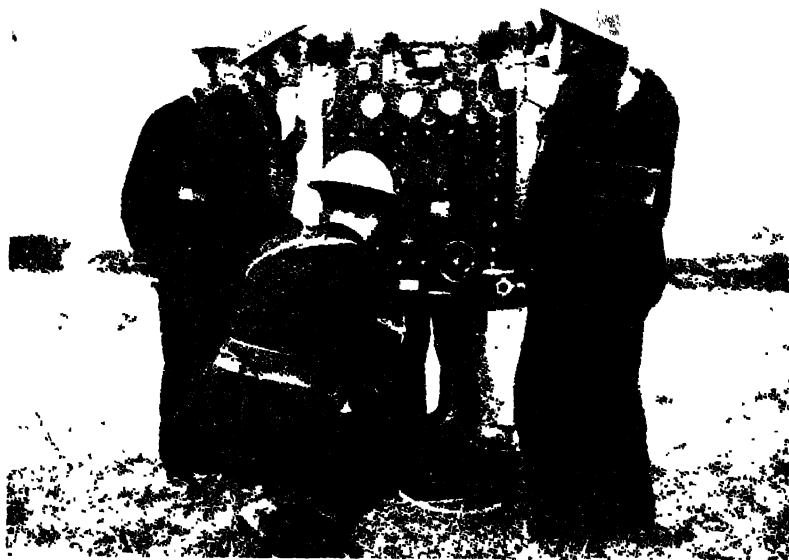
গণক যন্ত্র বা প্রেডিকটার

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শত্রু-বিমান এই গণক যন্ত্রকে ফাঁকি দেবার জন্যই আঁকাবাঁকা পথে উড়ে আসে, কিন্তু বোমা ফেলবার সময় স্থির হ'য়ে না দাঁড়ালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার তাদের ষোল আনা সম্ভাবনা। এই জন্যই সব সময়ই তাদের নিতে হয় খানিকটা ক'রে ঝুঁকি আর বিমান বিধ্বংসী কামানগুলির হ[illegible] একটু সুবিধা।

গণকযন্ত্রের প্রথম ব্যবহার হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধে, এবং আজকাল এগুলি চালাতে দরকার হয় দশজন লোকের। প্রতি আটটি বিমান বিধ্বংসী কামানের সঙ্গে এক জোড়া ক'রে গণক যন্ত্র ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে।

জলে, স্থলে, মাইন পেতে রেখে শত্রুকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা যে ভাবে করা হয় তা আগেই বলেছি। আকাশে এমন কিছু কি করা যায় না—যা' ঠিক জলমাইন কি স্থলমাইনের মত আকাশমাইনের কাজ ক'রবে? আত্মরক্ষার জন্য ব্রিটেন এমনিতর আকাশমাইন আবিষ্কার করেছে যা'র নাম দিয়েছে বেলুন ব্যারেজ (Balloon Parrage)। অনেকগুলি বেলুন প্রচণ্ড বিস্ফোরক পূর্ণ ক'রে উঁচু নীচু বিভিন্ন স্তরে বিমান আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হতে পারে—এমনি যায়গায় ছড়িয়ে রাখা হয়।

বেলুন ব্যারেজ
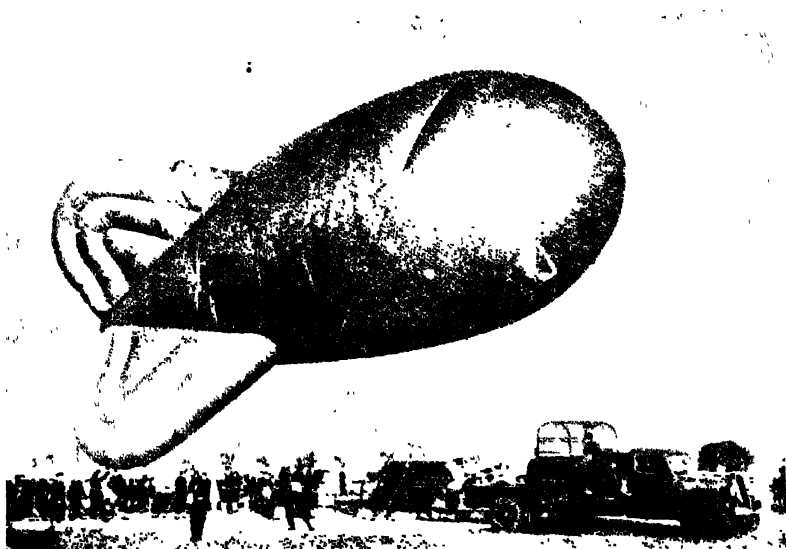
ঠিক কতটা উপরে বেলুন রাখলে সুবিধা হবে সেটা প্রথমেই অনুমান ক'রে নিয়ে, এইগুলিকে সরু তার দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। দশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচুতে অনেক সময় বেলুন বাঁধা হয়। দিনের আলোতে বিমান চালক

অবশ্য বেলুন স্পষ্ট দেখতে পান, কিন্তু পান না—যে তারের সঙ্গে সেগুলি থাকে সেইগুলিকে—আর লক্ষ্য বস্তুটিকে। তাই বিমানের ডানায় বেধে এগুলো যে কোন মুহূর্ত্তে যেতে পারে খুলে—আর বিমানের ঘটতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ। বেলুন ব্যারেজের অবস্থান দেখলে শত্রু বৈমানিক সকল সময়ই চেষ্টা করেন উপর দিয়ে উড়ে যাবার—এতে একদিকে তাদের বোমা নিক্ষেপ করা হয় কঠিন—আর অন্যদিকে বিমান বিধ্বংসী কামানগুলি চালানের হয় বিশেষ সুবিধা—কারণ শত্রু পাল্লার যতটা উপরে থাকবে এই কামানের গুলি হবে ততটা অব্যর্থ।

রাত্রির আকাশে চতুর্দ্দিক যখন থাকবে আঁধারে ঢাকা, তখন যাতে গোপনে শত্রু এসে অলক্ষ্যে তার আক্রমণ চালাতে না পারে এর জন্যও ব্যবস্থার ত্রুটী করা হয় না। চারিদিকে সার্চ্চ-লাইট বা সন্ধানী আলোক ফেলে রাত্রির আকাশকে রাখা হয় দিনের মত আলোকোজ্জ্বল করে। এই সন্ধানী আলোগুলি ইলেকট্রিক

খোলা জায়গায় মাঝে মাঝে কংক্রীটের বাধা গড়া হয়েছে

আর্ক (electric arc) এর সাহায্যে জ্বলে এবং এক একটা প্রায় আশী কোটি মোমবাতির সমান উজ্জ্বল হয়। এই আলোক রেখাকে ফাঁকি দিয়ে কে আসবে শত্রুপুরীর সিংহদ্বারে ?

কিন্তু সব রকম ব্যবস্থা সত্ত্বেও শত্রু যদি সত্যিসত্যিই এসে নামতে চেষ্টা করে বিমানযোগে তবে কি হবে—তারও ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। কোন বিমান যদি মাটিতে নামতে চায়, তবে তার দরকার অন্ততঃ দুই শত ফুট টানা মাঠ। এ না হ'লে বিমান মাটিতে কোন রকমেই নামতে পারে না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হ'য়েছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—সেখানে এক বিমান ঘাঁটি ছাড়া দু'শ' ফুট খোলা জায়গা কোথাও রাখা হয় নাই সব জায়গাতেই আবশ্যক মত তোলা হ'য়েছে কংক্রীটের থাম—উদ্দেশ্য যে এই সব বাধা ডিঙ্গিয়ে শত্রুবিমান যদি সৈন্য নিয়ে আসেই, তবুও তাদের ইংলণ্ডে নামা সম্ভব হবে না।

শ্বাসবহন-যন্ত্র-ধারী সৈনিক

গ্যাস-যুদ্ধের কথা আগে কিছু আলোচনা ক'রেছি। এবারে বলতে চাই কি ক'রে বিপক্ষের গ্যাস-আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। গ্যাস স্থায়ী কি অস্থায়ী—এর উপর আক্রান্ত ব্যক্তির আত্মরক্ষার ব্যবস্থা খানিকটা নির্ভর ক'রবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে সকলকেই প'রতে হবে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে এমন একটা বহিরাবরণ, যা'কে ভেদ ক'রে গ্যাস শরীরে প্রবেশ ক'রতে পারবে না। যা'তে নিশ্বাসের সঙ্গে কোন গ্যাস শরীরে ঢুকে বিপত্তি না ঘটায়, তার জন্য

ব্যবহার করা হয় বিশেষভাবে নির্মিত 'শ্বাসবাহী-যন্ত্র' (Respirator)। ক্ষেত্র-ভেদে তিন রকম 'শ্বাসবাহী-যন্ত্র' ব্যবহার করা হয়। সৈন্যদল, পুলিশ, কিংবা যাদের গ্যাসে আক্রান্ত স্থলে বেশী সময় থাকতে হ'তে পারে,—তারা ব্যবহার করে 'সার্ভিস্ রেস্পিরেটর' (Service Respirator)। গ্যাস্-আক্রমণের সময় যা'দের যুদ্ধ ছাড়া অন্য অনেক রকম কাজ আক্রান্ত স্থলে ক'রতে হ'তে পারে, তারা যে শ্বাসবহন-যন্ত্র ব্যবহার করে তাকে বলা হয় 'সিভিলিয়ান ডিউটি রেস্পিরেটর' (Civilian Duty Respirator)। গ্যাসে আক্রান্ত স্থান থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে যেতেও খানিকটা সময়ের দরকার। এই সময়টুকুর জন্য গ্যাস-আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য নাগরিকগণ যে শ্বাসবহন-যন্ত্র ব্যবহার করে তাকে বলা হয় 'সিভিলিয়ান রেস্পিরেটর' (Civilian Respirator)। বলা বাহুল্য এই তিনটি শ্বাসবহন-যন্ত্রেরই কার্য্য-প্রণালী একই ধরণের। এগুলি ওয়াটার-প্রুফ্ ক্যানভাসে তৈয়ারী, এবং একটি থলির ভিতর রেখে পিঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দরকার মত থলিটিকে বাঁকিয়ে সম্মুখে আনা হয়। শ্বাস-বহন-যন্ত্রের আছে তিনটি অংশ—প্রথম—মুখ ঢাকবার মুখোস; দ্বিতীয়—চোখ ঢাকবার গ্যাস-প্রতিরোধক চশমা এবং তৃতীয়—বায়ু-পরিষ্কারক প্রকোষ্ঠ ও বায়ুবাহী-নল। সাধরণতঃ বায়ু-পরিষ্কারক প্রকোষ্ঠে থাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত কয়লা। বিষাক্ত বাষ্প এই কয়লায় চুষে নেয়, বায়ুবাহী-নল দিয়ে যা' বেরিয়ে আসে সে হ'চ্ছে বিশুদ্ধ বায়ু। তাতে বিষের নামগন্ধও নাই।

আকাশ বাহিনী যখন নাগরিকগণের উপর বেপরোয়া বোমাবৃষ্টি করে, তখন এই নাগরিকেরা আত্মরক্ষার জন্য ছুটে যায় শেলটারগুলিতে এবং শত্রু যখন তার আক্রমণ শেষ ক'রে দেশে ফেরে তখন সঙ্কেতধ্বনি পেয়ে তারা বাইরে বেরিয়ে যে যার নিত্যকারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। নাগরিকগণের বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের যে ব্যাপক ব্যবস্থা ক'রতে হ'য়েছে সে সম্বন্ধে দু' চারটি কথা বলা যাক।

যুধ্যমান দেশগুলিতে বিমান আক্রমণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যকারের কথা। দিন নাই, রাত নাই লোকজন সব র'য়েছে সদা সন্ত্রস্ত—ঐ বুঝি বাঁশী বেজে উঠল

তাদের আত্মরক্ষায় সচেতন ক'রবার উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে লোকজন কেউই এতে অভ্যস্ত থাকে না, কাজে কাজেই তাড়াহুড়া ক'রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার থাকে প্রচুর সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যখন তখন এমনি আক্রমণ একেবারে গা সহা হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন লোকে শেলটারে ঢোকে সত্য সত্যই—অযথা ব্যস্ততা, অহেতুক ভয়, এসবও যে দেখা যায় না তা নয়—কিন্তু বিশৃঙ্খলা আর বড় একটা দেখা যায় না।

ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণের সময় সাধারণ নাগরিকেরা কি ভাবে কি করে তার একটা চিত্র এখানে দেওয়া যেতে পারে। নাগরিকগণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কত সুন্দর হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা যেতে পারে এই থেকে যে অনবরত প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও লণ্ডনের মত কর্ম্মব্যস্ত ও ঘনবসতিসম্পন্ন শহরে হতাহতের সংখ্যা এমন ভয়ানক কিছু হয় নাই। সুতরাং ইংলণ্ডের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা কি ভাবে কার্য্যকরী করা হয় সেকথা আলোচনা করা যাক।

স্বেচ্ছাসেবক

ইংলণ্ডে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে তার জন্য দায়ী জনসাধারণের সাহস, কর্ত্তব্যবোধ আর সেবাপ্রবৃত্তি। প্রথমেই এই কথাটা উল্লেখ করা দরকার যে এই সব স্বেচ্ছাসেবকরা কেউ বা ব্যবসায়ী, কেউ বা চাকুরীজীবী, কেউ বা আবার পরিচারক মাত্র। দেশের উপর যখনই শত্রু বিমানের আনাগোনা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল, যখনই বোঝা গেল শত্রু নিরীহ নাগরিকগণের উপরও প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবে,—এমন সম্ভাবনা আছে, তখনই অতি সাধারণ লোক পর্য্যন্ত এগিয়ে এ'ল বিপদের দিনে তার প্রতিবেশীকে সাহায্য ক'রতে। এর জন্য ইংলণ্ডে কোন আইনও পাশ ক'রতে হয় নাই বা কর্ত্তৃপক্ষের দিক থেকে কোন চাপও ইংরাজজনসাধারণের উপর দেওয়া হয় নাই। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে প্রতি একশ' জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে সাঁইত্রিশ জন এসেছেন নিছক সেবাপ্রবৃত্তির বশে, আর ঊনত্রিশ জন এসেছেন স্বেচ্ছাসেবক হওয়া কর্ত্তব্য মনে ক'রে। এটা ঠিক কিন্তু দেশপ্রেম নয়—এই সব লোক যদি অন্য দেশেও থাকতেন তবুও তারা এ কাজ করতেন আনন্দের সঙ্গেই। নিছক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ কাজ বরণ ক'রে

নিয়েছেন মাত্র পনর জন; একটা নূতন কিছু শিখতে পারা যাবে ব'লে ছয় জন, আর অন্য কিছু ক'রবার নাই ব'লে এ কাজ ক'রতে এসেছেন শতকরা পাঁচজন মাত্র। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রতে এদিকে তৎপর হ'য়েছেন শতকরা দু'জন, উপরওয়ালার চাপে এসেছেন শতকরা একজন মাত্র।

এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের নানা রকম কাজই ক'রতে হয়। হাতিয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব সৈনিক যুদ্ধ ক'রে এরা কিছু তাদের চাইতে কম কাজ করে না—যদিও এদের কাজের সত্যিকারের মূল্য দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলি কামান বন্দুকের শব্দের মধ্যে এগিয়ে যায়, তাদের থাকে একটা উন্মাদনা, তারা যেমন প্রাণ দেয় তেমনই প্রাণ তারা নিতেও পারে—অন্ততঃ সে চেষ্টা তারা করে; কিন্তু এই সব নাগরিক স্বেচ্ছাসেবককে শুধু ব্যস্ত থাকতে হয় আত্মরক্ষায়, আক্রমণ ক'রবার তাদের কোন সুযোগ থাকে না। তাই এদের কাজ স্বভাবতঃই হ'য়ে পড়ে একেবারেই উন্মাদনাবিহীন—অতি সাধারণ। দিন নেই, রাত নেই যখন তখন এই ধরণের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে ক'রে যাওয়া কত কষ্টকর এবং এতে কতটা ধৈর্য্যের দরকার একটু ভাবলেই তা বেশ বোঝা যায়।

বিমান-আক্রমণে প্রাথমিক সঙ্কেত

অনেক আগে থাকতেই যাতে ভবিষ্যৎ বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া যায়, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। 'অবজারভার কোর' (Observer Corps) বা নিরীক্ষণ বাহিনী শব্দগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে অনেক আগেই বুঝতে পারে শত্রু বিমান আসছে কিনা এবং এলেও কোন দিক থেকে, কত জোরে, কোন দিকে এগুচ্ছে। তাদের কাজ এই সংবাদ সংগ্রহ করা—এবং শত্রুবিমানের আগমন সংবাদ যথাসময়ে পাবার জন্যই চব্বিশ ঘণ্টাই তারা তৈরী হ'য়ে র'য়েছে। এরা সবাই পুরাদস্তুর সৈনিক অর্থাৎ সৈন্য বাহিনীতে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত, বাহিনীভুক্ত লোক—স্বেচ্ছাসেবক নয়। সমুদ্রতীরে, পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়, ছোট ছোট কুটিরে এরা নিজ নিজ যন্ত্র নিয়ে অষ্টপ্রহর ব'সে আছে। ঝড়-বাদল, রোদ-বৃষ্টি, আলো-আঁধার কোন কিছুতেই তারা তাদের ঘাঁটি ছাড়বে না—কেননা শত্রু কখন আসবে এবং কোন্ দিক থেকে আসবে তার কিছুরই

ত ঠিক নাই! শত্রুবিমান হয়ত উত্তর পশ্চিম দিক্ থেকে আসছে, শব্দগ্রাহী যন্ত্রে সংবাদ পেয়েই নিরীক্ষণ-মঞ্চ থেকে একজন কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিফোন ক'রলে, "উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শত্রুবিমান এগিয়ে আসছে।" তারপরই হয়ত আর এক মঞ্চ থেকে ফের সংবাদ এ'ল "উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শত্রুবিমান এগিয়ে আসছে।" তারপরই আর একজন—আরও একজন—এমনি ক'রে হ'য়ত দু' মিনিটের মধ্যেই অনেকগুলি মঞ্চ থেকে সংবাদ এসে গেল। "শত্রু আসছে।" এই কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন 'ফাইটার কম্যাণ্ড' (Fighter Command) এবং এরাই হ'চ্ছেন ব'লতে গেলে সমস্ত আকাশ বাহিনীর মাথা। নীরিক্ষণ-মঞ্চ থেকে ফাইটার কম্যাণ্ডের দপ্তরে সংবাদ পৌঁছাতে দু' এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না কিন্তু। ক্ষিপ্রগতিতে যে আক্রমণ চলে সে আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে হ'লে দরকার ক্ষিপ্রতর আয়োজন—তাই সময় নষ্ট করা সম্ভব নয় কোন মতেই।

ফাইটার কম্যাণ্ডের দপ্তরে একটা ঘরে থাকে অনেক রকম মানচিত্র ছড়ান। দূরে শত্রুবিমানের আগমন সংবাদ জানতে পারলে তৎক্ষণাৎ এই ম্যাপ-ঘরে সে সংবাদ পাঠান হয় এবং সেখানে বিস্তৃত ম্যাপের উপর নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই সব সংবাদগুলি নিশানের সাহায্যে এঁকে রাখা হয়। এই ম্যাপ-ঘরে র'য়েছে প্রত্যেকখানা জঙ্গী বিমান ও বিমানধ্বংসী কামানের অবস্থানের ম্যাপ। কোন জঙ্গী বিমানখানা কখন কোথায়, কি অবস্থায় আছে তা জানতে যাতে একটুও অসুবিধা বা দেরী না হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। কারণ শত্রুবিমান আসছে এই সংবাদ পাবামাত্রই ফাইটার কম্যাণ্ড থেকে আদেশ জারী করা হয় জঙ্গী-বিমান ও বিমান বিধ্বংসী কামানগুলির উপর। শত্রু দেশের সীমানার মধ্যে পৌঁছাবার পূর্ব্বেই জঙ্গী বিমানগুলি উড়ে যেয়ে তাকে আক্রমণ ক'রে পরাস্ত ক'রতে পারলে, শেষ পর্যান্ত হয়ত শত্রুপক্ষের বোমারুগুলো ফিরে যেতে বাধ্য হ'বে। ফাইটার কম্যাণ্ডই বিমানবিধ্বংসী কামানগুলির উপরও হুকুম জারী করে—কখন তাদের শত্রুর উপর ক'রতে হবে গোলাবৃষ্টি।

নাগরিকগণকে সতর্ক করা হবে কি না এটা ঠিক করবার ভারও এই ফাইটার কম্যাণ্ডের উপর। একটা বাঁশী আওয়াজ ক'রে যখন তখন সাধারণ নাগরিকদের

নিত্য নৈমিত্তিক কাজ-কারবার বন্ধ ক'রে দেওয়া কিছু সহজও নয়—সুবিধারও নয়, তাই সহসা কারণে অকারণে সঙ্কেতধ্বনি করা হয় না। ফাইটার কম্যাণ্ড যখনই বুঝতে পারে যে জঙ্গী বিমানের সঙ্গে লড়াই হ'লেও শত্রুর বোমারু বিমানগুলির পক্ষে দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে—সে সম্ভাবনা যত কমই হোক না কেন—তখনই তারা নাগরিকগণকে সতর্ক ক'রে দেবার ব্যবস্থা করে।

কি ভাবে নাগরিকগণকে সতর্ক করা হয় এবারে তাই বলি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শত্রু আসছে—এ কথাটা আগে জানতে পারলেও শত্রুর লক্ষ্যবস্তু কি হবে সেটা কিছু আগে জানা সম্ভব নয়। তাই ফাইটার কম্যাণ্ডকে প্রথম দিকে একটু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রতে হয়ই। এবং 'শত্রু আসতে পারে তোমরা প্রস্তুত থাক' এ সংবাদটা ব্যাপকভাবে সব কর্ম্মকেন্দ্রেই জানিয়ে দেওয়া হয়। এই সংবাদটা একেবারেই প্রাথমিক, এবং ঠিক নাগরিকগণের জন্য নয়। যারা আক্রমণের সময় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে, আর গভর্ণমেণ্টের কয়েকটি বিশেষ বিভাগ—যথা, পুলিশ, দমকল, হাসপাতাল ইত্যাদি এক কথায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যাদের ছোট বড় কোন না কোন কাজ ক'রতে হয়—তাদেরই জন্য দেওয়া হয় এই সংবাদ। ফাইটার কম্যাণ্ড সংবাদ দেন পাঠিয়ে জেনারেল পোষ্ট আফিসে, এবং সেখান থেকে টেলিফোনযোগে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয় পুলিশের বড-কর্ত্তার দপ্তরে আর বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় আফিসে। এই সময়ে পথে যেখানে আলো দিয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেখানে একটা ক'রে হ'লদে রংএর আলো জ্ব'লে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবকরা এই হ'লদে আলো দেখতে পেলেই বুঝতে পারে অচিরেই বিমান আক্রমণ ঘটবার সম্ভাবনা আছে এবং নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে যেয়ে কর্ত্তব্যপালন ক'রবার জন্য তারা তৈরী হয়।

পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ জেনারেল পোষ্ট অফিস থেকে সতর্কতা সূচক সংবাদ পাবামাত্রই সে খবর নিজেদের অধীনস্থ ঘাঁটিগুলিতে আর দমকলের আফিসে পাঠিয়ে দেন। এই সব পুলিশ ঘাঁটিগুলিতে আছে 'সাইরেন' বা বাঁশী। সত্যিকারের বিমান-আক্রমণের সময় দমকলগুলির কাজ ভয়ানক কঠিন হ'য়ে

প'ড়তে পারে। এক একখানা বোমারু বিমানে কম সে কম এক হাজার আগুনে বোমা থাকতে পারে এবং শত্রু যদি সেগুলি যেমন তেমন ভাবেও ছড়িয়ে যায় তা হ'লে এক সঙ্গেই অন্ততঃ হাজার জায়গায় আগুন লেগে যেতে পারে। যদি কুড়িখানা বিমানের একটা বহর এসে আক্রমণ চালায় তবে ত কুড়ি হাজার জায়গায় একসঙ্গে আগুন ছড়িয়ে যাবে। সে যে কী ভীষণ লঙ্কাকাণ্ড তা কল্পনা করা নিশ্চয়ই কঠিন নয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে একখানা বোমারু যদি চলতি পথে 'আগুনে বোমা' ছড়িয়ে যেতে থাকে, তবে একশ' গজ পর পর কম পক্ষে চার শ' ফুট জায়গায় বিস্তৃত অন্ততঃ দশ পনরটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠ্‌তে পারে। এই জন্যই এক একখানা দমকল অনেক জায়গার উপরই নজর রাখে।

এ. আর. পি. আফিস

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় আফিসকে সংক্ষেপে বলা হয় 'এ. আর. পি.' আফিস। বিমান-আক্রমণের সময় ক্ষতি যাতে কম হয়, আক্রমণ-শেষে ধ্বংসস্তূপ যাতে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা যায়, হতাহতগণের চিকিৎসায় যাতে কোন বিলম্ব না হয়, নাগরিকগণ যাতে ঠিক সময় মত এসে শেলটারগুলিতে আশ্রয় নিতে পারে, আর অযথা ভয়ে যাতে কেউ কোন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হ'চ্ছে 'এ আর পি.' স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ।

বিপদের প্রাথমিক সঙ্কেত পাওয়ার পর এই 'এ আর. পি.' আফিসে কি ধারায় কাজ চ'লতে থাকে তার একটা সুন্দর ছবি এখানে দেওয়া যেতে পারে। আফিসের কর্তা যেই "সাজ-সাজ" সঙ্কেত পেলেন অমনি বোতাম টিপে নিজের অধীনস্থ লোকদের সে কথা দিলেন জানিয়ে। বোতাম টিপতেই সমস্ত বাড়ীখানার প্রত্যেকটা ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠল—যারা ব'সে ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল, যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা বিছানা ছেড়ে তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়াল—একটা মিনিট দেরী না ক'রে যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজে লেগে গেল। যারা পথের লোকজন, যান বাহন নিয়ন্ত্রণ ক'রবে তারা এসে যে যার আস্তানায় স্থির হ'য়ে দাঁড়াল—যারা আক্রমণের সময় হতাহতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজের ভার পেয়েছে তারা গাড়ীতে চেপে

ব'সল ছুটে বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে। আফিসের কণ্ট্রোল ঘরে (যে ঘর থেকে সমস্ত কাজ করা হয় তাকে বলা যেতে পারে কণ্ট্রোল ঘর) থাকে অনেকগুলি টেলিফোন। ঘণ্টা বাজতেই টেলিফোনগুলিতে এসে একে একে কর্ম্মীরা সব ব'সে গেল। এই সব টেলিফোনের কোনটা বা শহরের জল সরবরাহের, কোনটা বিদ্যুৎ সরবরাহের, কোনটা গ্যাসের, কোনটা আবার টেলিফোন লাইনের কর্ম্মীদের সমস্ত খবর দেওয়া নেওয়ার কাজ করে। এক একটা বিভাগের এক একটা টেলিফোন। প্রত্যেক মিনিটে সহরের নানা অংশ থেকে প্রত্যেক বিভাগের লোক তাদের পক্ষে জরুরী খবর কেন্দ্রীয় আফিসে পাঠাচ্ছে—আর দরকার মত সেখান থেকে যাচ্ছে তাদের উপর যত কিছু উপদেশ, নির্দ্দেশ। টেলিফোনে যারা কাজ ক'রছে তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে একটা ক'রে খোলা নোট বুক। জরুরী খবর পেলেই তারা সেটা এই নোট বুকে লিখে তখন তখনই সেটা উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কাছে পাঠাচ্ছে এবং সেটা দেখে তিনি তখন তখনই তাকে আদেশ লিখে দিচ্ছেন। এই সব লেখা লেখির ব্যাপারে কিন্তু সময় নষ্ট করা হয় না মোটেই। এই কণ্ট্রোল ঘরে সব বিভাগের প্রতিনিধিই র'য়েছেন, এবং টেলিফোন যোগে যে যার আপন বিভাগের লোকজনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চ'লছেন।

আত্মরক্ষার সব কিছু ব্যবস্থা ওলট পালট ক'রে শত্রু যখন হানা দেবেই—তা সে দিনের আলোতেই হ'ক অথবা রাতের অন্ধকারেই হ'ক—তখন নিরস্ত্র নাগরিকগণ কোথায় দাড়াবে একটু আশ্রয়ের জন্য ? বোমার আঘাতে তারা যতটা না মরবে তার অনেক বেশী মরবে তারা ইট, পাথর, লোহা-লক্করের নীচে চাপা প'ড়ে। বোমার ঘায়ে বাড়ী যখন ভাঙ্গবে, বাড়ীর মালিককে চাপা দিতে এতদিনের বাড়ী এতটুকুও কসুর ক'রবে না। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'রতে এ প্রশ্নটাকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। পয়সা যাদের আছে তারা নিজ নিজ বাড়ীতে মাটির নীচে অথবা উপরেই নীচু করে কংক্রীটের ঘর গেঁথে তোলে; উদ্দেশ্য—বিমান-আক্রমণ যখন হ'বে তখন তা'রা এই সব ঘরে আশ্রয় নেবে। যাদের পয়সা নেই তাদের জন্যে গভর্ণমেণ্ট পল্লীতে পল্লীতে এই ধরণের অনেক ঘর ক'রে দেন। এই সব ঘরের উপরে চাপান হয় বালির বস্তা আর মাটির

তাল। বর্ত্তমান যুদ্ধে লণ্ডনে এমনিতর যে সব ঘর তৈয়ারী হয়েছে তা'দের বলা হয় 'এণ্ডারসন শেল্টারস্' (Anderson Shelters)। বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্নর

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক ঘাঁটির বাহিরের দৃশ্য

সার জন এণ্ডারসন যখন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তখনই তিনি এই সকল আশ্রয়-স্থল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন। তাই তার নামেই করা হয়েছে এইগুলির নামকরণ। সমগ্র দেশের লোককে একটা বা ছটো আশ্রয়স্থলে আশ্রয় দেবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। তাতে সুবিধার চাইতে অসুবিধাই হবে অনেক বেশী। তাই পল্লীতে পল্লীতে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ঘর তৈয়ারী করা হ'য়েছে—যতটা সম্ভব বোমা ও গ্যাস-প্রতিরোধক করে।

এখানে কিন্তু সবাই চুপচাপ ব'সে থাকে না, কেননা সে রকমটা হ'লে লোকের মনের ভয় বেড়ে যাবে আর বিমান-আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য সফল হবে। শেলটারগুলি এখন এমনভাবে পরিকল্পিত যে যদি শেলটার না ব'লে একে ক্লাব-হাউস বলা যায় তবুও অন্যায় কিছু হবে না। এগুলির মধ্যে রাখা হয় পানীয় জল, গরম চা, কফি, গরম দুধ, আর থাকে বেতার যন্ত্র, গ্রামোফোন, ঘরে ব'সে খেলা

চলে এমনিতর অনেক রকম খেলার সরঞ্জাম, বইপত্র, নানারকম খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা এই সব। দিনে রাতে কখন যে আক্রমণ হবে তার ত' কিছু ঠিক নেই—কাজেই সব রকম টুকি টাকি দরকারী জিনিষ এখানে না থাকলে

বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধক ঘাঁটির ভিতরের দৃশ্য

চ'লবে কেন! তাছাড়া সব রকম বয়সের লোকই এসে এই সব শেলটারে আশ্রয় নিতে পারে আর হাজার রকম হ'তে পারে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ। অবশ্য এই সব নানা বয়সের ভিন্ন ভিন্ন রকম রুচির লোকের বিভিন্ন মত অনুযায়ী হাজার রকম ব্যবস্থা করা কিছু সম্ভব নয়, তবুও যতটা পারা যায় তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে বই কি! যে সব শেলটারে শুধু ছেলেরা আশ্রয় নেয়,—অন্ততঃপক্ষে যে সব জায়গায় ছেলে মেয়েরাই হয় সংখ্যায় বেশী—সে সব জায়গায় আরও একটু মজাদার ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এই সব শেলটারে সাধারণতঃ 'মিকিমাউস' জাতীয় ছবিগুলি ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেখান হ'য়ে থাকে।

এতে ছেলেরা প্রচুর আনন্দ পায় আর কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদের কথা তাদের মনেই আসে না।

এই সব আশ্রয়স্থানে এলে সবাই সমান। প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল সাহেব একবার একটা শেলটারে ঢুকেছিলেন বিমান-আক্রমণের সময়। তার মুখে ছিল একটা জ্বলন্ত সিগার, কিন্তু শেলটারের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ—চার্চ্চিল সাহেবের এই কথাটা স্মরণ ছিল না ব'লেই তিনি সিগার মুখে দিয়ে শেলটারে ঢুকেছিলেন। শেলটারে ঢুকতেই একজন লোক চার্চ্চিল সাহেবকে ব'লে ব'সল, "No cigar, Mr. Churchill." প্রধান মন্ত্রী একটু হেসে সিগারটি বালির বস্তার মধ্যে চেপে নিবিয়ে দিলেন আর সহাস্য বদনে ব'ললেন, "Thank you, sir. How do you feel ?" ভদ্রলোকটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিলেন, "O. K. Quite comfortable." এখানে এসে সাধারণ লোকের পর্য্যন্ত হাস্য পরিহাস বন্ধ হয় নাই! সম্প্রতি আবার এমন ব্যবস্থা করা হ'য়েছে যে আশ্রয়প্রার্থী নরনারীরা দরকার মত এই সব শেলটারে ঘুমাতেও পারবে।

প্রাথমিক সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় উদ্যোগপর্ব্ব। তারপর শত্রু যদি সত্য সত্যই এসে পড়ে তখনই আরম্ভ হয় সত্যিকারের কাজ। যদি শত্রু না আসে তবে বেশ খানিকটা সময় অপেক্ষা ক'রে এই সব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ফিরে যায় যে যার কাজে। শত্রু এলে যে ভাবে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় এবারে তারই একটা বিবরণ দিচ্ছি।

যখন শত্রুবিমান সহর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এসেছে—বোঝা যায়, তখন ফাইটার কম্যাণ্ড থেকে পাঠান হয় দ্বিতীয় সঙ্কেত। লাল আলো জ্বেলে সর্ব্বত্র এই আক্রমণ সঙ্কেত জানান হয়। পুলিশঘাঁটির লোকেরা সংবাদ পাওয়া মাত্রই 'সাইরেন' বা বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করে এবং বাঁশীর শব্দে সমস্ত শহর হ'য়ে উঠে সচকিত ও সজাগ। শত্রুবিমানের আগমন-সংবাদ পাবা মাত্রই বেজে উঠে কলকারখানা, ষ্টীমার, জাহাজ ইত্যাদির বাঁশী যাতে ক'রে দেশের সব লোকই এগুলো শুনতে পায়। এজন্য স্থানে স্থানে বিশেষ ক'রে পুলিশ ঘাঁটিগুলিতে ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানে দরকার মত আলাদা বাঁশীও বসান হ'য়েছে। বাঁশীর

আওয়াজ পেলেই লোকে ছোটে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জনমণ্ডলীকে পথ দেখায়। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, নার্স আর দমকলের লোকেরাও তেমনিই যে যার গাড়ীতে চেপে তৈরী হয় পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য।

জঙ্গী বিমানগুলি আগেই আকাশে উঠে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ ক'রেছে - এদিকে বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলি ও তাদের সঙ্গের গণকযন্ত্রগুলিও একেবারে তৈরী। ফাইটার কম্যাণ্ড যেইমাত্র হুকুম দেবে—'গুলি ছোঁড়', অমনি আরম্ভ হবে কামান দাগা, তার পর চ'লতে থাকবে শহরের মাথার উপর একটা ভীষণ যুদ্ধ।
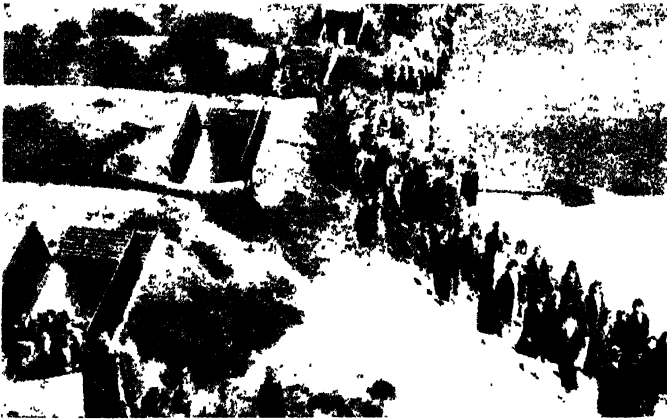
বিমান-আক্রমণের পর দলে দলে ইংরাজ নরনারী শেলটার থেকে বাইরে আসছে

শেষ পর্যন্ত যদি শত্রুপক্ষ বোমা ফেলে ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে যায়, তখন এই 'এ. আর. পি.র' কাজ আরম্ভ হয়। এক হাতে তাদের ধ্বংসস্তূপ সরাতে হ'বে, অন্য হাতে যে সব হতভাগ্য নরনারী শত্রুর বোমার ঘায়ে আহত হবে তাদের ক'রতে হবে চিকিৎসার ব্যবস্থা। এ যে কত কঠিন কাজ তা ব'লে বোঝান যায় না। পথের উপর ধ্বংসস্তূপ প'ড়ে গাড়ী ঘোড়া চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেলে, না হবে লোকের দৈনন্দিন কাজ কারবার চালান, না যাবে কারও চিকিৎসা

বা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা—তার উপর যদি শত্রুর আগুনে বোমার ঘায়ে স্থানে স্থানে আগুন জ্ব'লে ওঠে, তবে ত' সোনায় সোহাগা!

যখন দলে দলে লোক এই সব শেলটারে ঢোকে বা বের হয়, তখন যাতে তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত তাড়াহুড়ো না ঘটে এজন্য ইংলণ্ডে আবালবৃদ্ধবণিতাকে

দরজা জানালায় বালির বস্তা সাজান হ'চ্ছে
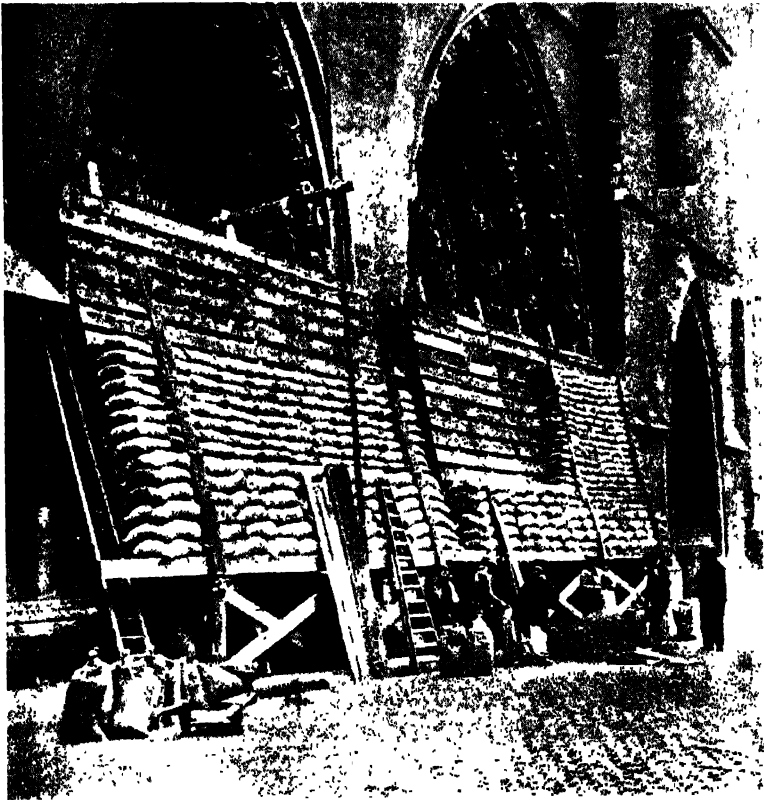
দেওয়া হ'য়েছে বিশেষ রকম শিক্ষা—তার ফলে কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ না ক'রলেও দেশের প্রত্যেকটা নরনারী যন্ত্রের মত এগুলিতে ঢোকে অথবা বের হয়—কখনও কোন গোলমাল হয় না।

আক্রমণ শেষ করে শত্রু যখন পালিয়ে যায় বা আক্রমণ না ক'রেই বিদায় নেয়—এক কথায় যখন বোঝা যায় শত্রু আর কাছে ভিতে নাই—তখন ফাইটার কম্যাণ্ডের নির্দ্দেশে ফের বাঁশী বেজে ওঠে আর 'এ. আর. পি'র লোকেরা ছুটে বেরিয়ে পড়ে পথে। তাদের কাজ শেষ হ'লে তারপর শেষ বাঁশী বাজে একটানা অনেকক্ষণ ধ'রে। এই শব্দকে বলা হয় 'অল ক্লিয়ার' (All Clear)। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'য়ে যায় নাগরিকগণের শেলটার-বাস আর আরম্ভ হয় নিত্যকারের কাজ।

শেলটারে ঢুকে নিজের জীবন বাঁচান যায়, কিন্তু বাড়ীঘর দালান কোঠা কিছু সেখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায় না। শত্রুর বোমার আঘাত খাওয়ার জন্য তৈরী হ'য়েই এই সব ঘরবাড়ীগুলিকে ঠায় দাড়িয়ে থাকতে হয়। শত্রুপক্ষ বেপরোয়া বোমা ছুঁড়লে অবশ্য এগুলিকে বাঁচান যায় না, কিন্তু তবু ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে দালানের ছাতে, দরজা জানালা এই সবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বালির বস্তার প্রাচীর। এই বালির বস্তা দিয়ে সব বাড়ীঘরই কতকটা রক্ষা করা সম্ভব হ'য়েছে।

আক্রমণের বিভিন্নতা অনুসারে আত্মরক্ষার পদ্ধতিরও বৈচিত্র্য বাড়বে। যুদ্ধে মানুষ মরে, বাড়ীঘর ভাঙ্গে, উর্ব্বর দেশ মরুভূমি হয়। একথা ভুলে গেলে চ'লবে না যে আত্মরক্ষা এই নির্ব্বিচার ধ্বংস বন্ধ করার জন্য নয়—এ শুধু মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাকে এড়িয়ে যাবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র।

এখনকার দিনে দেশবিদেশের খবর পাবার জন্য সকলেই থাকে উন্মুখ। যান-বাহনের উন্নতি হওয়ায় খবর পাবারও সুবিধা হ'য়েছে অনেক বেশী। প্রত্যেক দেশের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ থাকায়, সকলেই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, অনেকটা পরস্পর নির্ভরশীল হ'য়ে প'ড়েছে। এইজন্যই দু'টি দেশে যদি যুদ্ধ বেধে ওঠে তবে অন্য দেশগুলিতেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই।

প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিদিনের যুদ্ধে প্রত্যেক জাতিকেই খরচও কিছু কম ক'রতে হয় না—যে হিসাব আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে—ইংরাজরা এবারকার যুদ্ধের জন্য দৈনিক ব্যয় ক'রছে ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ কোটি টাকা। এই টাকার জন্য ভিন্ন দেশের উপর কম বেশী নির্ভর ক'রতে হবেই, না হ'লে এই ধরণের চলতি খরচ করে এমন সাধ্য খুব কম দেশেরই আছে। তাছাড়া যুদ্ধের সময় অন্য দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহানুভূতি না পেলে চলে না, কেননা যদি অন্যদেশ প্রত্যক্ষভাবে জনবল বা ধনবল দিয়ে সাহায্য না করে এবং দরকার মত

যুদ্ধের হাজার রকম দরকারী মালের যদি অন্ততঃ কিছুটাও বিপক্ষকে না দিয়ে নিজেদেরকে দেয়, তবে সাহায্য কিছু কম হয় না। তাতে একদিকে যেমন নিজেদের শক্তি বেড়ে যায় অন্যদিকে তেমনিই শত্রুপক্ষের শক্তি আসে ক'মে। এইজন্যই যুদ্ধ বাধলেই,—শুধু যুদ্ধ বাধাই বা বলি কেন তারও অনেক আগেই—উভয়পক্ষই স্বরু করেন প্রচার কার্য্য, এর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল নিজের দলে লোক ভিড়ান। এদিক দিয়ে যে জাতি যতটা সাফল্য লাভ ক'রবে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা তার পক্ষে ততটা অনুকূল হবে।

যুদ্ধের সময় প্রচারের মূল্য সম্বন্ধে বুঝাতে হ'লে আরও একটা দিক ভেবে দেখতে হবে। রাজনীতি যারা আলোচনা করেন সব দেশেই তাদের সংখ্যা খুব কম, আর এখনকার দিনে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধে নিতান্তই রাজনৈতিক আদর্শের তফাতে। এই জন্যই যুদ্ধের সত্যিকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পুরোপূরি জ্ঞান মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। দেশের বিরাট জনগণের সে সম্বন্ধে একরকম কোন জ্ঞানই থাকে না।

যুদ্ধের সময় এই মুষ্টিমেয় লোকের উপর পড়ে পরিচালনার ভার, কিন্তু গোলাগুলির মধ্যে যাদের এগিয়ে যেতে হয় প্রাণ দিতে বা নিতে যাদের এতটুকু ইতস্ততঃ করা চলে না—তাদের ভাগ্যে থাকে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করবার দায়িত্ব। পেট ভ'রে খেতে তারা অনেক সময়েই পায় না—মাইলের পর মাইল তাদের ছুটে বেড়াতে হয়; পানীয় জল—তাও তাদের মেপে খেতে হয়। গৃহসুখ-বঞ্চিত হতভাগ্যের দল রৌদ্র বৃষ্টি সমান ক'রে, আরাম বিরাম তুচ্ছ ক'রে যে মৃত্যু আলিঙ্গন ক'রবে—তার পিছনে যদি আদর্শ ব'লে কিছু না থাকে তবে তাদের এই দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকারের প্রেরণা আসবে কেন? এই জন্যই যারা যুদ্ধে যায় তাদের মধ্যে প্রচারকার্য্য হয় দরকারী।

যারা যুদ্ধে যায় না তাদের মধ্যেও প্রচারের প্রয়োজন কিছু কম নয়। যুদ্ধের কঠোরতা, সঙ্কীর্ণ খাদ্য সরবরাহ, সব চাইতে বেশী প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা তাদেরও কিছু কম বিচলিত করে না। তাছাড়া বর্ত্তমান কালের যুদ্ধে এই সব নাগরিকগণও বোমার ঘায়ে বিশেষ ভাবেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়। সমস্ত দুঃখ বেদনা, সর্ব্বপ্রকার

বিপত্তি তারা সহ্য ক'রতে পারে শুধু তখনই যখন বোঝে যে এর পিছনে র'য়েছে একটা আদর্শের আহ্বান। প্রচারকার্য্যের সার্থকতা এইখানেই।

মানুষের চিত্তবৃত্তির আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রচারকার্য্য আরও বেশী প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। মানুষের মন স্বভাবতঃই সংবাদবিলাসী। সব সময়ই সে আরও জানতে চায়। যখনই সত্য সংবাদ সে সংগ্রহ ক'রতে না পারে তখনই সে আপন মনে গুজবের সৃষ্টি ক'রে চলে। সত্য সংবাদের পরিবর্ত্তে যদি চারদিকে এমনিতরো গুজব রটনা হ'তে থাকে তবে কি সৈন্যদল, কি জনগণ, সবারই মন বিশ্বাস ক'রে ব'সবে এই সব গুজব—আর তার ফলে যে বিপদ ঘ'টবে তাই হ'য়ে দাঁড়াবে যুদ্ধে পরাজয়ের মস্ত বড় কারণ। নিজেদের পক্ষে সংবাদ রটনায় শৈথিল্য ঘ'টলেই শত্রুপক্ষ থেকে তার সুযোগ নিয়ে রটনা করা হবে হাজারো রকম গুজবের; সুতরাং যা'তে তেমন কিছু না ঘটতে পারে এজন্য যুদ্ধের সময় সংবাদ পরিবেশনের দিকেও কর্তৃপক্ষ অধিকতর সজাগ থাকেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে আমেরিকা সব রকমে ইংরাজগণকে সাহায্য ক'রে চ'লেছে যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে এখনও সে যুদ্ধে নামে নি। আমেরিকায় প্রচারকার্য্য চালাবার জন্য যে সুন্দর ও নূতন উপায় পরিকল্পিত হ'য়েছে এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি ব্যবস্থা হ'য়েছে লণ্ডনের উপর নাৎসী আক্রমণের বিভৎসতা আমেরিকাবাসীকে জানাবার জন্য বিমান-আক্রমণ ও যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ বেতারে আমেরিকায় পাঠান হবে অর্থাৎ আমেরিকায় ব'সে লণ্ডনে যখন বিমান-আক্রমণ চলছে তখনকার সমস্ত শব্দ, সমস্ত কোলাহল তৎক্ষণাৎ যাতে বেতারযোগে আমেরিকায় পৌছে তার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এতে ক'রে আমেরিকার ঘরে ঘরে জার্ম্মান বিরোধী প্রচারকার্য্য বেশ সফল হবে এবং এর ফলে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আমেরিকায় প্রবল জনমত গঠিত হ'যে উঠবার সম্ভাবনা র'য়েছে।

যুদ্ধের সময় বিমান থেকে নানা রকম ইস্তাহার ফেলে দেওয়া হয় শত্রুর দেশে, শত্রুর সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে যাতে তারা সমবেত ভাবে হ'য়ে দাঁড়ায় যুদ্ধ-বিরোধী অথবা বিদ্রোহী।

বাণী, বক্তৃতা, ইস্তাহার, সংবাদপত্র, প্রাচীরপত্র ইত্যাদি দ্বারা লোকের মনে

যুদ্ধলিপ্সা জাগিয়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা করা হ'য়ে থাকে, এবং এর জন্য সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সকল রকম চাপ দেওয়া হয়।

এরোপ্লেন থেকে শত্রুর দেশে প্রচারপত্র ছড়ান হ'চ্ছে।

মানুষ ক্রমাগত পরাজয়ে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েই—সেইজন্যই সংবাদ পরিবেশনের কাজে অবহিত না হ'লে চলে না এবং এই কারণেই কৌশলে পরাজয়ের সংবাদ গোপন রেখে জয়ের সংবাদ জানানোর জন্যে অনেক রকম বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা হয়।

প্রচারের ব্যবস্থা

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা হ'য়েছে অনেক সহজ একথা সত্য; কিন্তু যাঁরা এই কাজে আত্মনিয়োগ ক'রেছেন তাঁদের কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে অনেক কঠিন।

প্রচারকার্য্যের জন্য যাঁরা আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন সময় সময় তাঁদের কিরূপ বিপদের মধ্যে প'ড়তে হয় তার একটা সুন্দর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জার্ম্মাণী যখন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন হঠাৎ পোল্যাণ্ডবাসী বেতারে খবর পেল—জার্ম্মাণী ঐ সময়ে অমুক স্থানে যাবে এবং পোল গভর্ণমেণ্ট তাতে বাধা দেবেন না। ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে জার্ম্মাণী এল এবং রেডিওযোগে প্রচারিত উপদেশ অনুসারে স্থানীয় পোল কর্ত্তৃপক্ষ বা জনসাধারণ শত্রুকে কোন রকম বাধা দিল না। জার্ম্মাণী বিনা বাধায় নগর প্রবেশ ক'রল। পরে দেখা গেল দেশের স্থানে স্থানে নকল বেতার ঘাঁটি ক'রে জার্ম্মাণীই এই সব উপদেশ, আর পোল-গণকে হতভম্ব ও নিরুৎসাহ ক'রে দেবার জন্য নানা রকম গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এ সবই পোল গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ঘটেছে।

এই ঘটনার অভিজ্ঞতা এখন কোন জাতিই তুচ্ছ ক'রবে না। প্রচার বিভাগ এখন সব রকমে সাবধান থাকে যাতে শত্রুপক্ষ এই ভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত না ক'রতে পারে।

প্রচারকার্য্যের গোড়ার কথা

প্রচারকার্য্যের গোড়ার কথা—আমি যা বলতে চাই লোককে তা' বিশ্বাস করাতে হবে, এমন কি অবিশ্বাসীও যেন একথা অবিশ্বাস ক'রতে না পারে। মিথ্যা প্রচার প্রয়োজন হ'লে সবাই করে আর মানুষও চিরকাল সত্য কথাই বিশ্বাস করে ব'লে—অহমিকা প্রকাশ করে। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায়—নীরবে মিথ্যা প্রচারকার্য্যে বিভ্রান্ত হ'তে কেউই কম যায় না। এইখানেই হল প্রচারবাহিনীর সার্থকতা।

মানুষের মনোবৃত্তিতে একটা দুর্ব্বলতা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই দেখতে পাওয়া যায়—সেটি হচ্ছে এই যে—নাটকীয় ধরণে যদি কোন ব্যক্তিত্বশালী বক্তা একটা বিরাট মিথ্যার অবতারণা করতে পারেন এবং পরবর্ত্তী কিছু সময়ে যদি ঐ একই কথা বার বার বলতে পারেন, তবে এই মিথ্যা প্রচারে অভিভূত না হয় জনসাধারণের মধ্যে এমন লোক কমই আছে। নাৎসী-নেতা হিটলার তাঁর আত্মচরিতে প্রচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন। তাঁর মতে মিথ্যাটা

কত বড় তারই উপর নির্ভর ক'রবে মানুষ সেটাকে কি ভাবে গ্রহণ ক'রবে এবং তার কতখানি বিশ্বাস ক'রবে। ছোটখাট মিথ্যা কথা মানুষ অতি সহজে অবিশ্বাস করে, কেননা প্রাত্যহিক জীবনে এই ধরণের মিথ্যার আশ্রয় সবাই নিয়ে থাকে। কিন্তু খুব বড মিথ্যা খুব জোরেব সঙ্গে বললে তার চমৎকারিত্বে লোক অভিভূত হয়ে পড়ে। এবং 'যা রটে তা'র কতকটা সত্য বটে'—এই অজুহাতে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বিবাট মিথ্যাব বিপুল ধাপ্পা বিশ্বাস করতে মানুষ বাধ্য হয়। মিথ্যা প্রচারের এই হ'ল মূল নীতি।

নিজের দেশে অবাঞ্ছিত প্রচারকায্য বন্ধ ক'রতে হ'লে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কড়া সেন্সর বসিয়ে প্রত্যেকটি সংবাদ, প্রত্যেকটি বক্তৃতা, প্রত্যেকটি প্রবন্ধের ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়। আবার অনুকূল প্রচারের উদ্দেশ্যে, বিশেষ ক'রে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলিকে হস্তগত করার চেষ্টা করা হয়—যাতে করে অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও এরা সুবিধাজনক সমালোচনা প্রচার করে। এইসব পত্রিকাগুলিকে হাতে রাখতে এদের কাগজে অনেক টাকার বিজ্ঞাপন ছাপান হয়। যুদ্ধ চলতি অবস্থায় শক্রর দেশে বিজ্ঞাপন প্রকাশের অথবা অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের প্রত্যক্ষ সুবিধা পাওয়া যায না ব'লে, বন্ধুভাবাপন্ন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সাহায্যে এই কাজ করা হ'য়ে থাকে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে সব দেশের গভর্ণমেণ্টই অন্যান্য দেশের, নামকরা লোকদের নিকট নানা রকম সংবাদপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি, পাঠিয়ে থাকে। এতে দেশের চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে বেশ ভাল প্রচারকার্য্য চালান যায়, কিন্তু যুদ্ধের সময় এ ব্যবস্থা বন্ধ ক'রতে হয়। তখন ত' কোন কাগজই শক্রর দেশে পাঠান যায় না! নিরপেক্ষ বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যও এখানে হ'য়ে দাঁড়ায় মূল্যবান। নিতান্ত নিরপেক্ষ সংবাদদাতা হিসাবে এই নিরপেক্ষ দেশের কোনও কোনও লোক রেডিও-যোগে, প্রচারপত্র সাহায্যে সংবাদ পাঠায—এমন সংবাদ—যার নাকি প্রচারমূল্য হয অসাধারণ। নিরপেক্ষ দেশের সংবাদ ব'লে লোকে এগুলো সহজে অবিশ্বাস ক'রতে পারে না এবং মানুষের এই সহজ বিশ্বাস-প্রবণতার সুযোগ নিয়েই চলে প্রচারকার্য্য।

বিভীষণ বাহিনী

স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো যখন রাজধানী মাদ্রিদ অবরোধ ক'রে স্পেনের তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের পতনের আশায় দিন গুণছিলেন, তখন এক বক্তৃতায় তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে অবাক করে দিয়েছিলেন এই ব'লে যে মাদ্রিদের পতনের জন্য জল, স্থল, আকাশ ও প্রচার বাহিনী ছাড়াও আর একটা বাহিনী তার তৈয়ার আছে। এই বাহিনীকে তিনি ব'লেছিলেন পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column)। পরে অবশ্যই এটা বেশ বোঝা গিয়েছিল যে এই পঞ্চম বাহিনী অনুকূল মনোভাব সম্পন্ন জনগণ ও গুপ্তচরদের নিয়ে গঠিত। বাংলায় এই পঞ্চম বাহিনীকে 'বিভীষণ বাহিনী' ব'লে উল্লেখ করা হয়। অভিজ্ঞতার ফলে এটা এখন বেশ বোঝা গেছে যে সত্যিকার যুদ্ধে জল, স্থল, আকাশ ও প্রচার বাহিনীর চেয়ে পঞ্চম বাহিনীর প্রয়োজন কিছু কম নয়।

আজকের দিনের বিভীষণ বাহিনী শুধুমাত্র গুপ্তচরদের নিয়ে গঠিত ব'ললে ভুল করা হয়। শত্রুর প্রচার বিভাগের কাজ ভাল হ'লে একদল লোক স্বভাবতঃই বিপক্ষ বাহিনীর প্রতি অনুকূল মনোভাব সম্পন্ন হ'য়ে উঠে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ রেখে, আলাপ আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা শত্রুপক্ষের গুপ্ত কার্য্যাবলীর ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত ক'রে যাওয়া, হয় এই বাহিনীর নায়কদের একমাত্র কর্ত্তব্য। অবশেষে সুবিধামত দেশের মধ্যে

একটা গোলমালের সৃষ্টি ক'রে এরা দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি নষ্ট ক'রে তোলে এবং শত্রু যখন দেশের দোরগোড়ায় হানা দেয় তখন তাকে সকল রকম সাহায্য ক'রে দেশকে তুলে দেয় শত্রুর হাতে।

এই যে বিভীষণ বাহিনী এও আজ বেশ সুগঠিত হওয়া দরকার এবং এর কাজের রীতি সবরকমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই বাহিনীর কাজের জন্য প্রথমেই শত্রুর অজ্ঞাতসারে তার দেশে কতকগুলি বাছা বাছা লোক পাঠান দরকার—যারা নানা অছিলায় শত্রুর দেশে যেয়ে সবরকমে শত্রুর সঙ্গে মিশে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যের দোহাই দিয়ে আজকাল প্রত্যেক দেশেই অনেক বিদেশী ব্যবসায়ী থাকেন। তাদের অনেকের কাজই হ'চ্ছে সেই দেশের লোকদের নিয়ে এমন একটি গুপ্তদল গঠন করা যারা সময়কালে শত্রুকে সাহায্য ক'রতে মোটেই পিছপা হবে না।

শত্রুর দেশে শত্রুর লোকজন দিয়ে একটা বাহিনী গ'ড়ে তোলা কত যে বিপদ-সঙ্কুল কাজ সেটা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। একদিনের চেষ্টায় এই বিভীষণ বাহিনী গড়া যায় না। একে গ'ড়ে তুলতে হ'লে দরকার হয় দীর্ঘদিনের সাধনা আর অকৃপণ ব্যয়। এই বাহিনী গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রত্যেক দেশে ছাত্র হিসাবে সুচতুর কর্ম্মী পাঠান হয়—তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রচার করে নিজেদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ; দেশে দেশে যায় শ্রমিক-হিতৈষী—তারা শ্রমিক-বন্ধু সেজে তাদের মধ্যে ছড়ায় নিজ নিজ দেশের গভর্ণমেণ্টের প্রতি একটা অহেতুক বিদ্বেষ; নারী প্রগতির ধ্বজা ধ'রে আন্তর্জ্জাতিক নারীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সেজে নারীকর্ম্মী যেয়ে দেশের মেয়েদের মধ্যে বপন করে অসন্তোষের বীজ। এমনি ক'রে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আরম্ভ করা হয় একটা আলোড়ন এবং এইটাকে ফেনিয়ে তোলা হয় অসম্ভব রূপে। অবশেষে এরা এক একটা শক্তিশালী দলে পরিণত হ'য়ে সুবিধাজনক সময়ে নানারূপ সত্য ও কাল্পনিক অভিযোগের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। বিদেশ থেকে এই আন্দোলনে সাহায্য করা হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ায় ঠিক এই ভাবেই কাজ হ'য়েছিল—বাইরে থেকে জার্ম্মাণী যখন চাপ দিল—জার্ম্মাণ অধিবাসিগণের উপর

সুবিচার ক'রতে হবে, অমনি সুদেতেন অঞ্চলের জার্ম্মাণরা আন্দোলন আরম্ভ ক'রল জার্ম্মাণীতে ফিরে যা'বার। সুগঠিত বিভীষণ বাহিনীর সাহায্যে এই আন্দোলন এমন শক্তিশালী ক'রে তোলা হ'ল যে শেষ পর্য্যন্ত ইউরোপের মানচিত্র থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া একেবারে মুছে গেল।

সামরিক কার্য্যকলাপ

সুযোগ সুবিধা হ'লে এই বিভীষণ বাহিনী সামরিক কার্য্যকলাপের জন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত হয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রুমানিয়ার 'আয়রন গার্ড', ফ্রান্সের 'কাগুলা', মেক্সিকোর 'গোল্ডশার্ট', যুগোশ্লাভিয়ার 'উষ্টাচি' প্রভৃতি থেকে। এখন নিঃসংশয়ে বোঝা গেছে যে এই দলগুলি জার্ম্মাণীর নাৎসী ও ইটালীর ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের সমর্থক—শুধু তাদের সমর্থকই বা বলি কেন, তাদের অঙ্গ-বিশেষ। সব দেশেই কিছু এমনিতর সামরিক কার্য্যকলাপ ক'রবার সুবিধা হয় না। দেশের কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকলে এই ধরণের সামরিক কার্য্যকলাপ প্রথমেই বন্ধ হ'য়ে যায়—তাই বলে বিভীষণের দল চুপ ক'রে ব'সে থাকে না। নানা রকম অর্দ্ধসামরিক খেলাধূলার দল গ'ড়ে তারা এই ধরণের সামরিক কার্য্য-কলাপ ক্রমশঃই চালিয়ে যায়।

বিভীষণ বাহিনী গ'ড়ে উঠলে এদের কার্য্যকলাপ কত ভীষণ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে তার অনেক প্রমাণই পাওয়া গেছে। ১৯৩৭ সালে মেক্সিকো গণতন্ত্রের সভাপতি কার্ডেনাসকে হত্যা করবার জন্য সেখানকার 'গোল্ড-শার্টের' দল ষড়যন্ত্র ক'রে সভাপতির বাড়ীতে গোপনে বোমা ও ডিনামাইট বসিয়ে রেখেছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই ষড়যন্ত্রের কথা আগেই প্রকাশ হ'য়ে পড়ায় কোন দুর্দ্দৈব শেষ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। এই বছরেই ফরাসী পঞ্চম বাহিনীর এমনিতর একটা ষড়যন্ত্র তৎকালীন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিলেন। ফরাসী দেশে যখন পপুলার-ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্য পরিচালনা ক'রছিলেন—তখন ইটালীর ফ্যাসিষ্ট দলের ফরাসী শাখা 'কাগুলা' দল ভিতরে ভিতরে স্পেনের মত গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল, কারণ ফরাসী গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিপক্ষে স্পেনের রিপাব্লিকান দলকে সাহায্য ক'রছিলেন। ইটালী ও জার্ম্মাণীর স্বার্থ ছিল ফ্রাঙ্কোকে

জয়যুক্ত করা—তাই ফ্রান্সকে সাহায্যদানে বিরত ক'রবার উদ্দেশ্য নিয়ে 'কাগুলা' দল দেশের মধ্যে একটা গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে ফরাসী সরকারকে বিপন্ন ক'রবার চেষ্টায় ছিল। এখানেও ষড়যন্ত্র অনেক পূর্ব্বেই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এবং নানা স্থানে খানাতল্লাসের ফলে দেখা যায় 'কাগুলা' দল ইটালী ও জার্ম্মাণী থেকে কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র আমদানী ক'রে একটা পূরাপূরি সৈন্য বাহিনী গ'ড়ে তুলেছে। এই 'কাগুলা' দলই মুসোলিনির নির্ভীক সমালোচক ও প্রতিপক্ষ কার্লো রসেলিকে হত্যা ক'রে প্রতিকূল সমালোচনার হাত থেকে ফ্যাসিষ্ট নেতাকে রক্ষা করে।

এই সব ষড়যন্ত্র সব সময়ই কিছু নিষ্ফল হয় না। ১৯৩৪ সালে যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার যখন ফরাসী-যুগোশ্লাভিয়া-সন্ধি করবার জন্য অগ্রসর হ'লেন, তখন দেশের এই এক অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে অতি নাটকীয় ভাবে নিহত হ'লেন যুগোশ্লাভিয়ার বিভীষণ দলের হাতে, ঠিক সময় মত বিভীষণ বাহিনী ক'রল তাদের কাজ। এমনি কাজই বিভীষণ বাহিনী চিরকাল করে!

জার্ম্মাণী বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে অনেক ইহুদীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে ইহুদীদের পরিচয়ে অনেক জার্ম্মাণ গুপ্তচরও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় পেয়েছিল। সত্যিকারের ইহুদীর মত এদের উপরও প্রকাশ্যে নির্য্যাতন চালান হ'য়েছিল, যাতে ক'রে এই সব লোকগুলি যে ইহুদী নয় এ সন্দেহ কারও মনে স্থান না পায়। তারা ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, প্যালেষ্টাইন ইত্যাদি সব দেশেই যেয়ে আশ্রয় নিল এবং গোপনে নিজেদের কাজ ক'রে যেতে লাগল অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে জার্ম্মাণীর পঞ্চম বাহিনী গ'ড়ে তুলতে আরম্ভ ক'রল। ইংলণ্ডের জনমত সবল এবং ইংলণ্ডের লোকের কাছে তাদের নিজেদের স্বাধীনতা বিপন্ন ক'রে অন্য কিছু করার কল্পনাও সুকঠিন—তাই এখনও এখানে বিভীষণ বাহিনীর মারাত্মক কিছু দেখা যায় নাই। কিন্তু অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়াতে জার্ম্মাণ পঞ্চম বাহিনী যথেষ্ট সাফল্য লাভ ক'রেছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে গুপ্তচরের প্রয়োজন ও নিয়োগ চিরকালই ছিল। শুধু যুদ্ধে কেন, শান্তির সময়েও সব দেশই অন্য দেশের খবর জানার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করে।

কারণ শত্রুর গতিবিধি, শত্রুর দুর্ব্বল আয়োজন, সব কিছু খবর এই গুপ্তচরেরাই সংগ্রহ করে এবং যথাকালে কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনে। শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতার খবর পেলে, যে কোন সেনাপতি তার সুযোগ নিয়ে শত্রুকে দমন ক'রবার চেষ্টায় অনেকখানি সফলতা লাভ ক'রবেন সে কথা না ব'ললেও চলে। শত্রুর গতিবিধির সন্ধান আর তাদের আযোজনের পরিমাণ আগে থেকে জানতে পারলে যে কোন সেনাপতি পূর্ব্বাহ্ণেই সাবধান হ'বেন। এই খানেই হ'ল গুপ্তচর বাহিনীর সার্থকতা।

বিরোধ যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, ভবিষ্যৎ শত্রুর গুপ্ত তথ্যের প্রয়োজনও ততই বাড়তে থাকে। এইজন্য শুধু মাত্র শত্রুর দেশে প্রবাসী ব্যবসায়ীদেরই উপর নির্ভর না ক'রে ভ্রমণকারী, চাকুরীজীবী, মোটর চালক, এমনি আরও অনেক লোককে দলে দলে শত্রুর দেশে পাঠান হ'য়ে থাকে। শান্তির সময় কোন দেশের গভর্ণমেণ্টই এতে আপত্তি ক'রতে পারেন না, কিন্তু তাই ব'লে তারা চুপ ক'রে ব'সে থাকেন না। একদিকে তারাও অন্যান্য দেশে এই রকম ভাবে নিজেদের লোক পাঠান আর অন্য দিকে নিজের দেশের এই সব অবাঞ্ছিত অভ্যাগতের উপর রাখেন সতর্ক দৃষ্টি। যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পূর্ব্বেই এই সব গুপ্তচরেরা নিজের দেশে পাড়ি জমান, যে দু'একজন কোন কারণে শত্রুর দেশে থেকে যেতে বাধ্য হন, যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণমেণ্ট তাদের গ্রেপ্তার ক'রে ফেলেন। এই ভাবে গুপ্তচরদের হাত থেকে কতকটা রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়; কিন্তু এতেও তাদের কার্য্যকলাপ একেবারে বন্ধ করা যায় না। যে সব দেশ নিরপেক্ষ থাকে তাদের সাহায্যে এই গুপ্তচরের কাজ তখনও চলতে থাকে। যুদ্ধের আগে কি ক'রে সংবাদ সংগ্রহ করা হয় এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে পোল্যাণ্ডের নকল বেতার-ঘাঁটির কথা থেকে। যুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডে নকল বেতার-ঘাঁটি গঠন ক'রে কি ভাবে পোলদেরকে ধাপ্পা দেওয়া হ'য়েছে, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে। এই নকল বেতার-ঘাঁটি কি ক'রে তৈরী করা হ'ল? প্রথমে জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা পোল বেতার-ঘাঁটিতে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ক'রবার কাজ সংগ্রহ ক'রলেন এবং সেই উপলক্ষে বেতার-ঘাঁটির ভিতরকার কথা সব জেনে নিলেন। তারপর দরকার মত বেতার-ঘাঁটি গ'ড়ে তুলে নিজেদের কাজ হাসিল

ক'রতে আর অসুবিধা হবে কেন? চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চলে বা অষ্ট্রিয়ায় যে ইহুদীর ছদ্মবেশে অনেক জার্ম্মাণ আগেই ঢুকে ব'সেছিল এ-কথা আজ পরিষ্কার বোঝা গেছে। শেষ পর্য্যন্ত এই সব দেশগুলি জার্ম্মাণীর হাতে তুলে দিতে এরা কিছু কম সাহায্য করে নাই।

গুপ্তচরের কর্ম্মপন্থা

কোন ধরাবাঁধা নিয়মে এই সব গুপ্তচরের কাজ করা চলে না এবং কোন একটা ধারায় বেশী দিন সংবাদ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না, কেননা শত্রুপক্ষ সর্ব্বদাই থাকে বিশেষ সতর্ক আর সন্দিগ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দুই পক্ষের সৈন্যদল বেশ কাছাকাছি ছাউনী ফেলে দাঁড়ায়, তখন দুই পক্ষই চেষ্টা করে বিপক্ষের সৈন্য বাহিনী থেকে যতগুলি সম্ভব অসতর্ক সৈনিককে বন্দী ক'রে আনবার। একবার এই রকম দু'একটি সৈন্য বন্দী ক'রতে পারলে তাদের জেরা ক'রে, লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হ'য়ে থাকে। হয়ত একদল সৈন্য বিপক্ষের দু'একজন সৈন্যকে বন্দী ক'রতে যেয়ে নিজেরাই হ'য়ে প'ড়ল বিপক্ষের বন্দী অর্থাৎ ঘটল উল্টা বিপত্তি। আন্তর্জ্জাতিক আইনে এই বন্দীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলে না যদি তাদের গায়ে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর উর্দ্দী পরা থাকে। অন্য কোন পোষাক প'রে ধরা প'ড়লে নামমাত্র বিচার ক'রে তাদের দেওয়া যেতে পারে মৃত্যুদণ্ড।

শুধু সৈন্যদল যেযেই যে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করে তা কিন্তু নয়। ফলওয়ালা শিবিরে ঢোকে ফল বিক্রি ক'রতে, নাচওয়ালী যায় নাচ দেখাতে, এমনি ক'রে অনেকেই যায় অনেক ভাবে এবং এদের হাত দিয়ে শিবিরের গুপ্ত সংবাদ অনেক সময়ই বিপক্ষ শিবিরে যেয়ে পৌঁছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র কুটের ঘাঁটিতে একদল ইংরাজ সৈন্য একটা নদীর তীরে ছাউনী ফেলে অপেক্ষা ক'রছিল। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে শিবিরের একজন প্রহরী লক্ষ্য ক'রল—নদীর মধ্যে অনেক দূরে একটা মাটির হাঁড়ী ভেসে আসছে। নদীর স্রোতে এমন কত জিনিসই ত ভেসে যায়—প্রহরী কিন্তু তবুও এ সম্বন্ধে সচেতন না হ'য়ে পা'রল না। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে লক্ষ্য ক'রে প্রহরী সৈনিক অবাক হ'য়ে গেল এই দেখে যে হাঁড়ীটি অতি ধীরে ধীরে স্রোতের বিপরীতে শিবিরের দিকে

আসছে। নদীর মধ্যে কোন জিনিষ ত স্রোতের বিপরীত দিকে ভেসে যেতে পারে না!! সন্দেহ বশে হাঁড়ী লক্ষ্য ক'রে সৈনিকটি ছুঁড়ল একটা রাইফেলের

গুপ্তচরকে গুলি ক'রে মেরে ফেলা হ'য়েছে

গুলি। গুলি লেগে এক মুহূর্ত্তেই হাঁড়ীটি ভেঙ্গে গেল বটে—কিন্তু জলের মধ্যে অনেকক্ষণ ধ'রে চ'লল তোলপাড়। অবশেষে সে তোলপাড় থামতে ভেসে উঠল একজন তুর্কী সৈনিকের মৃতদেহ। হতভাগ্য সৈনিকটি অন্যের অলক্ষ্যে নদীর জলে

ভেসে থেকে পাড়ের উপরের শিবির সম্বন্ধে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টায় ছিল—এবং শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবে তাকে প্রাণ দিতে হ'ল। গুপ্তচরেরা যে সব সময় ধরা পড়েই তা নয়; কিন্তু একবার ধরা পড়লে আর গুপ্তচরের নিস্তার নাই। তাদের হাত পা বেঁধে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়।

সংবাদ প্রেরণ

গুপ্তচরেরা সংবাদ সংগ্রহ ক'রতে যত কষ্ট না পায়, তা যথাস্থানে পাঠাতে বেগ পায় তার অনেক বেশী। যুদ্ধের সময় দেশ থেকে যে সব সংবাদ বাইরে যায় বা বাইরে থেকে ভিতরে আসে, কড়া সেন্সার বসিয়ে তার প্রত্যেকটি তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করা হ'য়ে থাকে। একটু সন্দেহ হ'লেই সে সংবাদ প্রচার ক'রতে দেওয়া হয় না। প্রত্যেকখানা চিঠিপত্র সেন্সার থেকে প'ড়ে তবে লোকের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু সব রকম অসুবিধা সত্ত্বেও গুপ্তচরেরা তাদের সংবাদ কর্তৃপক্ষের কাছে ঠিক নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে থাকে। এর জন্য প্রত্যেক দেশেই সাঙ্কেতিক ভাষার (code language) আবিষ্কার হ'য়েছে। তার অর্থ জানা না থাকলে চিঠির উদ্দেশ্য মোটেই বোঝা যায় না। অনেক সময় হয়ত একখানা চিঠির মধ্যে অনুরোধ করা হ'ল, 'আমার অটোগ্রাফের খাতার জন্য তোমার একটা সই চাই—এজন্য সাদা একটা কাগজ পাঠালাম, দয়া ক'রে, সই ক'রে, তারিখ দিয়ে কাগজটা ফেরৎ পাঠাবে।' নিতান্ত নির্দ্দোষ চিঠি—আর একখানা সাদা কাগজ। কাগজখানি মোটেই সাদা নয়, তাতে অনেক গুপ্ত খবর অদৃশ্য কালিতে লিখে দেওয়া হ'য়েছে। আবার কোন সময় হয়ত সংবাদ সংগ্রাহক একটা মুচিকে দিয়ে জুতা সারালেন পথে, এবং তাকে দিলেন একটা টাকা, টাকাটা মুচী জমা দিল ব্যাঙ্কে, আর সেই সাথে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীকে অন্যের অলক্ষ্যে একটু ইসারা ক'রে চ'লে গেল। কোথায়ও সন্দেহ ক'রবার কিছু নেই। কিন্তু এমনি ভাবে অনেক হাত ঘুরে টাকাটা হয়ত গুপ্তচর বিভাগের বড় কর্ত্তার হাতে পৌঁছাল। তিনি টাকাটা ভেঙ্গে ফেলে তার ভিতর থেকে এক টুকরা কাগজ বের ক'রে, পড়ে দেখলেন—তার মধ্যে পেলেন অনেক খবর। আবার হয়ত এক শিল্পী একখানা ছবি এঁকে পাঠালেন বন্ধুর কাছে, বন্ধু পাঠালেন আর একজনের কাছে,

এমনি ক'রে নানা হাত ফিরে ছবিখানি গেল এক কর্তৃপক্ষের দপ্তরে। এই ছবিখানি আসলে কিন্তু গুপ্ত সংবাদে ভরা। জার্মাণ গুপ্তচরের হাতের এমনি একটা ছবি একবার ধরা প'ড়ে গিয়েছিল। সেই ছবিখানার একটা নকল দেওয়া হ'ল। কোন কোন সময় ফলের মধ্যে, বা কেক, রুটি ইত্যাদির মধ্যে ভ'রেও খবর পাঠান হ'য়ে থাকে। নাগরিকগণ যখন বোমার ঘায়ে অতিষ্ঠ হ'য়ে স্থান থেকে
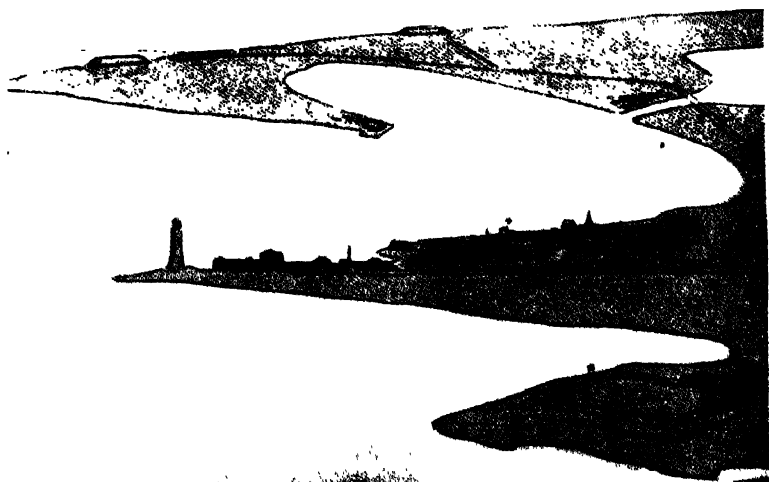
গুপ্তচরের প্রেরিত প্রাকৃতিক দৃশ্য

স্থানান্তরে পালিয়ে বেড়ায়, তখন তাদের দুঃখ দেখলে অতি বড় পাষাণেরও মনে দয়া হয়। মানুষের এই দয়ার দুর্ব্বলতাটুকু উপলক্ষ ক'রেও কত গুপ্তচর যে কাজ হাসিল করে তা বলা কঠিন। এরা গৃহহারা স্বজনবিয়োগবিধুর সেজে তাদের সকল দুঃখের মূল শত্রুসৈন্যের কাছেই অনেক সময় উপস্থিত হয় করুণার জন্য। হয়ত অনেকে দয়া করে—হয়ত অনেকে করে না। যারা দয়া করে তাদের দয়ার সূত্র ধ'রে এরা যতটা পারে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে আনে। পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাচ্ছে এমনিতর একটা মেয়ে গুপ্তচর ধরা প'ড়েছে এবং চরম দণ্ডের জন্য তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে।

ভীত নাগরিকার ছদ্মবেশে মেয়ে গুপ্তচর

গুপ্তচরের বিশেষ গুণ

যারা গুপ্তচর বৃত্তি অবলম্বন করে তাদের হ'তে হয় বিশ্বস্ত, চতুর, এবং ধীর স্থির। লোকের মন ভুলিয়ে যাদের খবর বার ক'রতে হয়, মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের বেশ খানিকটা জ্ঞান থাকা দরকার। তাছাড়া বিপদের সময় যাদের উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় আসে না—এ পথ তাদের জন্য নয়। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল (বয়স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্ত্তক) একবার গুপ্তচরের কাজ ক'রতে গিয়ে ধরা প'ড়ে যান। যখন কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে হাজির করা হ'ল তখন অফিসারটি উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হ'ল। ব্যাডেন পাওয়েল পাহারায় নিযুক্ত সৈনিকটিকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন যে সিগারেট খাওয়া যাবে কিনা। এর উত্তরে সৈনিকটি ব'ললেন যে, কোন আপত্তি নাই। একখানি সিগারেটের কাগজ বের ক'রে তাতে খানিকটা তামাক জড়িয়ে তিনি খানিকক্ষণ বেশ হৃষ্টচিত্তে ফুঁকলেন। তারপর আর একটা সিগারেট শেষ ক'রে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে রইলেন, কারণ ঐ সিগারেটের কাগজ দু'টিতে বিপক্ষের অনেক গুপ্ত খবর তিনি লিখে রেখেছিলেন। শত্রুপক্ষের কোন সন্দেহের উদ্রেক না ক'রে তিনি দিব্বি সেটা পুড়িয়ে ফেললেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই রইল না। এই ভাবে ধীর ও নির্ভীক আচরণের জন্য গুপ্তচরেরা অনেক সময় অনেক বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে থাকে।

গুপ্তচরেরা যে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে পাঠায়, সেগুলি অধিকাংশই হয় সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। যে ভাবে এই সব সংবাদ সংগৃহীত হয় তাতে এরকম হ'তে বাধ্য, সুতরাং এইগুলির উপর নির্ভর করে সৈন্য বাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই সব ছিন্নভিন্ন টুকরা খবরের উপর বিশ্বাসই বা করা যায় কতটুকু। তাই প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় গুপ্তচর দপ্তরে এমনি ভাবে প্রাপ্ত খবরগুলি প্রথমে বাছাই করা হয়, তারপর এগুলিকে সাজান হয়। বিভিন্ন লোক যখন একই খবর পাঠায়, তখন সে খবরে বিশ্বাস করা হয় অনেকটা সহজসাধ্য।

গুপ্তচরের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু অনেক সময় বিপক্ষের গুপ্তচরকে বশীভূত ক'রে এমন সব কাজ করিয়ে নেওয়া হয় যার ফলে শত্রুকে ফাঁদে ফেলা

সহজ হয়। একই কেন্দ্রের চার পাঁচজন গুপ্তচরকে ধ'রতে না পারলে অবশ্য শত্রুকে ধাপ্পা দিয়ে বিপদগ্রস্ত করা কঠিন, কেননা শত্রুপক্ষ ত' একজনের খবরের উপর বেশী আস্থা স্থাপন ক'রে অগ্রসর হবে না।

আকাশ, জল, স্থল, প্রচার ও বিভীষণ বাহিনীর উদ্দেশ্য একই—যুদ্ধ জয়ই এদের লক্ষ্য। আকাশ, জল, স্থল এই তিনটি বাহিনী গঠিত হয় কেবল মাত্র নিজেদের বাছা বাছা লোক নিয়ে, প্রচার বাহিনীরও অধিকাংশ কর্ম্মীই নিজেদের লোক ; কিন্তু বিভীষণ বাহিনী গঠিত হয় শত্রুর দেশে এবং এর অধিকাংশ লোকই শত্রুর দেশের লোক। এরা যে বাস্তবিক পক্ষে কত মারাত্মক শত্রু—এটা বেশ বোঝা যায় এদের উপর শাস্তির বহর দেখে।

প্রত্যেক দেশই চিরটাকাল এই গুপ্তচরদের ঘৃণা ক'রে এসেছে—বোধ হয় চিরকালই ক'রবে। মানুষের এই মক্ষিকাবৃত্তি সভ্য, অসভ্য কেউই কোন দিন সমর্থন করে নাই। তবু এরা চিরকালই ছিল—বিভীষণ ছিল, জয়চাঁদ ছিল, মীরজাফর ছিল—চিরকালই আছে। ভারতে আছে, চীনে আছে, জার্ম্মাণীতে আছে—ইংলণ্ডে আছে, ফ্রান্সে আছে—জগতের সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এরা চিরন্তন সত্যের মত আছে ঘৃণা ও নির্য্যাতনের বোঝা মাথায় নিয়ে।

পরিসমাপ্তি

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে আজকার দিনে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অপরিমিত সমর সম্ভার, অসংখ্য সৈন্য, অগণিত অর্থ সব কিছু পণ ক'রে দু'টি দেশ চেষ্টা করে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবার—শত্রুকে পরাস্ত করবার, কিন্তু এইগুলিই যুদ্ধের সব কিছু নয়। এছাড়া আরও অনেক জিনিস লাগে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রতে।

এখনকার যুদ্ধে শত শত মাইল জুড়ে করা হয় সৈন্যসজ্জা—মাত্র কয়েক মাইল দূরে বিপক্ষ সৈন্যের সম্মুখে দুর্গ প্রকারে অথবা পরিখা কেটে দুই দলই ব'সে থাকে শুভ মুহূর্ত্তের আশায় ও সেই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হ'লেই একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর বিক্রমে। আকাশে উভয় পক্ষেরই বিমান আপ্রাণ চেষ্টা করে প্রাধান্য স্থাপনের, সমুদ্রের বুকে নানা রকমের জাহাজ একে অন্যকে আক্রমণ ক'রে চেষ্টা ক'রে বিপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করবার; কিন্তু এই সৈন্যদল বা বিমান আর যুদ্ধজাহাজই যুদ্ধজয়ের পক্ষে সব কিছু নয়। এখনকার দিনের যুদ্ধে দেশের প্রত্যেকটা লোকের হ'তে হয় যোদ্ধা—সবারই মনে থাকবে শুধু একটা কামনা—যুদ্ধে জয় লাভ ক'রতে হবে—যুদ্ধক্ষেত্রে যাই বা না যাই—আমিও আমার দেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ একজন পুরাদস্তুর সৈনিক। দেশের মধ্যে থেকে আমারও নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য র'য়েছে—এই কর্ত্তব্য যথাযথ পালন ক'রতে না পারলে যুদ্ধ জয় সম্পূর্ণ হবে না—এজ্ঞান থাকা চাই দেশের প্রত্যেকটা নরনারীর।

সমর কৌশল

কিন্তু সব হ'লেও, যুদ্ধের শেষ দায়িত্ব থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যারা হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়ায় তাদেরই উপর। আর এখানে সব চাইতে দরকার স্থির বিচারবুদ্ধি, সমর কৌশল, আর রণচাতুর্য্য। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত সমরবিশারদ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করেন নাই ব'ললে মোটেই ভুল বলা হয় না; কিন্তু দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নকেও শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত ও বন্দী

হ'য়ে নির্ব্বাসিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ ক'রতে হ'ল সেণ্ট্ হেলেনার ক্ষুদ্র দ্বীপে। শুধু সমর কৌশলের জন্যই একক নেপোলিয়ন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতেছেন—আবার এই সমর কৌশলের সামান্য একটু ত্রুটিতেই হ'ল তার পরাজয় সেই সময়ের ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের কাছে। নেপোলিয়ন বেশ বুঝতে পেরেছিলেন সমর কৌশলের গোড়ার কথা—ক্ষিপ্রগতি, আর শত্রুকে হতভম্ব ও ভয়চকিত ক'রে দেওয়া, এবং সামলে নেবার আগেই তার মাথার উপর শেষ আঘাত নিক্ষেপ ক'রে তাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত ক'রে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে সমরনীতিতে নেপোলিয়নই প্রথম অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রাধান্য দেন। এরা চিরকালই ক্ষিপ্র-গতিতে এবং একেবারে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রত শত্রুব্যূহের সব চাইতে দুর্ব্বল স্থানে। এই উদ্দেশ্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকারে নেপোলিয়ন কোন দিনই ইতস্ততঃ করেন নাই। একবার একটা খাদ ডিঙ্গিয়ে শত্রুকে আক্রমণ ক'রতে হবে, কিন্তু খাদ পার হবার কোনই ব্যবস্থা নাই—এদিকে অপেক্ষা করা চলে না—সময় দেওয়া মানেই শত্রুকে সবল হ'বার সুযোগ দেওয়া! নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত সমরনায়কগণ চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়লেন কি করা যায়—নেপোলিয়নকে সংবাদ দিতেই নেপোলিয়ন আদেশ ক'রলেন—অশ্বারোহী বাহিনীকে এগিয়ে দিতে খাদের মধ্যে। সেনাপতিমণ্ডলী হতবুদ্ধি হ'য়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রতে লাগলেন—তাদের চোখেমুখে একই প্রশ্ন—কিন্তু 'তার পর?' তারপর কি—সেটা অত্যন্ত মৃদু স্বরে বুঝিয়ে দিলেন ফরাসী সম্রাট নিজে—অগ্রগামী অশ্বারোহী দল খাদে প'ড়ে ম'রবে, আর তাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে এগিয়ে যাবে 'বোনার' দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্জয় বাহিনী। শেষ পর্য্যন্ত হ'লও তাই—আক্রান্ত হ'য়ে শত্রু সৈন্য প্রথমে বুঝতেই পারল না—কি ক'রে নেপোলিয়নের বাহিনী খাদ ডিঙ্গাল—তাদের এই বিস্ময় কেটে যাবার আগেই প্রচণ্ড আক্রমণে তারা ছত্রভঙ্গ হ'ল। এই হ'ল সমর কৌশল—ইংরাজীতে যাকে বলে 'ষ্ট্র্যাটেজি' (Strategy)।

ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী তাদের সমর কৌশলের ত্রুটি। এই যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফরাসী, ইংরাজ ও আমেরিকার বিশিষ্ট সমর নায়কগণ ভেবেছিলেন, ট্যাঙ্ক বাহিনী হবে পদাতিক দলের পরিপূরক

—আক্রমণকারী পদাতিক দলকে সাহায্য করাই হবে ট্যাঙ্ক বাহিনীর কাজ, কিন্তু জার্ম্মাণ সমরবিশারদেরা স্থির ক'রেছিলেন ট্যাঙ্ক দিয়ে প্রথম আক্রমণ চালিয়ে পদাতিকের সাহায্যে বিজিত স্থানগুলি দখলে রাখতে হবে। তাঁরা এইভাবেই চালিয়েছিলেন তাদের আক্রমণ—এবং শেষ পর্যান্ত বিংশ শতাব্দীতে এই নূতন সমর কৌশলই কার্য্যকরী হ'তে দেখা গেল।

সমর কৌশল নির্দ্ধারণ করেন প্রত্যেক দেশের উর্দ্ধতন সমর-পরিষদ এবং তারাই থাকেন জয় পরাজয়ের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। সমর কৌশল ঠিক করবার পূর্ব্বে অভিজ্ঞ সমরবিশারদেরা প্রথম চিন্তা করেন কি ধরণের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে, ঠিক কোন মুহূর্ত্তে কি ধারায় আক্রমণ ক'রলে শত্রু বিপন্ন হবে, শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ কেমন ক'রে ব্যর্থ ক'রে দেওয়া যাবে—এই সব। সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ স্থলবাহিনী, জলবাহিনী, আকাশবাহিনী এদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবেচনা ক'রে, শত্রুর উপর কতটা অর্থনৈতিক অবরোধ চালান যাবে এবং তাতে শত্রু কতটা দুর্ব্বল হবে, ধীর ভাবে চিন্তা ক'রে ঠিক করা হয় এই সমর কৌশল—অর্থাৎ একটা জাতির বাঁচামরার শেষ চেষ্টা।

রণচাতুর্য্য

সমর পরিষদের আলোচনায় সমর কৌশল ঠিক হ'য়ে গেলে, যখন সত্যকার যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীর অধিনায়কেরা এই সমর কৌশল অনুযায়ী নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলকে দরকার মত অনেক নূতন নূতন কৌশল অবলম্বন ক'রতে হয়, অনেক নূতন নূতন কায়দার প্রবর্ত্তন ক'রে যুদ্ধ চালাতে হয়, এটা সব সময় মনে রাখা দরকার। এই গুলিকে ইংরাজীতে বলে ট্যাক্‌টিক্‌স্ (Tactics) বাংলায় আমরা ব'লতে পারি রণচাতুর্য্য। রণচাতুর্য্য আর সমর কৌশল প্রায় একই ধরণের—কথায়ও বটে কাজেও বটে। কিন্তু এদু'টাকে কোন মতেই এক ক'রে ফেলা চলে না। সমর কৌশল হ'ল গোটা যুদ্ধের কার্য্যকরী নীতি, আর রণচাতুর্য্য হ'ল এই নীতি পালন ক'রে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন বাহিনীর বাস্তব কার্য্যকলাপ।

সমর কৌশলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় যুধ্যমান জাতিসমূহের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ এবং সমরনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ। রণচাতুর্য্যের সঙ্গে কূটনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ব্যাপারের কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা কেবলমাত্র সমরনৈতিক কার্য্যকলাপ। বিশেষ একটা উদাহরণ নিয়ে বিচার ক'রলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা সহজ হ'তে পারে। ধরা যাক বর্ত্তমান জার্ম্মাণ ইংরাজ যুদ্ধের কথা। ইংরাজের সমরপরিষদ নানা বিষয় চিন্তা ক'রে স্থির ক'রলেন—যুদ্ধে জয়লাভ ক'রতে হ'লে জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক অবরোধ সংঘটন করা দরকার—এই সিদ্ধান্ত হ'ল সমর কৌশল; এই সমর কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে হয়ত সুয়েজ খালের মুখে একখানা জার্ম্মাণ জাহাজ আটক ক'রে ইংরেজ নৌ বাহিনীর কোন একজন কাপ্তেন জাহাজখানি খানাতল্লাস ক'রলেন এবং দরকার মত তাকে আটক ক'রে রাখলেন—এই কাজগুলি হ'ল রণচাতুর্য্য

সমরপরিষদ

সমর কৌশলের মধ্যে যুদ্ধের মূলনীতি নির্দ্ধারণের প্রশ্ন এসে পড়ে বলেই সমর-পরিষদ কখন শুধুমাত্র নিপুণ ও বহুদর্শী যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত হয় না—এতে সমর বিশেষজ্ঞও থাকেন, আবার বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞও থাকেন। এই সব রাজনীতিজ্ঞদের ভিতরে অনেকে হয়ত হাতে কলমে যুদ্ধ কোনদিনই করেন নাই, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে এই সব রাজনীতিজ্ঞেরা সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নেন, তাছাড়া এই সব সম্বন্ধে তারা সহকর্ম্মী সমর বিশেষজ্ঞদের উপরই ষোলআনা নির্ভর করেন।

এইত গেল সমরপরিষদের কথা। এবারে আধুনিক কালের সমর কৌশল সম্বন্ধে দু'একটা কথা আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। সব যুদ্ধেরই গোড়ার কথা, "মারি অরি পারি যে কৌশলে"। আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ওয়াশিংটন আরভিং দেড়শ' বছর আগে ব'লেছিলেন—স্বভাবতঃই যুদ্ধের মূল নীতি হ'ল নিজে সব চাইতে কম ক্ষতি সহ্য ক'রে শত্রুর সব চাইতে বেশী ক্ষতি করা এই যদি হয় যুদ্ধের গোড়ার কথা, তা হ'লে প্রথমেই দেখতে হবে কি ক'রে যুদ্ধে

করা যায় অল্পকাল স্থায়ী, কারণ যুদ্ধ বেশী দিন স্থায়ী হ'লেই অতি স্বাভাবিক ভাবে ক্ষতিও হবে বেশী।

এখনকার দিনে সব রাষ্ট্রই কমবেশী বাণিজ্যপন্থী। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ক'রতে হ'লে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মন না দিলে চলে না, আর সরকারী সাহায্য না পেলে ব্যবসা বাণিজ্যেও উন্নতি করা যায় না. সুতরাং রাষ্ট্রের পক্ষে বাণিজ্যপন্থী হওয়া ছাড়া উপায় নাই। সত্যি কথা ব'লতে গেলে আজকের দিনের সব যুদ্ধের মূলে র'য়েছে এই বাণিজ্যের প্রশ্ন। বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত হ'বে ব'লে এক দেশ আর এক দেশ অধিকার করে—শক্তিমান এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বাণিজ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে। এই জন্যই এখনকার দিনে যুধ্যমান প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমরপরিষদ সর্ব্বপ্রথম বিবেচনা করেন—কি ভাবে শত্রুর বাণিজ্য ব্যবস্থা ওলট পালট ক'রে দেওয়া যায়—সমর কৌশল নির্দ্ধারণ ক'রতে ব'সে এইটিই হয় তাদের সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য বিষয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথমদিকেই এক দেশ চেষ্টা করে আর এক দেশকে 'ব্লকেড' ক'রতে—অর্থাৎ তার সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ ক'রতে।

সমর কৌশলের আরও একটা মূলনীতির আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে প্রত্যেকেই যে নিজের নিজের দল ভারী ক'রতে চেষ্টা ক'রবে এবং এই উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষই যে পৃথিবীব্যাপী প্রচার কার্য্য আরম্ভ ক'রবে—এটা অতিশয় স্বাভাবিক, কিন্তু এইটাই সব কথা নয়। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় দুই দেশই চেষ্টা করে কতকগুলি বন্ধু রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ রাখতে। এতে তাদের সুবিধা হয় অনেক কিছু, কারণ শত্রুর ব্লকেড ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বাণিজ্য পথ অটুট রাখা, দেশ বিদেশে প্রচার কার্য্য চালান অথবা শত্রুর গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করার জন্য এই নিরপেক্ষ বন্ধুরাষ্ট্রের সাহায্য হয় মূল্যবান। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায়ই শত্রু যাতে এ সুবিধা না পায় এই ভাবে সমর কৌশল নিয়ন্ত্রিত হয় প্রত্যেক দেশের। যদি প্রচারকার্য্য চালিয়ে, লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বা হুমকি দিয়েও কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে নিজের দলে না আনা যায়, তবে সোজাসুজি আক্রমণ ক'রে তাকে যুদ্ধঘোষণা ক'রে শত্রুশ্রেণীতে যেতে বাধ্য করা

হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণী এইভাবে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, লুক্সেমবার্গ প্রভৃতির নিরপেক্ষতা নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

নিজের বন্ধুরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা আর শত্রুর বন্ধু রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা নষ্ট করা—অর্থাৎ তার মুখোস খুলে দেওয়া—আধুনিক কালের একটি সদাস্বীকৃত সমর কৌশল।

মন্ত্রগুপ্তি

যুদ্ধের সময় কি আকাশে, কি জলে, কি স্থলে প্রত্যেক বাহিনীকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা, দু'রকম কাজই ক'রতে হয়। আক্রমণের সময় চাই শত্রু সৈন্যকে বিস্মিত ক'রে দেওয়া, আর এর জন্য চাই আক্রমণকারী বাহিনীর মন্ত্রগুপ্তি। বিরাট একটা বাহিনীকে গোপনে চালনা করা কত কঠিন—এটা কল্পনা করাও সহজ নয়, *এইজন্যই* সৈন্যদলকে ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন কাজে লাগান হয়। আর ঠিক কাজ করবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাদেরও জানতে দেওয়া হয় না যে ঠিক কি কাজ তাদের ক'রতে হবে। একদল সৈন্যকে পাঠান হ'ল পথ থেকে শত্রুর রসদ লুটে আনতে। একজন উপযুক্ত নেতার অধীনে বিশ পঁচিশ জন সৈন্যকে হয়ত পাঠান হ'ল এই উদ্দেশ্যে, নেতাটিকে ডেকে, বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল তার কি কর্ত্তব্য এবং কি ভাবে সে তা ক'রবে—আর কে কে তার সঙ্গে যাবে। আর কাউকে কিছু বলা হ'ল না। নেতাটি সৈন্যদলকে নিয়ে এগিয়ে চ'ললেন, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না কোথায়। এক জায়গায় এসে নেতা ব'ললেন—'থাম'। বাস্, সবাই থেমে গেল; নেতাটি তাদের সাজিয়ে রাখলেন একেবারে বন্দুক বাগিয়ে। এরপর চলল প্রতীক্ষার পালা। শত্রুর রসদ বোঝাই গাড়ী সামনে এলেই ঠিক দরকারের সময় তিনি হুকুম দিলেন—'গুলি করো'—তারপর চলল গোলাগুলি দুপক্ষ থেকে, আর তখনই সৈন্যেরা বুঝতে পেল কেন তারা এখানে এসেছিল এবং কেনই বা তারা এতক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রছিল।

কনস্ক্রিপশন

এর পরেই আসে সৈন্যসংখ্যা অর্থাৎ জনবলের কথা। নানারকম নূতন ও ভীষণ মারণাস্ত্র আবিষ্কার আর তার প্রয়োগ হ'লেও, সমর কৌশল কার্য্যকরী

ক'রতে হ'লে জনবলকে বাদ দেওয়া চলে না। শান্তির সময় কোন দেশেই সৈন্য-সংখ্যা বেশী থাকে না ; কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রথমেই দরকার হয় প্রচুর সৈন্য। তারা কেউবা আকাশে, কেউবা জলে, কেউবা মাটিতে দাঁড়িয়ে শত্রুর সাথে বোঝাপড়া করে। এই সৈন্যবল গ'ড়ে তোলবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হ'বার আগেই অথবা হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'লে, সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সমর্থ পুরুষদের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে যুদ্ধবিদ্যা শিখান হয়—যাতে দরকার মত দেশের প্রত্যেকটা লোক শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে দেশের মর্য্যাদা রাখতে পারে। এর জন্য দরকার হ'লে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ আইন পাশ ক'রে লোককে বাধ্য করে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে। এই বিশেষ আইনকে ইংরাজীতে বলা হয় 'কনস্ক্রিপশন্' (Conscription)। আজ যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে এর জন্য গত বৎসরই ইংলণ্ডে এমনিতর কনস্ক্রিপশন্ জারী করা হ'য়েছে।

যুদ্ধব্যয়

আধুনিক যুদ্ধ অতি স্বাভাবিক কারণেই হ'য়ে প'ড়েছে ব্যয়বহুল, আর সেই জন্যই যুধ্যমান জাতির ধনবল সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত মনে হয়। আজকালকার যুদ্ধের খরচ সম্বন্ধে এক জায়গায় একটু আভাষ আমরা দিয়েছি। শুধু যুদ্ধের খরচ এখন ইংলণ্ডের হ'চ্ছে দৈনিক প্রায় চৌদ্দ কোটি টাকা। প্রতিপক্ষেরও এর চাইতে বেশী ছাড়া কম খরচ হ'চ্ছে না—একথা অনায়াসেই মনে করা চলে। প্রত্যেক দেশই এই বিরাট ব্যয়ের জন্য দু'রকম ব্যবস্থা করে:—চারিদিকে খরচ কমিয়ে, নানা রকম কর বসিয়ে, সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় ক'রে যুদ্ধ-ব্যয় মিটাবার ব্যবস্থা করে। আর বন্ধুস্থানীয় রাজ্যগুলির কাছে নগদ অর্থ ধার ক'রে অথবা নানারকম আবশ্যকীয় মাল বাকীতে কিনে যুদ্ধের বাড়তি খরচ সঙ্কুলান করে।

যুদ্ধের সময় লোককে চারিদিকে খরচ কমাতে বাধ্য করা হয়। টাকার জোরে তখন যা খুসী ক'রতে দিতে কোন গভর্ণমেণ্টই রাজী হয় না, কারণ একদিকে যেমন ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজন হয় অন্যদিকে তেমনিই ইচ্ছা ক'রলেই বা টাকা দিলেই যে কোন জিনিষ, বিশেষ ক'রে ধাতু ও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। খাদ্যদ্রব্য না থাকলে যুদ্ধ একদিনও চালান যায় না ব'লে যুদ্ধে নামবার পূর্ব্বেই দেশে দু'চার

বছরের খাদ্যদ্রব্য আমদানী ক'রে মজুত রাখা হয়। কড়া আইন জারী ক'রে সব গভর্ণমেণ্টই লোকজনকে মেপে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন—এমন কি সাধারণভাবে মানুষের খাদ্যদ্রব্যে ভাগ বসাতে পারে এমন গৃহপালিত পশুগুলিকে পর্য্যন্ত মেরে ফেলা হয়, অথবা দেশের বাইবে বিক্রি ক'রে দেওয়া হয়। মানুষকে বাঁচতে হবে ঘোরতর দুর্দ্দিনের মধ্যে—সে সময় যদি নিজের বাঁচবার তাগিদে এই পশুপক্ষীকে বাঁচতে দিতে মানুষ নারাজ হয়—তবে তার ততটা দোষ নিশ্চয়ই দেওয়া যায় না।

ধ্বংসস্তূপ থেকে লোহা বেছে নাগরিকেরা গাড়ীতে বোঝাই ক'রছে

যুদ্ধ যুদ্ধই। দয়া মায়া শোক দুঃখ ভুলে মানুষকে একই কামনা নিয়ে বাঁচতে হয়, "যুদ্ধে জয়লাভ করব"। চোখের উপর বন্ধুবিয়োগ দেখেও মানুষকে সব ভুলে বন্দুক বাগিয়ে দাড়াতে হয় শত্রু ধ্বংস ক'রতে; সামনের উপর বাড়ী ভেঙ্গে প'ড়লে নিজেরই সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে খুঁজে বের ক'রতে হয় লোহার টুকরা—যা ভবিষ্যতে লাগতে পারে যুদ্ধের কাজে। ইংলণ্ডের উপকূলস্থ এক সহরে

বোমাবর্ষণ হওয়ার পর লণ্ডনে পাঠাবার জন্য লৌহখণ্ডগুলি সহরবাসীরা নিজেরা ষ্টেশনে এনে জমা ক'রেছে, এবং নিজেরাই তা আবার বেছে গাড়ীতে বোঝাই ক'রছে—এমনি একটা ছবি কিছুদিন আগে দেখা গিয়েছিল। এই লোহা সংগ্রহের জন্য জাতিকে কতটা ত্যাগ স্বীকার ক'রতে হয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়—লণ্ডনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'ক্রিষ্টাল প্যালেস' নষ্ট ক'রে তার লোহা যুদ্ধের কাজে লাগান থেকে। এই একই কারণে লণ্ডনের বিখ্যাত 'হাইড পার্কের' বিখ্যাত রেলিং পর্য্যন্ত খুলে নেওয়া হ'য়েছে যুদ্ধে লোহার প্রয়োজন মেটাতে।

বার্ত্তা বিনিময়

যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে বার্ত্তা বিনিময় একটা সমস্যা, অথচ সব চাইতে বেশী প্রয়োজনীয়। বেতারে সংবাদ বিনিময়ের ব্যবস্থা হওয়ার আগে সাধারণতঃ নানা রংয়ের নিশান উড়িয়ে বা বেরংএর আলো জেলে করা হ'তো এই কাজ। বেতার বার্ত্তা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভাবলেন এইবারে বুঝি সমস্যার সমাধান হ'লো; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল এতেও সমস্যার পূর্ণ সমাধান হ'লো না। কেন তাই বলি। প্রথমতঃ, শত্রুর সাঙ্কেতিক ভাষার কম বেশী পাঠোদ্ধার চেষ্টা ক'রলে করা যায় ব'লে এ ব্যবস্থায় সংবাদ পাঠান নিরাপদ নয়. দ্বিতীয়তঃ, সঠিক যুদ্ধের সময় বেতারবিদের উপর এত চাপ পড়ে যে সব খবর সংগ্রহ করা হ'য়ে পড়ে কঠিন, আর তৃতীয়তঃ, শত্রুপক্ষ এই বেতারের শব্দ নিজেদের বেতারে গোলমেলে শব্দ ক'রে নষ্ট ক'রে দেয়। এই জন্যই শত্রুর সামনাসামনি এসে কেউই বেতারে সংবাদ পাঠায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল যখন এসে দাড়ায় তখন অবশ্য টেলিফোন যোগেই চলে তাদের কথা বার্ত্তা, কিন্তু যুদ্ধের সময় অগ্রবর্ত্তী গাড়ী বা ট্যাঙ্ক বাহিনীর সঙ্গে যোগ রাখা হয়, সম্ভব হ'লে, বেতারে অথবা আলো নিশানের সাহায্যে।

দিনের বেলায় আলো যত রং বেরংএরই হোক,—দেখা যায় না কিছুতে। নিশান দিয়ে অনেক দূরেও কিছু খবর পাঠান যায় না। তখন যে ভাবে বার্ত্তা বিনিময় হয় তাহাকে বলে 'হেলিওগ্রাফ'—সূর্য্যের আলো প্রতিফলন ক'রে সাঙ্কেতিক কোডের সাহায্যে চলে এই হেলিওগ্রাফ।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বার্ত্তা বিনিময়ের জন্য সুদূর অতীতকালে পায়রা ব্যবহারের কথা আমাদের দেশে শোনা যায়। বর্ত্তমান কালেও—এর ব্যবহার একেবারে উঠে ত' যায়ই নাই বরং বেড়ে গেছে মনে করা যেতে পারে। ছোট্ট একটি হাল্কা এ্যালুমিনিয়ামের কেসের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ লেখা কাগজের টুক্‌রা ভ'রে শিক্ষিত পায়রার পায়ে সেটা বেঁধে দেওয়া হয় এবং ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে এই সব বার্ত্তা-বাহক চারশ' পাঁচশ' মাইল দূরে যেয়ে স্বপক্ষ শিবিরে উপস্থিত হয়। আজকাল আবার এই সব ছোট ছোট পায়রার পায়ে হাল্কা ক্যামেরা বেঁধে দিয়ে তাদেরকে পাঠান হয় শত্রু শিবিরের উপর দিয়ে। এইসব আধুনিক উন্নত ক্যামেরায় বিশেষ ব্যবস্থা আছে যাতে ঠিক সময়মত, শত্রুশিবিরের ছবি ক্যামেরায় ধরা প'ড়বে।

বিজ্ঞানের ক্রমশঃ উন্নতি হ'চ্ছে ব'লে আধুনিক কালের যুদ্ধেও ক্রমশঃ বেশী বেশী মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র আর মারণাস্ত্রের প্রয়োগ হ'চ্ছে। সাধারণ নাগরিক জীবনেও যেমন, যুদ্ধের মত একটা অস্বাভাবিক অবস্থাতেও তেমনিই মানুষ চাইছে যন্ত্রের সাহায্যে সব কাজ মিটিয়ে নিতে। আবার একদিকে লোকে যতই মারণাস্ত্র আবিষ্কার ক'রছে, অন্যদিকে তেমনই তার প্রতিরোধকও আবিষ্কার হ'চ্ছে। বিমান বাহিনী সম্বন্ধে আলোচনায় বলেছি শত্রুর দেশে বিমান আক্রমণ চালাতে যেয়ে হোক বা জঙ্গীবিমান নিয়ে তাকে প্রতিরোধ ক'রতে যেয়েই হোক, একখানি বিমান ধ্বংস হ'লেই চার পাঁচ জন অভিজ্ঞ বিমানযোদ্ধা মারা যাওয়ার অথবা শত্রুর হাতে বন্দী হ'বার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এইজন্য সব দেশই এমন বিমান প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় লেগেছে যে তাতে বৈমানিকের সংখ্যা থাকবে খুবই কম। এখন অবশ্য এক যোদ্ধার জঙ্গীবিমান অনেক ব্যবহার করা হ'চ্ছে -কিন্তু এতেও বিমানের উন্নতির শেষ হয় নাই। এখন সব দেশই চেষ্টা ক'রছে কি ক'রে বিনা যোদ্ধার বিমান ব্যবহার করা যায়। এ চেষ্টায় কতকটা সফলতা যে লাভ করা না গিয়েছে তাও নয়। ইংরাজদের 'কুইন বি' (Queen Bee) জাতীয় উড়ো জাহাজগুলি ঠিক এই ধরণের। এই সব বিমানগুলিতে কোন চালক দরকার হয় না। নীচ থেকে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে এগুলি চালান যায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে ঠিক যে যে কারণে বেতারে সংবাদ আদান প্রদানে অসুবিধা ঘটে, এইসব বিমান চালাতেও

ঠিক সেই সব অসুবিধাই হওয়া সম্ভব। তা ছাড়া আর একটা কথাও ভেবে দেখতে হবে। সত্যিকারের যুদ্ধের সময় শত্রু যদি চোখের উপর না থাকে, তবে যুদ্ধ চালান অসম্ভব। ঠিক তেমনিই অসম্ভব বোমা ফেলা যদি লক্ষ্যবস্তু থাকে অনেক দূরে—দৃষ্টির বাইরে।

প্রার্থনারত সৈন্যদল

দিন দিন আরও হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষ ক'রবে, নূতন নূতন অস্ত্রও একটার পর একটা আরও আমদানী হবে, তাদের রোধ করবারও তেমনি নূতন নূতন ব্যবস্থা বের হবে—কিন্তু সেগুলি যে সত্যসত্যই কি, বিজ্ঞানের কোন ছাত্র সে সম্বন্ধে এখনই কোন ভবিষ্যৎ বাণী ক'রতে পারে না। কল্পনা ও ও বিজ্ঞানে এইখানেই তফাৎ।

যুদ্ধ ও হত্যা

যুদ্ধ ও হত্যা—একটা থেকে কোন দিনই আর একটাকে পৃথক্ ক'রে দেখা যায় না—ভবিষ্যৎ কালেও কোন দিন তা হবে না। যুদ্ধ ক'রতে যারা নামে তারা বেঁচে থাকার পথ পরিষ্কার রাখতেই যুদ্ধে নামে—বেঁচে থাকার প্রেরনায়ই তারা নিজেরা মরে, পরকেও হত্যা করে। চিরকাল পৃথিবীতে এইই হ'য়ে এসেছে, চিরকালই এইই হ'বে। এই বেঁচে থাকার আগ্রহেই অনন্ত আকাশের নীচে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে ক'রেও তারা নীরবে প্রণাম জানায় তারই চরণে যিনি ব'লেছেন একটা কথা

'Hurt not thy neighbours

'তোমার প্রতিবেশীকে আঘাত করিও না।'

পরিশিষ্ট

আজকালকার দিনের যুদ্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির কতখানি সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে এবং বৈজ্ঞানিকদের নিত্তনৈমিত্তিক আবিস্কারগুলি নির্ব্বিচারে কেমন ক'রে শত্রু-নিধনে ব্যবহার করা হ'চ্ছে, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা আগের পৃষ্ঠাগুলিতে দেওয়া হ'য়েছে। এবারে দু এক কথায় আলোচনা ক'রতে চেষ্টা ক'রব সেই সব জিনিষগুলি সম্বন্ধে, যে গুলির সাহায্য বর্ত্তমান কালের যুদ্ধকে কঠোরতর আর কঠিনতর ক'রে তুলেছে। প্রথমে ধরা যাক্ এরোপ্লেনের কথা।

এরোপ্লেন

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেদিন প্রথমে দেখল যে সে মাটির বুক ছেড়ে আকাশের দিকে এক পা উঠতে পারে না অথচ ডানাওয়ালা জীব পাখী অনন্ত আকাশে যদৃচ্ছা ভেসে বেড়াতে পারে সেইদিন থেকেই তার অন্যতম সাধনা হ'ল "কেমন ক'রে উড়তে পারব।" আজ মানুষ আকাশে ইচ্ছামত উড়ে বেড়ায়, ঘণ্টায় সে আকাশের বুকে ছুটতে পারে চারশ' মাইল বেগে, কিন্তু এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রতে তার কিছু কম দিন লাগে নাই।

রামায়ণে দেখা যায় রাবণের পুষ্পক রথের কথা, ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ করার গল্প। এমনি ধরণের কথা গ্রীক পুরাণেও আছে। সেখানে যে গল্পটি আছে সেটা হ'চ্ছে এই যে, সে দেশে ডিডেলাস্ ব'লে ছিল এক অতি চতুর শিল্পী। একবার কি একটা কারণে রাজরোষে প'ড়ে ডিডেলাস্‌কে যেতে হ'ল কারাগারে কিন্তু তার শিল্পিমনই তাকে কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার পথের সন্ধান দিল। দুখানা মোমের ডানা তৈরী ক'রে দেহের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ডিডেলাস্ শেষ পর্য্যন্ত কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল। ডিডেলাস্ তার ছেলে আইকেরাস্‌কে শিখিয়ে গেল এই আকাশে ওড়ার বিদ্যা আর সেই সূত্রে তাকে উপদেশ দিল যেন সে কোন কারণেই আকাশে খুব উপরেও না ওঠে আবার বেশী নীচ দিয়েও না চলে। অনেক উপরে উঠলে সূর্য্যের তাপে মোমের

ডানা গ'লে যাবার যেমন ভয় আছে—আবার বেশী নীচে নামলে সমুদ্রের ঢেউ লেগে তেমনি ডানা ভিজে যাবার র'য়েছে সম্ভাবনা। শেষ পর্য্যন্ত আইকেরাস্ কিন্তু একটু একটু ক'রে অনেক উপরে উঠেছিল আর পুরাণকারের মতে মোম গ'লে প'ড়ে গিয়েছিল এজিয়ান সাগরে। এসব হ'ল পুরাণের অর্থাৎ—খৃষ্টের জন্মের অনেক আগের ঘটনা।

প্রায় সাতশ' বছর আগে রজার বেকন (Roger Bacon) নামে একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের লেখার মধ্যে ছিল একটা প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ বাণী। রজার বেকন লিখে গিয়েছিলেন "মানুষ একদিন এমন যন্ত্র তৈরী ক'রতে পারবে যার মধ্যে ব'সে যন্ত্রের কল-কব্জার সাহায্যে দুখানা কৃত্রিম পাখা চালিয়ে সে আকাশে পাখীর মত ভেসে বেড়াতে সক্ষম হবে।" এ ভবিষ্যৎ বাণী যে সফল হ'য়েছে তা বেকন দেখতে না পেলেও আমরা বেশ দেখতে পারছি।

ঠিক কি ভাবে প্রথম বিমান আবিষ্কার হ'ল এবং কি ভাবেই বা তা আজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে সেই কথা বলি। উড়বার জন্য মানুষ প্রথম যে যন্ত্র তৈরী ক'রেছিল সে ছিল বেলুন জাতীয়। মন্টিগলফায়ার পরিবারের দুই ভাই একদিন এক চিমনীর পাশে ব'সে গল্প ক'রছিলেন—নিতান্ত পারিবারিক আলোচনা—তার মধ্যে বিজ্ঞানের কথা ছিল না একটাও। কথা ব'লতে ব'লতে দুই ভাই লক্ষ্য ক'রলেন কতকগুলি কাগজের ঠোঙ্গা মাটি থেকে আপনা হ'তে ক্রমাগত উপরে উঠতে উঠতে শেষ পর্য্যন্ত চিমনীর মুখ পর্য্যন্ত যাচ্ছে এবং হঠাৎ চিমনীর মধ্যে যেয়ে প'ড়ে একেবারে পুড়ে ভস্মে পরিণত হ'চ্ছে। মন্টিগলফায়ার ভ্রাতৃদ্বয় এ থেকে সিদ্ধান্ত ক'রলেন আগুনের তাপে বাতাস গরম হ'চ্ছে ব'লে ঠোঙ্গার মধ্যেকার বাতাস হ'চ্ছে পাৎলা, আর তারই জন্য ঠোঙ্গাটা বাতাস ঠেলে উপরে উঠছে। তাঁদের মনে ধারণা হ'ল পাৎলা বাতাস ভ'রে দিতে পারলে এমনিধারা পাৎলা রবারের ঠোঙ্গাও আকাশে উঠতে পারবে। এই থেকেই হ'ল বেলুনের উৎপত্তি আর বেলুনের সূত্র ধ'রে জেপ্‌লিনের আবিষ্কার।

এই বেলুন অথবা জেপ্‌লিনের মূল তথ্য কি? এগুলি আকাশে ভাসে কেন? এগুলিতে থাকে বাতাসের চাইতে পাৎলা গ্যাস এবং সেইজন্য এগুলি

নীচে ঘন বায়ুর মধ্যে নামতে পারে না, বরঞ্চ বায়ুর ঊর্দ্ধচাপে ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে। প্রথম দিকে পরীক্ষার জন্য যে সব বেলুন আকাশে উঠত, তার নীচে থাকত একটা খাঁচা এবং সেই খাঁচাতে লোক ব'সত মাত্র দু এক জন। পরে যখন জেপ্‌লিন আবিষ্কার হ'ল তখনও তার নীচে জুড়ে দেওয়া হ'ল এক একখানা খাঁচা আর এতেই হ'ল আরোহীদের ব'সবার ব্যবস্থা।

বেলুন-বিমান চালাতে যে বিপদ না ঘটে তা কিন্তু নয়। অল্পদিন আগেও ইংরাজদের জেপ্‌লিন জাতীয় উড়ো-জাহাজ 'আর ১০১'—(R 101) ধ্বংস হ'য়ে মোট আটচল্লিশ জন আরোহীর জীবনান্ত ঘটে এবং সেই দুর্ঘটনায় তৎকালীন বিমান-মন্ত্রী লর্ড টমসন্ আর স্যার সেফটন্ ব্র্যানকার নিহত হন। অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তরাজ্যেরও এমনিতর বিরাট পোত 'অ্যাক্রোন' নষ্ট হয় চুয়াত্তর জন লোক নিয়ে। আর ১০১ ধ্বংস হওয়ার পর ইংলণ্ডে এই ধরণের বিমানপোত নির্ম্মাণ বন্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমেরিকাতে এখনও এ চেষ্টা সমানভাবেই চ'লেছে।

এরোপ্লেন আবিষ্কারের পর বেলুন-বিমান ব্যবহারের কোন সার্থকতা আছে কিনা এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে। যারা এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিমান পোত ব্যবহারের পক্ষপাতী তারা বলেন এর ব্যবহারে প্রধানতঃ পাঁচটি সুবিধা আছে। (১) এরোপ্লেনের চাইতে অনেক সহজে এই বেলুন-বিমানগুলিকে ঘোরান ফেরান সম্ভব, বিশেষ ক'রে আকাশে উঠতে পারে এগুলি অতি সহজে। (২) এতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেশী অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ রাখা চলে। এরোপ্লেন আয়তনে ছোট হয়, তার মধ্যে আবার থাকে অনেক রকম কলকব্জা। সুতরাং তাতে যত ভার বহন করা সম্ভব হয়, জেপলিন্ জাতীয় বিমানে তার চাইতে অনেক বেশী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা চলে অর্থাৎ এগুলির ভারোত্তলনের ক্ষমতা হয় এরোপ্লেনের চাইতে অনেক বেশী। (৩) এই সব বেলুন-বিমান বাতাসের মধ্যে অনেকক্ষণ এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে। এরোপ্লেনে কোন রকমেই এটা হ'তে পারে না। তার পক্ষে এক জায়গায় পাঁচ সাত সেকেণ্ডের বেশী দাঁড়ান অসম্ভব। বেলুন-বিমানগুলি একস্থানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে ব'লে এ থেকে বোমা ফেলার সুবিধা হ'তে পারে অনেক বেশী, আর এই জন্যই লক্ষ্যস্থির

ক'রে কামান বন্দুক চালিয়ে যুদ্ধ করারও এগুলিতে যথেষ্ট সুবিধা হয়। (৪) এগুলি এরোপ্লেনের চাইতে একটানা বেশী সময় আকাশে থাক্‌তে পারে এবং (৫) বেলুন-বিমান এরোপ্লেনের চেয়ে অনেক সহজে রাত্রিকালেও চলাচল ক'রতে পারে।

এরোপ্লেনের কল কব্জার উন্নতি হওয়ায় অবশ্য এখন রাত্রেও এরোপ্লেন চালান যায়, কাজেই সেদিক থেকে বেলুন বিমানের বিশেষ কিছু সুবিধা র'য়েছে ব'লে দাবী করা চলে না। অনেক রকম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এখন এরোপ্লেন ও জেপ্‌লিনের সুবিধা অসুবিধার তুলনা করা হ'চ্ছে এবং তার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে সব কিছু বিবেচনা ক'রে এরোপ্লেনই বেশী সুবিধাজনক।

এরোপ্লেনের আদিম ইতিহাস এক রকম ব্যর্থতারই ইতিহাস। তবুও সে ইতিহাসের আলোচনা করার দরকার আছে, কারণ তা থেকে অতি পরিষ্কার বোঝা যায় যে সাধনা দ্বারা মানুষ কত দূর এগুতে পারে। এই উপলক্ষে ইংরাজ বিমানবিদ্‌ সার জর্জ্জ কেলীর নাম উল্লেখ করা দরকার সবার আগে। এরোপ্লেন চালনার মূল সূত্রের অনেকগুলি তিনিই আবিষ্কার করেন সর্ব্বপ্রথম এবং নিজের মীমাংসায় পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে তিনিই প্রথম এরোপ্লেন তৈরী করেন। কেলীর বিমান চালনা ক'রবার জন্য যে মটর ব্যবহার করা হ'য়েছিল সেটা চ'লেছিল বারুদের বিস্ফোরণে এবং সত্যসত্যই এ বিমান আকাশে কয়েক গজ উঠতে সমর্থ হ'য়েছিল! সার জর্জ্জ কেলীর কোচম্যান ছিল এই প্রথম বিমানের প্রথম চালক। বিমানখানি যখন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে আরম্ভ ক'রল তখন এই আদি পাইলট এমনতর 'রাক্ষুসে কাণ্ডে' সত্যই বড় ভ'ড়কে গেল। পাইলট হিসাবে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিমান কিছুতেই আকাশে উঠতে পারবে না—তাই শেষ পর্য্যন্ত একে আকাশে উঠতে দেখে তার পক্ষে ভয় পাওয়াটা অসম্ভব ছিল না মোটেই। ভয় পেয়ে এই আদি পাইলট দিল উড়ন্ত বিমান থেকে নীচের দিকে একটা লাফ, এবং তাতেই ঘ'টল তার জীবনান্ত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদিকে আর উল্লেখযোগ্য কোন কাজই হয় নাই। এই সময় ইংলণ্ডে ওয়েনহাম. আর স্ট্রিঙ্গফেলো এদিকে নানা রকম বৈজ্ঞানিক

গবেষণা আরম্ভ ক'রলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র আরম্ভ হ'ল এদিকে বাস্তব প্রচেষ্টা। একে একে নানা দেশে অনেকগুলি ক'রে যন্ত্র তৈরী হ'তে লাগল। যে সব বৈজ্ঞানিক এই সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রলেন তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অষ্ট্রেলিয়ার হারগ্রেভ, ফ্রান্সে ভিক্টর ট্যাটিন এবং আমেরিকায় অধ্যাপক ল্যাংলী। প্রধানতঃ ল্যাংলীর প্রচেষ্টার ফলেই আবিষ্কৃত হ'ল গ্লাইডার। এই গ্লাইডারগুলিতে এক জনের বেশী আরোহী এবং কোন মটর থাকে না।

গ্লাইডার
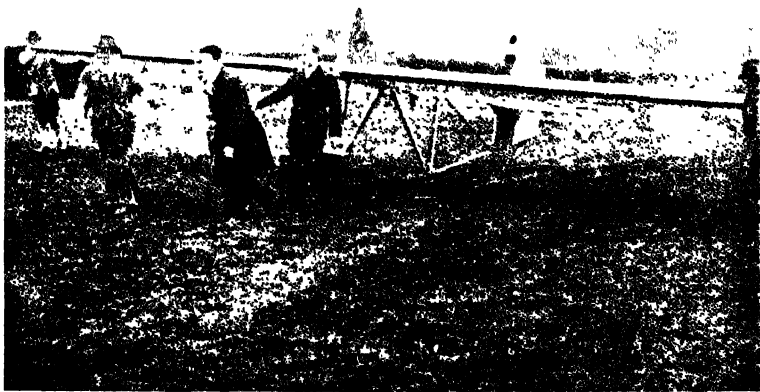
এই গ্লাইডারের উন্নতি হয় জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক অটো লিলিয়েনথলের চেষ্টায়। ১৮৯৩ সাল থেকে এই দুঃসাহসিক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক বিমান তৈরীর কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং তারই যন্ত্র অবলম্বন ক'রে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আবিষ্কার করেন সত্যিকারের এরোপ্লেন। লিলিয়েনথল তার গ্লাইডার নিযে দুঃসাহসিক পরীক্ষায় মত্ত হ'য়ে গেলেন—তার একই সাধনা হ'ল, এই গ্লাইডারের উন্নতি, এবং এই দিকে কিছু ক'রতে যেয়েই ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে হঠাৎ গ্লাইডার উল্টে ঘ'টল তার মৃত্যু।

আজকার দিনের যে এরোপ্লেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তার আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। উইলবার আর অরাভল রাইট ১৯০০ সাল থেকে তাঁদের পরীক্ষা স্থরু করেন এবং ১৯০৩ সালে আপনাদের তৈরী বিমানে আটান্ন সেকেণ্ড, অর্থাৎ এক মিনিটেরও কম সময় আকাশে উড়ে তারা প্রমাণ করেন যে আকাশে ওড়া সম্ভব শুধু নয়, স্থবিধাজনক হবারও বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এই সময় ইউরোপ-আমেরিকার প্রায় সব দেশেই এরোপ্লেন আবিষ্কারের যথেষ্ট চেষ্টা হ'চ্ছিল। ১৯০৪ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় একবারও না থেমে একটানা চল্লিশ মাইল উড়তে সমর্থ হ'লেন আর তার ফলে সমস্ত পৃথিবী অবাক হ'য়ে স্বীকার ক'রল যে 'হ্যাঁ, ওড়া সত্য সত্যই সম্ভব'।

পালকের মত একটা হাল্কা জিনিষও বাতাসে অনেকক্ষণ ভেসে থাকতে পারে না, আপনার ভারে আপনি প'ড়ে যায় অথচ ভাবা একখানা এরোপ্লেন কি ক'রে যে আকাশে ভেসে থাকতে পারে শুধু ভেসে থাকা কেন উড়ে বেড়াতে পারে——এটা ভাবলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। কি ক'রে যে এটা সম্ভব হ'য়েছে সেই কথাই এবার আলোচনা ক'রব। বাতাস ও জলের একটা বিশেষ গুণ এই যে এগুলি স্বভাবতঃই এর মধ্যস্থিত কঠিন পদার্থকে উপরের দিকে ঠেলে তুলতে চায়, বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এটাকে বলা যায় ঊর্দ্ধচাপ। এই ঊর্দ্ধচাপের জন্য সব জিনিষই কম বেশী বাতাসে ভেসে থাকতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক পক্ষে জিনিষটা ভেসে থাকবে কিনা সেটা ষোলআনা নির্ভর ক'রবে বাতাসের ঊর্দ্ধচাপের উপর আর জিনিষটার ওজনের উপর। চাপের চেয়ে ওজন বেশী হ'লে জিনিষটা ডুবে যাবে অথবা নীচে প'ড়বে, আবার চাপ বেশী হ'লে জিনিষটা ক্রমেই উপর দিকে উঠতে থাকবে। এই ঊর্দ্ধচাপ আবার নির্ভর করে জিনিষের আয়তনের উপর—আয়তন যত বাড়বে চাপও তত বাড়বে এই হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য। এই জন্যই সাধারণ একটা বেলুন বাতাসে ভাসে না কিন্তু যদি বেলুনটি হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভরা যায় তবে সেটা আপনা থেকেই বাতাসের মধ্যে উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে। এই তথ্যের সাহায্য নিয়েই তৈরী হয় জেপ্‌লিন।

এরোপ্লেন বাতাসের চাইতে অনেক ভারী, তবুও এটা কি ক'রে আকাশে ভাসে সেকথা আলোচনা করা যাক। একখানা ঘুড়ি আকাশে ওড়ে কি ক'রে? যদি বাতাস না বয় তবে সাধারণতঃ বেশ খানিকটা সুতা ছেড়ে বাতাসের বিপরীত দিকে দৌড়ে গেলে ঘুড়িখানা উপরে উঠতে থাকে এবং খানিকটা উঠে গেলে উপরে হাওয়া পেয়ে সেটা আপনা থেকেই বাতাসে ভাসতে থাকে। এই উদাহরণ থেকে একটা কথা বেশ বোঝা যায় যে ঘুড়িখানাকে আকাশে তুলতে হ'লে হয় বাতাস নড়বে অথবা নড়বে ঘুড়ি। উপরে বাতাসের স্রোত থাকে ব'লে একবার যখন ঘুড়িখানা উপরে উঠে যায় তখন এটা সহজে মাটিতে প'ড়ে যায় না। এরোপ্লেনের বেলাও ঠিক এই রকমই হয়। ঠিক এই মূল সূত্রই প্রমাণিত হয় যখন প্রথম প্রপেলার ঘুরে প্লেনখানা ক্রমে আকাশের দিকে উঠতে থাকে।

ঘুড়ি উড়তে হ'লে আরও একটা বিষয় সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা দরকার। সেটা হচ্ছে এই যে ঘুড়ির মাথা থাকবে সব সময় উপর দিকে, অর্থাৎ সব সময়ই বাতাস এসে ঘুড়ির গায়ে লাগতে হবে একটা কোণের সৃষ্টি ক'রে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ঘুড়ির লেজের দিকটা ইচ্ছা ক'রে ভারী ক'রে দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই কোণে হাওয়া লাগার ব্যবস্থা থাকার জন্যই ঘুড়ির উপর দিকে বাতাসের কোন নিম্নচাপ থাকতে পারবে না—এরকম হ'লে বাতাস স্বভাবতঃই ঘুড়িখানাকে উপর দিকে ঠেলে রাখতে চাইবে এবং অকস্মাৎ ঘুড়িখানা নীচে প'ড়তে পারবে না।

এরোপ্লেনের ডানা পাখীর ডানার মত নয় কোনমতেই সে কথা এখানে বলা দরকার। পাখীর ডানা আছে এবং দরকার মত সে তা নাড়তে পারে, এরোপ্লেনের ডানা আছে কিন্তু সে ডানা থাকে স্থির। কোন রকমেই সেটা নড়ান যায় না। এই ডানা এমনভাবে তৈরী যে এতে বাতাস আটকে যায় একটা কোণ ক'রে। উড়বার এই মূল তথ্য এবং এই তথ্যের উপরই নির্ভর করে এরোপ্লেনের সব কিছু। এ ছাড়া আর যত কিছু যন্ত্র সেগুলি অন্যান্য বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্ভাবন করা হ'য়েছে।

এরোপ্লেনের সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু কাজ হাসিল ক'রেছে। এরই সাহায্যে দুর্জ্জয় হিমালয়ের উনত্রিশ হাজার ফুট উচু শৃঙ্গ মানুষ জয় ক'রেছে—দূরকে

নিকট ক'রেছে। আরও কি তার দ্বারা সম্ভব হবে - উচু আরও কত উঁচুতে এই কৃত্রিম-পাখী মানুষকে নিয়ে যাবে—সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রবার সময় আজও আসে নাই—ভবিষ্যতে কোন দিন আসবে কিনা তা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত র'য়েছে।
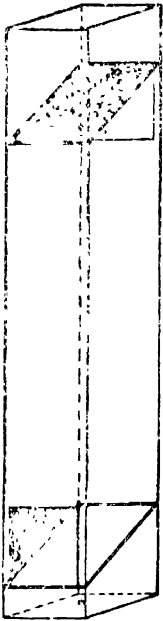
পেরিস্কোপ

পেরিস্কোপ

আলোকরশ্মিকে আয়নার উপর ফেলে তার গন্তব্য পথ থেকে অন্য পথে চালিত ক'রতে পারা যায় এটা আমরা সবাই জানি। চলার পথে বাধা পেলে পিছন ফিরে অন্য পথে চলাটাই হ'চ্ছে আলোকরশ্মির স্বাভাবিক ধর্ম। এই কারণে আলোকরশ্মি কোনও আয়নার উপর প'ড়ে যে কোণ রচনা ক'রে প্রতিফলিত রশ্মিও ঠিক তেমনি সমান একটি কোণ রচনা ক'রে ভিন্ন দিকে চ'লতে থাকে। মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন দেখলে যে ইচ্ছা ক'রলে এই প্রতিফলিত রশ্মিকেও দ্বিতীয় আয়নায় আবার প্রতিফলিত করা যায়। আলোকরশ্মির এই প্রতিফলন থেকে দেখা গেল যে, দু'খানা মাত্র আয়নার সাহায্যে একই বস্তুর বহু প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত করা যায়। আয়না দু'খানা কোণাকুণি ভাবে বসিয়ে তার মধ্যস্থলে কোন বস্তু রাখলে এই বস্তুর বহু প্রতিবিম্ব এই উভয় দর্পণে একই সঙ্গে প্রতিফলিত হয়। দর্পণ দু'খানি সজ্জিত ক'রবার কৌশলের উপর নির্ভর করে প্রতিবিম্বের সংখ্যার হ্রাস ও বৃদ্ধি। এ দু'টিকে সমান্তরালভাবে বসান হ'লে প্রতিবিম্বের সংখ্যা হ'বে অসংখ্য। প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব থেকেই তৈরী হয় পেরিস্কোপ, আর সাধারণতঃ সম্মুখের কোনও বাধাকে অতিক্রম ক'রে বা ভিড়ের ভিতর প্রবেশ না ক'রে তার ভিতরের জিনিষ দেখতে হ'লে পেরিস্কোপের ব্যবহার করা হয়। আজকাল খেলার মাঠে পেরিস্কোপের জনতা দর্শকের জনতাকেও ছাপিয়ে যাবার উপক্রম করে। এটা সাধারণের কাছে অতি সাধারণ ও তুচ্ছ ব'লেই গণ্য হ'য়ে

থাকে, কেননা এর গঠন প্রণালী খুবই সাধারণ। পেরিস্কোপে মাত্র দু'খানি আয়না থাকে। এই আয়না দু'খানিও সমান্তরাল ভাবে ভূমিতলের সাথে ৪৫° ডিগ্রি কোণ ক'রে পেরিস্কোপের উভয় প্রান্তে রক্ষিত। কোনও ঘটনা বা ছবি উপরিস্থিত আয়নাতে প্রতিফলিত হ'লে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি নীচের আয়নাতে পুনরায় প্রতিফলিত হয় এবং দর্শক এই নীচের আয়নাতেই উক্ত বিষয়ের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে দেখতে পায়।

পেরিস্কোপই হ'ল সাবমেরিনের চোখ। জলের ভিতর দিয়ে এমনি কিছু দেখা যায় না ব'লে পেরিস্কোপের সাহায্য নেওয়া হয় উপরের আয়নাখানা একবার জলের উপর তুলে দিতে পারলেই নীচের আয়নায় স্পষ্ট দেখা যাবে সমুদ্রের বুকে কি আছে আর কি ঘটছে।

টেলিভিশন

টেলিফোনের সাহায্যে দূরের কথা শুনতে পাওয়া যায় এ কথা আমরা সবাই জানি— এ দূর কতদূর, সে সম্বন্ধেও আমরা একটা ধারণা ক'রে নিতে পারি। দু'শ চারশ' মাইল দূর থেকে বন্ধুজন 'হ্যালো' ব'লে ডেকে উঠলেও আমরা আশ্চর্য হই না, কিন্তু যদি টোকিও, লণ্ডন, রোম, বার্লিন, নিউইয়র্ক থেকে খবর পাঠাতে হয় তবে টেলিফোন অচল না হ'তে পারে, সুবিধাজনক হয় না নিশ্চয়ই। এখন শুধু মাঝে মাঝে কথা কেন, বেতার যোগে রোজ রোজ গানই শোনা যায় পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে। কিন্তু শুধু বক্তৃতা না শুনে যদি বক্তার চেহারাও দেখতে পাওয়া যায় একই সঙ্গে তাহ'লে দূর আর দূর থাকে না মোটেই। দূরকে নিকট করা। এই সাধনায় মানুষ আবিষ্কার করেছে টেলিভিশন।

টেলিভিশনে দূরের ছবি দেখতে পাওয়া যায় চোখের সামনে একটা পর্দার উপর। পর্দার উপর ছবি এখনকার সিনেমাতেও দেখা যায় এমন কি বক্তাদের সব কথাবার্তাও একই সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও সিনেমা আর টেলিভিশনে মূলগত প্রভেদ আছে। সিনেমার কথা রেকর্ড ক'রে রাখা হয়, আজ সেটা শুনতে পারি—এক বছর পরে শুনতে পারি,—পাঁচ, দশ বছর পরেও শুনতে পারি। এজন্য এমন ব্যবস্থা ক'রে রাখতে হবে যাতে বক্তারও ইচ্ছা থাকলে তার কথা যতদূর সম্ভব চিরন্তন ক'রে রাখার। কিন্তু যুদ্ধের সময় শত্রুর

কথা সহজে রেকর্ড ক'রতে দেবে না আর তার আয়োজনেরও কোন ছবি নিতে দেবে না। পর্দার উপর সিনেমার যে ছবি পড়ে সে ছবি তুলতে হয় ক্যামেরায়, তাকে ডেভেলাপ ক'রতে হয়, তারপর সে ছবি যায় দূর দূরান্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশে। এই ভাবে তার সময় লাগে না হ'ক একমাস; দূর এতে নিকট হয় না।

টেলিভিশনে যে ছবি পাওয়া যায় সেটা দেশ দেশান্তরে পাঠাতে সময় লাগে এক মিনিট বা তারও কম। নাই বা গেল দু চার ঘণ্টা পরে সে ছবি দ্বিতীয় বার দেখা, তবুও দরকার মত সময়ের বাধা ডিঙিয়ে কোন জিনিষ দেখাতে হ'লে এই পথই ফলপ্রদ আর একমাত্র উপায়।

টেলিভিশন যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে দুটি কথা বলা যাক আমাদের চোখের গড়ন সম্বন্ধে। আমাদের চোখ এক একটা ক্যামেরার মত। এর সামনে আছে একটা ক'রে লেন্স, আর এরই সাহায্যে চোখের ভিতর রেটিনা নামে পর্দার উপর পড়ে দৃশ্য বস্তুর একটা ক'রে ছবি। যদি একটা সাদা কাগজের উপর কাল ফুটকী দিয়ে একটা ছবি এঁকে চোখের সামনে ধরা যায় তবে আমরা ছবিটা কেমন দেখতে পাব সেটা নির্ভর ক'রবে কাল ফুটকী কতটা ঘন তার উপর। যদি পরপর ঘন ক'রে কাল ফুটকী দেওয়া থাকে তবে দূর থেকে দেখে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে ছবিখানা একটানা নয়—তার মধ্যে কিছু ফাঁক আছে।

টেলিভিশনের সাহায্যে এমনিতর সাদা কালোর ফুটকী দেওয়া ছবিই পাওয়া সম্ভব। পরে অবশ্য আবার যন্ত্র সাহায্যে চেষ্টা করা হয় এই ছবিটিকে নিখুঁত ক'রতে। বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম ভেবেছিলেন সিলিনিয়াম ধাতু দিয়ে এই টেলিভিশন সম্ভব হবে, কারণ সিলিনিয়াম এমন একটা পদার্থ যা নাকি আলোর হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কম ও বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা ক'রতে সক্ষম। যখন এই ধাতু অন্ধকারে বা কম আলোতে থাকে তখন সে যে পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চালন ক'রতে পারে তার চাইতে অনেক বেশী বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাতে পারে যখন সে আলোতে থাকে বা যথেষ্ট আলো পায়। এক কথায় আলোকপাতের তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে সিলিনিয়াম সেলের বৈদ্যুতিক শক্তির তারতম্য হয়। টেলিভিশনের আদি যন্ত্রের একটা যদি আজ আমাদের হাতে এসে পড়ে তবে আমরা তাতে দেখতে পাব টেলিভিশনের প্রেরক যন্ত্রে এই ধরণের অনেকগুলি ক'রে সিলিনিয়াম সেল থাকে। যে বস্তুর ছবি দূর দূরান্তে পাঠাতে হবে তার সামনে একটা লেন্স

এমন ভাবে বসান হয় যে বস্তুটির একটা প্রতিবিম্ব লেন্সের মধ্য দিয়ে এসে সেলের উপর প'ড়তে পারে। গ্রাহক যন্ত্রে আছে একখানা কাল রঙের পর্দা আর তার গায়ে সাজান আছে অনেকগুলি ছোট ছোট ইলেকট্রিক বাল্‌ব।

টেলিভিশনে প্রেরিত ছবি

আসল ফটো

যদি এমন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় যে প্রেরক যন্ত্রের সিলিনিয়াম সেলগুলির সঙ্গে গ্রাহক যন্ত্রের এই বাল্‌বগুলির থাকবে সংযোগ যার ফলে সিলিনিয়াম সেলের বৈদ্যুতিক শক্তির তারতম্যের সাথে সাথে বাল্‌বগুলির উজ্জ্বলতা কম বা বেশী হয়, তবে কাল পর্দার কোন অংশ হবে বেশী উজ্জ্বল, কোন অংশ কম উজ্জ্বল আবার কোন অংশ বা থাকবে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে এই ভাবেই পর্দার উপর একটা ছায়ার উৎপত্তি হবে।

কিন্তু সিলিনিয়াম সেলের সাহায্যে শব্দ ও ছবি পাঠানো সম্ভব হয়নি তার দু'টো কারণ আছে। প্রথমতঃ এই উপায়ে শব্দ ও ছবি পাঠাতে হ'লে বহু সেল, ছোট ছোট বিজলীবাতি ও তারের প্রয়োজন। বিডওয়েল (Bidwell) নামক একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব ক'রে দেখান যে দুই বর্গ ইঞ্চি ছবি পেতে হ'লে ১৫০,০০০টী তার, সেল ও বিজলীবাতি প্রভৃতির দরকার। একশ' মাইল দূরের ছবি বেশ স্পষ্টভাবে পেতে হলে সাড়ে বার লক্ষ পাউণ্ডের অর্থাৎ পৌনে দুকোটি টাকার দরকার। সুতরাং এই উপায়ে শব্দ ও ছবি পাঠানো অসম্ভব।

টেলিভিশনের জন্ম হয় অনেকদিনের চেষ্টার ফলে। বেতার হবার আগেই যখন টেলিফোন শুধু আবিষ্কার হয়েছে তখনই—মানুষ চেষ্টা করেছে তার সাথে কথা

ব'লছে ফোনে, তাকে চোখে দেখতে। ১৮৮০ খৃঃ কেরী (Cary) নামে একজন বৈজ্ঞানিক প্রথম টেলিভিশন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু যন্ত্রটি ছিল খুব জটিল। তাই এর কোন প্রসার ঘটে নাই। ১৯২৬ সালে বেয়ার্ডের (John L. Baird) আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে এসেছে যুগান্তর আর এর জন্যই তাকে বলা হয়—টেলিভিশনের জন্মদাতা (Father of television)।

টেলিভিশন বিদ্যুতের কারসাজি। বিদ্যুতের সাহায্যেই এক স্থান থেকে ফটো অন্য স্থানে পাঠানো হয়। শব্দ প্রেরণের ষ্টেশনে বক্তা অনেকগুলি সমদূরবর্তী ছিদ্রযুক্ত চাকার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন এবং চাকাটি খুব জোরে ঘুরানো হয়। শব্দগ্রাহী ষ্টেশনে অনুরূপ একটা চাকাও সমান গতিতে ঘুরতে থাকে। এই চাকার সামনেই একটা পর্দা থাকে এবং এই পর্দার উপর বক্তার ছবি ভেসে ওঠে। সব সময়েই বক্তার নিখুঁত ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। যদি দুইটা চাকারই গতি ঠিক সমান থাকে তবে স্পষ্ট ছবিও পাওয়া যেতে পারে। এখনও ছবি খুব পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয় নি এবং বেশী লোক একসঙ্গে ছবিও দেখতে পায় না। তবে এদিক দিয়ে উন্নতি করবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট চেষ্টা ক'রছেন, কিন্তু এর মধ্যেই এর প্রয়োগ আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

টেলিফোন

এবারে বলি টেলিফোনের কথা। ১৮৭৬ সালে গ্রেহাম বেল নামে ইংলণ্ডের এক ভদ্রলোক টেলিফোন আবিষ্কার করেন। একটা কাঁপা নলের গায়ে খানিকটা তার জড়িয়ে রেখে যদি হঠাৎ নলটার ভিতর একটা চুম্বক ঢুকিয়ে দেওয়া যায় বা তেমনি ক'রে হঠাৎ চুম্বকটাকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যায় তবে ঐ তারের ভিতর একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এদিকে আবার কোন তারের ভিতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎ চলে তখন তারটার মধ্যে চুম্বক শক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

এই দুটো তথ্যের সাহায্য নিয়ে বেল সাহেব টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

টেলিফোনের যে অংশে মুখ রেখে আমরা কথা ব'লে থাকি তাকে বলা হয় 'মাইক্রোফোন ট্রান্সমিটার' আর যেটার ভিতর দিয়ে কথা শুনি সেটার নাম 'রিসিভার'। ১৮৭৮ সালে হিউজেস নামে একজন ভদ্রলোক এই মাইক্রোফোন ট্রান্সমিটার আবিষ্কার করেন।

কি ভাবে টেলিফোনে কাজ হয় এইবারে সেটা সংক্ষেপে বলি। মাইক্রোফোনে কথা বললেই এর ভিতরের লোহার পাতের পর্দাটা কাঁপতে থাকে আর তার

তরঙ্গ সৃষ্টি হ'চ্ছে আর বিদ্যুৎ-সংস্পর্শবিহীন লিডেনজারটিতে সেই তরঙ্গ সংক্রামিত হ'চ্ছে। সব সময়েই কিন্তু এমন তরঙ্গ-সংক্রামণ দেখা যায় না, দুটি লিডেনজার যদি সমগুণবিশিষ্ট না হয় তবে একটা আরেকটার তরঙ্গ গ্রহণ ক'রতে পারে না। হার্জের পর এদিকে গবেষণা আরম্ভ করেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। বৈদ্যুৎ-চুম্বক জনিত তরঙ্গ সম্বন্ধে অনেক রকম পরীক্ষা করার পর এই বাঙালীসন্তান পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ ক'রলেন তার না থাকলেও উপযুক্ত প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে ঈথারের এই সব তরঙ্গ দিয়ে অনেক কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কারণ এই জাতীয় কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ইট-কাঠ পাটকেলের মধ্য দিয়েও অনায়াসে প্রবাহিত হ'তে পারে। এখানে আচার্য্য জগদীশের একটা আশ্চর্য্য পরীক্ষার কথা বলা যেতে পারে। এই পরীক্ষায় যে ঘর ব্যবহার করা হ'য়েছিল সেই হ'ল আদি বেতার ঘর। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ঘরে একটি গ্রাহক যন্ত্রের সঙ্গে টোটা ভরা পিস্তল রেখে দেওয়া হ'ল আর একটু দূরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে রাখা হ'ল অবিকল একটি তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র। দুই ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ ক'রে রেখে সেণ্টজেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফো পাহারা দিতে আরম্ভ ক'রলেন। প্রেরক যন্ত্র চালাতেই বন্ধ ঘরে রাখা পিস্তলটি ছুটে গেল।

জগদীশচন্দ্রের এই আশ্চর্য্য পরীক্ষার পর পদার্থবিদগণ সকলেই এদিকে অবহিত হ'লেন এবং এই দিকে গবেষণা আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাদের সমস্ত সাধনা সফল হ'ল ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক মার্কনির চেষ্টায়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হ'য়ে মার্কনির বেতার সঙ্কেত পৃথিবীকে স্পষ্ট প্রমাণ ক'রে দিল বেতার বার্ত্তা সম্ভব ও সহজ।

মেশিন গান

মানুষ ক্রমশঃ যুদ্ধে যতই অভ্যস্ত হ'তে লাগল ততই সে ভাবতে আরম্ভ ক'রল কি ক'রে নিজে দূরে থেকেও শত্রু নিপাত করা যাবে। এই চেষ্টায় প্রথম এল তার বর্শা, তারপর পাওয়া গেল তীরধনুক এবং শেষ পর্য্যন্ত মেশিন গান আর কামান ইত্যাদি। এই শেষোক্ত জাতীয় অস্ত্রের আদিতে ছিল বন্দুক—আর বন্দুক যে কবে আবিষ্কার হ'য়েছিল তা এখন ঠিক ক'রে বলাও যায় না। জনৈক গ্রীক ঐতিহাসিক ব'লেছেন যে সেকেন্দার শাহ্ যখন ভারত আক্রমণ ক'রেছিলেন তখন হিন্দুরা দূরে থেকে অগ্নিবর্ষী অস্ত্র নিয়ে তাকে বাধা দিয়েছিল। এই

অগ্নিবর্ষী অস্ত্র সম্ভবতঃ বন্দুক। ইউরোপে তখনও বন্দুকের আবিষ্কার হয় নাই—তাই হিন্দুরা বন্দুকের আদি প্রবর্ত্তক এমনতর দাবী অনেকে ক'রে থাকেন, সে কথা আগেই ব'লেছি।

সাধারণ বন্দুকের ব্যবহার অনেক কালের, কিন্তু আগেকার দিনের বন্দুকে ঠিক সোজা গুলি ছোড়া সম্ভব ছিল না কোনমতেই। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড এ্যালেক্স ফরসাইথ নামে স্কটল্যাণ্ডের একজন পাদরী বারুদে আগুন দেবার এক নূতন উপায় আবিষ্কার ক'রলেন। এর আগে পলিতায় আগুন ধরিয়ে বারুদে অগ্নিসংযোগ ব্যবহার করাই ছিল রেওয়াজ। রেভারেণ্ড সাহেব ক্যাপ দেওয়া বন্দুক আবিষ্কার ক'রে অস্ত্র বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নতির আমদানি ক'রলেন। এই ক্যাপওয়ালা বন্দুকের আর একটা সুবিধা হ'ল এই যে সামনে থেকেই বারুদ ভর্ত্তি করার ঝামেলা সব চুকেই গেল, ... ক'রে ফেলতে পারল, আর গুলিটা বন্দুক থেকে ঠিক সোজা বেরিয়ে যাওয়া হ'ল সম্ভব। আগে চাইলে তার বাইরে যাবার আর ... ক'রতে চাইলেও গুলি লাগার অভাবে ভুলানো ঝোঁক, নকি ছুটে যাবার অপরোপার সম্ভাবনা ছিল, ফরসাইথের নূতন ব্যবস্থায় সে সম্ভাবনা গেল বন্ধ হ'য়ে।

বন্দুকের ক্রমোন্নতি হ'তে হ'তে আজ তৈরী হ'য়েছে মেশিন গান—যা মিনিটে ছুঁড়তে পারে প্রায় এক হাজার গুলি। ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয় কি ক'রে এটা সম্ভব হ'ল। বন্দুক যখন প্রথম আবিষ্কার হ'য়েছিল তখন আট ঘণ্টায় মাত্র সাতটি ক'রে গুলি ছোড়া ছিল তাতে সম্ভব, নেপোলিয়নের সময় বন্দুকের কারিকুরি এসে দাঁড়াল মিনিটে একটা গুলি, আর আজকাল হ'য়েছে মিনিটে হাজার —অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে একটা ক'রে 'এক' উচ্চারণ ক'রে হাজার বার এই 'এক' গুণতে যে সময় লাগবে তার মধ্যেই গুলি ছোটা সম্ভব মাত্র সাড়ে ষোল হাজার বার!

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ব্যবহার হয় এই মেশিন গানের। এর উদ্ভাবক ছিলেন আমেরিকাবাসী ডক্টর গ্যাটলিং—তারপর এর ব্যবহার হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে বিখ্যাত ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়। এই মেশিন গানের উদ্ভাবক ছিলেন ফরাসী অস্ত্র-বিশারদেরা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই জাতীয় মেশিন গান খুব বেশী কার্য্যকরী হয় নাই, তাই মেশিন গান থাকা সত্ত্বেও ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রুশিয়ানদের কাছে গেলেন হেরে।

ইংলণ্ডের মেশিন গান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যার হিরাম

ম্যাক্সিমের চেষ্টা ও যত্নের ফলে। বাস্তবিক পক্ষে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে এইই ছিল একটা প্রধান মারণাস্ত্র।

এই বারে বলি কি ক'রে এই মেশিন গান চলে। মেশিন গানের প্রধান সুবিধা, এগুলি হ'ল সব দিক দিয়ে 'আত্মক্রিয়' বা অটোমেটিক (Automatic) এতে না হয় গুলি ভ'রতে, না হয় নল পরিষ্কার ক'রতে। সাধারণ বন্দুকের মস্ত বড় একটা ধর্ম্ম এই যে, যে মুহূর্ত্তে ভীষণ জোরে গুলিটা সামনের দিকে বেরিয়ে যায়, সেই মুহূর্ত্তেই বন্দুকটাকেও আপনা থেকে পিছনের দিকে যায় ছুটে। যে কেউ বন্দুক চালিয়েছে সেই এ কথা জানে; সামরিক ভাষায় বন্দুকের এই পিছন হটার নাম হ'চ্ছে ব্যাক্ কিক্ (Back Kick)। ম্যাক্সিম সাহেব এই ব্যাক কিকের শক্তিটাকে অযথা নষ্ট হ'তে দেন নাই বরঞ্চ এতে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাকে ধ'রে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন। প্রথম গুলি ঘোড়া টেপার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল আর তার ফলে বন্দুকের হ'ল ব্যাক্ কিক্ এই ব্যাক্ কিক্ থেকে উদ্ভূত শক্তির বলে আপনা থেকেই নূতন কার্টিজ ঠিক জায়গা মত এসে গেল, আর সেটা ছুটল আপনা থেকেই— দ্বিতীয় বার ঘোড়া টেপার প্রয়োজন হ'ল না, আবার তারই ব্যাক্ কিকে ছুটল তৃতীয় গুলি। পর পর এমনি ক'রে গুলির পর গুলি ছুটতে লাগল।

মেশিন গানের গুলি থাকে কার্টিজ বেল্টে (Cartridge Belt)। এক একটা বেল্টে গুলি থাকে আড়াই শ। এগুলি যেন শ্রেণীবদ্ধ সৈনিক, যেই একটা শেষ হ'চ্ছে অমনিই তার জায়গা নিচ্ছে আর একটা এসে। ম্যাক্সিম গান মিনিটে এক হাজার পর্য্যন্ত গুলি ছুঁড়তে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ চার শ'র বেশী গুলি ছোড়া হয় না, কেন না এতে বন্দুক থাকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। কোন সময়ই সাধারণতঃ এর বেশী গুলির দরকারও হয় না।

১৯১৭ সালের মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার লুইস্ গান সমস্ত সৈন্যদলে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে। তথ্যের দিক থেকে ম্যাক্সিম ও লুইস গান একই প্রকার। তফাৎ যা একটু আছে তারই উল্লেখ ক'রে এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

বিস্ফোরণের ফলে যে গ্যাসের উদ্ভব হয় তারই খানিকটা গ্যাস ব্যবহার করা হয় লুইস গান চালাতে। এই গ্যাসের চাপেই এর যন্ত্রপাতিগুলি কাজ ক'রতে থাকে। মেশিন গানে যেমন কার্টিজ বেল্ট থাকে, লুইস্ গানে তেমন থাকে না, থাকে পঞ্চাশটা ক'রে কর্টিজের একটা ক'রে ঘুরন্ত ম্যাগাজিন ড্রাম (Magazine Drum)। এই ড্রামটা সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে অর্থাৎ পঞ্চাশটা গুলি শেষ হ'তে সময় লাগে মাত্র চার সেকেণ্ড এবং একটা ড্রাম ঘুরতে আরম্ভ হওয়ার দু সেকেণ্ড পরেই আর একটা ড্রাম কার্য্যোপযোগী হ'য়ে দাঁড়ায়।

নির্ঘণ্ট